সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২২

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯ মার্চ, ১৯৮২

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

সূচীপত্র

ভূমিকা

খৃস্টাব্দ উনিশ-শতক বাঙালীর মনীষা-বিকাশের ক্রান্তিকাল। বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা-গর্ব-ভবিষ্যৎ—সব কিছুর দিশারী হিসাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছিলেন কয়েকজন মনীষী। বাঙালীর দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করবার জন্য—বাঙালীকে জগৎ-সভায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বলেছেন, 'এ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের উর্বর ও ভাগীরথী-বিধৌত পবিত্র ক্ষেত্রে বহু বড়লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' এর অন্যতম প্রধান বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম-বিয়োগে তিনি বলেছেন, 'এ শতাব্দীর সূর্য অস্তমিত হইয়াছেন।' এই সূর্য বঙ্কিমচন্দ্র।

তাঁর জন্ম: ১৩ আষাঢ়, ১২৪৫। ২৬ জুন ১৮৩৮, মঙ্গলবার রাত্রি ৯টা ৩ মিনিট। মৃত্যু ২৬ চৈত্র, ১৩০০। ৮ এপ্রিল ১৮৯৩, রবিবার বিকাল ৩টা ২৫ মিনিট।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত কালেই তাঁর মহান জীবন ও কীর্তিকথা লিপিবদ্ধের চেষ্টা হয়। এ কাজের পুরোধা ছিলেন—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর তরুণ কবি চিত্তরঞ্জন দাশ ও তরুণ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নানাভাবে বঙ্কিমচিত্র ব্যক্তিগতভাবে ও সহযোগী মারফৎ প্রচারে এগিয়ে এসেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বঙ্কিম-বিষয়ক রচনা 'বঙ্কিম-প্রতিভা' এ সম্বন্ধে আলোচনার যোগ্য।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পুরোধা হিসাবে রাজনীতিতে যোগ দেবার আগে সহযোগীদের সহায়তায় বঙ্কিম-জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় 'বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মেলন সূচনা করেন। এ কাজে অন্তরালে যুক্ত ছিলেন বঙ্কিম-সহধর্মিণী রাজলক্ষ্মী দেবী। তাঁর মৃত্যু হয় ভাদ্র ১৩২৬ সালে। তিনি তাঁর স্বামীর কাঁটালপাড়ার বৈঠকখানা সংরক্ষণ ও অমূল্য গ্রন্থাবলী 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' মারফৎ প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাহিত্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ১ জানুয়ারি ১৯২১ সালে পরলোকগত হন। তিনিই পুস্তকাকারে 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' প্রচারের আয়োজন করলেও নিজে কিছু করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২২ খৃস্টাব্দে। বর্তমানে এই সংকলন অতি দুষ্প্রাপ্য। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' দীর্ঘকাল পরে আমরা পুনরায় বাঙালী পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। দুষ্প্রাপ্য এই সঙ্কলনটি গবেষক ও সাহিত্যপিপাসু পাঠকদের বিশেষ উপকারে লাগবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের অমর রচনার আলোচনা "কপালকুণ্ডলা"র ইংরেজি সমালোচনা এযাবৎ কেউ করেননি। এটি সহৃদয় পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করলাম। সেটি প্রকাশিত হয় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়।

Worthy of Note

From The Statesman. August 6, 1885.

It is some time since Bunkim Chandrā Chatterjee's novel Kopal-Kundala[1] has been translated into English ; but it is only very recently that a German version of the same novel has appeared A tale of Bengali life that has found its way into English and German, the two greatest languages of the West, is worthy of note. Such a tale will perhaps more than anything else bring home to the minds of thoughful Europeans that there live not only in the past Vedic ages but at the present day in the valley of the Ganges and the Indus, men of passions like unto themselves. The introduction to the English translation of the novel is a clear and well-written eassay and forms a very complete homily on this text. Many people "in England," says Mr Phillips, "regard the natives of India much in the same light as they regard the natives of Africa. A perusal of the following tale will at least give them some conception of the stage of civilization at which the Bengali race has arrived, and of the intellectual attainments of its educated classes" The homily, unhappily, is but too well deseved. Up to this day, Englishmen have not quite given up the offensive habit of speaking of "niggers." Though later years have made an appreciable difference in this respect, still the want of knowledge and want of sympathy in the people of our own land, regarding the people of India, is a patent and glaring fact. We have to confess to our shame that there is amongst the Germans, leaving aside the linguistic and philosophical studies of their savants, as a whole, a greater readiness of intellectual sympathy with the aspirations of native races than amongst Englishmen.

And if Mr phillips has by his translation and his very readable essay prepared the mind of the home public even a little for that rendiness, he has achieved a great deal. He has

1. Kopal-Kundala A tale of Bengali life. Translated from the Begali of Bunkim Chandra Chatterjee by H.A.D. Phillips, C. S. Trubner and Co, London : 1885. Kopal-Kundala Ein bengalishcer Roman, Deutsch von curt. Klemm. Leipzig 1886.

at the beginning of his essay given a few figures and facts regarding the population, the area under cultivation, the trade ports, extension of railways, increase of revnue, etc in Bengal, to mark the material prosperity of the province. We cannot agree with the bright colours of his picture, nor can we affirm that "Justice in the case of the criminal courts is exceedingly cheap," and that "Jails and Jail administration may compare favourably with those of European countries." But these are only civillian erros Most interesting is the part of the essay which contains a short sketch of the principal novelists of Bengal, Peary Chand Mitter, Bunkim Chandra Chatterjee, Romesh Chandra Dutt, and Tarak Nath Ganguli. Mr Phillips gives Romesh Chandra the first place.'[2]

বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার মধ্যে বঙ্কিম-জীবনীর উপকরণ এ নো সংগ্রহের অপেক্ষায় আছে। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে করা হয় নি। এ বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে সাংবাদিক-সততার-সদাশয়তা-সৌজন্যের এক মহান পরিচয় দিয়েছেন 'স্টেটসম্যান'। এটিও পাঠকদের ভাল লাগবে আশা করি।

VANDE MATARAM

From the Statesman, April 10, 1894.

RAI BUNKIM CHANDER CHATTEJEE C.I.E. the well known Bengali novelist died on Sunday (April 8) at his residence at Calcutta. His body was cremated at the Nimtollah-ghat in the presence of a large number of his relations and friends. He had been suffering from a carbuncle for the past twelve days. The deceased was born at Kanthalpara village in the 24-Pergunnahs, on June 26, 1838, and was therefore 56 years when he died. He was the first B.A. of the Calcutta University and was made a Deputy Magistrate in 1859. In 1891 after 30 years of meritorious service he retired form Government employ and devoted his time to writing notes on the Gita which he left unfinished. His first novel Durgeshnandini was publishd in 1865, but the work known as Kapalkundala is what made him

2. Dutt was certainly among the first of the Indian members of the Indian Civil Service to take informed and sustained interest in the country's economy.

popular. Sitaram was his last novel which was published in 1887. He was the author of some 14 novels besides other works on different subjects. It was he who started the Bengali Magazine Bangadarshan. He was a man of varied talants and his death will be a loss to Bengalee Literature.

From the Statesman, April 13, 1894.

By the death of Rai Bunkim Chunder Chatterjee, Bahadoor, C.I.E. Bengali literature has suffered an irreparable loss. For not only did his works exercise a healthy influence on the literary tastes of his countrymen but, what is better, they instilled a high moral into the educated classes of the native community. The public meetings in Calcutta and other parts of these Provinces, furnish striking testimony to the worth of the deceased gentleman, both as an author and a private individual. Hooghly College, whence he passed into the Presidency College, and became a law student. On the foundetlon of the Calcutta University, he was one of two native candidates who first obtained the degree of B.A. and was at once appinted a deputy Magistrate by Sir Fredrick Halliday, at that time Lieutenant Governor of Bengal. Although in his official capacity his marked abilities won the respect and confidence of his superiours, it was not to official work that he devoted the great power of his mind. His natural bent was towards literature.

Rightly apprehending that a taste for reading would be best developed among the educated natives classes by attractive works of a light character, he applied the energies of a fertile mind to to the production, in the first place, of those novels which have made his name a household word among the Bengali community. His Bengali style is described by competent judges as one marked by inimitable grace and ease, combined with vigour of expression.

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের ও সাহিত্যের উপকরণ এখনো উদ্ধারের অপেক্ষায় আছে। সহৃদয় পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নীরস বক্তব্য শেষ করলাম।

১৪ মন্মথ দত্ত রোড,
কলকাতা-৩৭

সনৎকুমার গুপ্ত
১৯ মার্চ ১৯৮২

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক ও লেখক সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কত রূপে কত ভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধি-কাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি,—কোথায় গেল সেই 'বিজয়-বসন্ত' সেই 'গোলেবকাওলি', সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ'। এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র,

কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে-একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম ; সেইজন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয়, সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই, সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব-আনন্দ নবীন-আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা—তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন—তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীর ভাবে নানা পথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবৎ বাজিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে। সেইদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনোদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনোদিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় সহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই, এমন-কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ

পুরাণ তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট্‌-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভাব প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিয়াছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যাদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালির যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর-কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত-পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি-পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলাভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে, সে কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই-সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠ্যযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত পূর্বতন এন্‌ট্রেন্স-পাঠ্য বাংলা গ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিন-ভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য, কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরাজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজি-সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত-কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত-কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন, সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদরমলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারো পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, যেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভখ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে, অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিক-ব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর-কিছুই নাই। তাহার নিরতপ্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতি-ক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন যে আরো কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন

নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে কার্য করিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈল-সম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ্‌বর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে, একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব-অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এক দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর-এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে, এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো

দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়। ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন। তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা—যেন যথালাভের মতো।

কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যে যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কি ধর্মতত্ত্ব যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন। এখন যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল। বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর-কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন-কি, বঙ্কিম প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ঐতিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহার সার এবং অসার ভাগ পৃথক্ করণ, তাহার প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন নিঃসঙ্কোচে করিয়াছেন যে এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

বিশেষতঃ দুই শত্রুর ব্যবধান দিয়া তাঁহাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছে। এক

দিকে, যাঁহারা অবতার মানেন না তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্বারোপে বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ান। অন্য দিকে যাঁহারা শাস্ত্রের প্রত্যেক অক্ষর এবং লোকাচারের প্রত্যেক প্রথাকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারাও বিচারের লৌহাস্ত্র দ্বারা শাস্ত্রের মধ্য হইতে কাটিয়া-কাটিয়া কুঁদিয়া-কুঁদিয়া মহত্তম মনুষ্যের আদর্শ অনুসারে দেবতা-গঠন-কার্যে বড়ো প্রসন্ন হন নাই। এরূপ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে কোনো এক পক্ষকে সর্বতোভাবে আপন দলে পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরীদ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র, কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসঙ্গতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে, ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যের প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে, কারণ ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরিপরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।

এইরূপ অপরিমিত অসংযত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কৃষ্ণচরিত্রে উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসংবরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।

বিশেষত বিষয়টি এমন যে, ইহা কোনো সাধারণ বাঙালী লেখকের হস্তে পড়িলে তিনি এই সুযোগে বিস্তর 'হরি-হরি', 'মরি-মরি', 'হায়-হায়', অশ্রুপাত ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী করিতেন এবং কল্পনার উচ্ছ্বাস, ভাবের আবেগ এবং হৃদয়াতিশয্য প্রকাশ করিবার এমন অনুকূল অবসর কখনোই ছাড়িতেন না; সুবিচারিত তর্ক-দ্বারা, সুকঠিন সত্যনির্ণয়ের স্পৃহা-দ্বারা পদে পদে আপন লেখনীকে বাধা দিতেন না; সর্বজনগম্য সরল পথ ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি-দ্বারা

স্বকপোলকল্পিত একটা নূতন আবিষ্কারকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া তাহাকেই বাকপ্রাচুর্যে এবং কল্পনাকুহকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেন, এবং নিজের বিশ্বাস ও ভাষাকে যথাসাধ্য টানিয়া বুনিয়া আশেপাশে দীর্ঘ করিয়া অধিক পরিমাণ লোককে আপন মতের জালে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে যুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্য দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগেব সঙ্কোচ—এক দিকে রীতিমত পরিচয়ের অভাব, অন্য দিকে অতিপরিচয়জনিত অভ্যাস ও সংস্কারের অন্ধতা—যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সঙ্কটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বল্গার ইঙ্গিতে লেখনীকে বেগ দিতে হইবে, সেই বল্গাব আকর্ষণে তাহাকে সবদা সংযত করিতে হইবে। এই-সকল ক্ষমতাসামঞ্জস্য বঙ্কিমেব ছিল। সেইজন্য মৃত্যুর অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের বড়ো আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না, এবং আমাদের ভাগ্যে যাহা অসম্পন্ন রহিয়া গেল তাহা যে কবে সমাধা হইবে কেহই বলিতে পারে না।

বঙ্কিম এই-যে সর্বপ্রকার আতিশয্য এবং অসঙ্গতি হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন ইহা তাঁহার প্রতিভাব প্রকৃতিগত। যে-কেহ তাঁহার রচনা পড়িয়াছেন সকলেই জানেন, বঙ্কিম হাস্যরসে সুরসিক ছিলেন। যে পরিষ্কার যুক্তির আলোকের দ্বারা সমস্ত আতিশয্য ও অসঙ্গতি প্রকাশ হইয়া পড়ে হাস্যরস সেই কিরণেরই একটি রশ্মি। কত দূর পর্যন্ত গেলে একটি ব্যাপার হাস্যজনক হইয়া উঠে তাহা সকলে অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু যাহারা হাস্যরসিক তাঁহাদের অন্তঃকরণে একটি বোধশক্তি আছে যদ্দ্বারা তাঁহারা সকল সময়ে নিজের না হইলেও অপরের কথাবার্তা আচারব্যবহার এবং চরিত্রের মধ্যে সুসঙ্গতির সূক্ষ্ম সীমাটুকু সহজে নির্ণয় করিতে পারেন।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদিরসেরই সহিত যেন তাহার কোনো-একটি সর্ব-উপক্রম-সহ বিশেষ কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্বপ্রকারে

পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস-বিদ্রূপ প্রকাশ পাইত। এই প্রগলভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক, কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যে গম্ভীরভাবে কোন বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনি প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবলই প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে, উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথমে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসঙ্গতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভার বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সম্মিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীরপুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনি সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক সেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল সেদিন একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচি-প্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন-নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কত দিনের কথা ভালো স্মরণ নাই, কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বলকৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর-সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর-কাহারো পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস

জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সঙ্গী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিত দর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে, প্রথম দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমল হাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম দর্শনে সেই-যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগমূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটা অত্যন্ত সেকেলে পণ্ডিতী রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসঙ্কোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন, বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচি-শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ পাইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণ্যোচিত শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের

বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্ব-দুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক, এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে, এই ভক্তিতে, সেই আদর্শপ্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তি স্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। ইংরেজ এবং ইংরেজের আইন চিরস্থায়ী নহে, রাজনৈতিক ধর্মনৈতিক সমাজ-নৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে, যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলা-হলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণা হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে; কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা, অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের শূন্যতার মধ্যে চির-সৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্-ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে সেই-সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার,

প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা, তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তরপুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন; তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা-লেখকদিগের গুরু, বাংলা-পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতনকার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষে পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

১৩০০

বঙ্কিমচন্দ্র ও কথকঠাকুর

'নাক বড পেটুক'

[ষাট বৎসর পূর্বের কথা]

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক

শরৎকাল, আশ্বিন মাস, কৃষ্ণপক্ষ, সম্মুখে মহালয়া অমাবস্যা। পরে দেবীপক্ষ পড়িবে, দেবীর আবির্ভাব হইবে, বঙ্গবাসী আনন্দে উৎফুল্ল। এখনও ভাদ্রমাসের ভরা নদী, কূলে কূলে জল, স্রোতস্বতী ভাগীরথী অবিশ্রান্তবেগে ছুটিতে ছুটিতে অনন্তস্রোতে গিয়া মিশিতেছে। এই সময় এক দিবস অপরাহ্ণে কাঁঠাল-পাড়ায় রাধাবল্লভ জীউর ঘাটের উত্তর দিকে একটি বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বৃহৎ চন্দ্রাতপের নীচে অনেকগুলি লোক বসিয়া কথকতা শুনিতেছে। গ্রামের এক বর্ষীয়সী স্বর্গারোহণ করিবেন, সেই উপলক্ষে তাঁহাকে রামায়ণ শুনান হইতেছে। গ্রামের প্রাচীনগণ আনন্দ ছাড়িয়া ঐ স্থানে হরিনাম শুনিতেছেন, নিষ্কর্মা যুবকগণ তাসখেলা গান বাজনা ত্যাগ করিয়া ও বালকগণ ছুটাছুটি ছাড়িয়া ঐ স্থানে কথকঠাকুরের মুখপানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে।

একখানি চৌকির উপর পুরু গালিচাতে কথকঠাকুর বসিয়া আছেন। শীর্ণ ও শুষ্ক শরীর, দেহের মধ্যে কোনো স্থানে সরু মোটা নাই, নাসিকাটি বড লম্বা ও তাহার উপরের ফোঁটাটিও তদ্রূপ লম্বা, নাসিকার উভয় পার্শ্বে চক্ষু দুটি এত ক্ষুদ্র যে, দেখিলে ডেয়ো পিঁপড়ে মনে হয়। মস্তক কেশহীন। কণ্ঠে তুলসীর মালা, গলায় একছড়া মালা, গাত্রে নামাবলী, সম্মুখে একখানি পুঁথি উহাতে যথেষ্ট চন্দনের চিহ্ন,—বোধ হয় কথকঠাকুর প্রত্যহ উহার পূজা করিতেন, অথবা সরস্বতী-পূজার সময় উহার উপর প্রচুর পরিমাণ চন্দন ঢালিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একটি তাকিয়া; কথকঠাকুর বক্তৃতা করিতে করিতে, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে, এক একবার ঐ তাকিয়াতে ঠেস দিতেছেন। তাঁর হাত মুখ নাড়া বড় রহস্যজনক, বিশেষতঃ শ্বেত সুবৃহৎ দন্তগুলির জন্য আরও রহস্যজনক। ইনি স্থানীয় কথক, সময়াভাবে স্থানান্তর হইতে কথক আনা হয় নাই।

বেদীর বামপার্শ্বে কতকগুলি বালক বসিয়া কথকঠাকুরের মুখপ্রতি চাহিয়া আছে। তন্মধ্যে একটি বালককে দেখিলে অল্পায়ুষ্ক বলিয়া বোধ হইবে।

রূপবান বলিয়া নহে, তাহার মুখে কি এক অনির্বচনীয় ভাব ছিল, সেইজন্য তাহাকে সকলেই লক্ষ্য করিত। তাহার বয়ঃক্রম দশ, এগার, কি বার বৎসর হইবে। উপনয়ন হইয়াছে, এমন কি বিবাহ হইয়াছে। বালিকাপত্নী সকলের কোলে কোলে বেড়াইত। বালকটি গৌরবর্ণ ক্ষীণদেহ, কিন্তু সর্বাঙ্গ সুগঠিত, মাথায় একরাশি কোঁকড়া কোঁকড়া কাল চুল। নাসিকা দীর্ঘ ও উন্নত, চক্ষু দুইটি অসাধারণ উজ্জ্বল, বড় চঞ্চল, এবং তাহার দৃষ্টি তীব্র। ঠোঁট দুখানি পাতলা ও চাপা, তাহাতে সর্বদা হাসি থাকিত—(এমন কি তাঁর মৃত্যুর সময়েও ঐ হাসি দেখিয়াছি)। বালকের গায়ে একটা সাদা জামা ছিল, সার্ট নহে, যাহাকে সেকালে পিরান বলিত। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্র, ইঁহারই পিতামহীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে কথকতা হইতেছিল। তিন সপ্তাহকাল গঙ্গাতীরে বাস করিয়া পূজার ষষ্ঠীর দিন তাঁহার পিতামহী স্বর্গারোহণ করেন। বালক বঙ্কিমচন্দ্রের আশে পাশে চার-পাঁচটি বালক বসিয়াছিল,—কেহ বা বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ বা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই লেখকও ঐ দলে বসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথকের মুখপ্রতি চাহিতেছেন, আর বয়স্যদিগকে কি বলিতেছেন, তাহারা টিপি হাসিতেছে। কথকতা এবং সঙ্গীত তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, ঐ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, আর বালকেরা হাসিতেছিল। এই সময়ের দুই একটা কথা আমার অদ্যাপি স্মরণ আছে। ঐ কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকালের রহস্যপ্রিয়তার পরিচায়ক বলিয়া নিম্নে প্রকটিত করিলাম।—

বঙ্কিমচন্দ্র। কথকঠাকুরের নাকটা বড় পেটুক।

একটি বালক। মানুষ পেটুক শুনিয়াছি, মানুষের নাক পেটুক, এমন তো কখনো শুনি নাই।

বঙ্কিম। আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, শুন, কথকঠাকুরের নাকটা ঠোঁট ছাড়াইয়া গালের উপর উঁকি মারিতেছে। দেখিতেছ তো?

বালক। হাঁ।

বঙ্কিম। কেন বল দেখি?

বালক। তা জানিব কেমন করে?

বঙ্কিম। কথকঠাকুর যখন আহার করেন, তখন নাকটা গালের ভিতর হইতে আহারের দ্রব্যাদি চুরি করিয়া খায়। কথকঠাকুর উহা জানিতে পারেন না।

এই কথায় বালকেরা উচ্চহাসি হাসিল, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কর্তৃপক্ষেরা বালকদিগকে ধমক-ধামক করিতে লাগিলেন। নিকটে দুই-একটি প্রাচীন যাঁহারা ঐ কথা শুনিয়াছিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ধমকাইবেন না, বড় সরস

কথাটা হইয়াছে। কথা ভাঙ্গিলে বলিব।' বাস্তবিক নাকটা এত লম্বা যে, প্রায় মুখের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র তাহা লইয়া রহস্য করিতেছিলেন। নিকটস্থ একজন প্রাচীন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, এখন তো কথকঠাকুর কিছু আহার করিতেছেন না, তবে নাকটা কি খাবার লোভে মুখের ভিতর উঁকি মারিতেছে?' প্রত্যুৎপন্নমতি বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'এখন নাক কথকঠাকুরকে খাওয়াইতেছে।' নাকের সরস নস্য কথকঠাকুরের গালের ভিতর ফোঁটা ফোঁটা ঢালিতেছে, কথকঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে খাইতে অস্বীকার করিতেছেন, এবং মুহুর্মুহুঃ গামছা দিয়া ঠোঁট মুছিতেছেন।' এই কথায় বালকেরা ও নিকটস্থ দুইজন প্রাচীন বড় হাসি হাসিলেন, সভাস্থ সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল, কিছু বলিতে পারিল না।

একদিন কথকঠাকুর একটা গীত (মদন মদ ঈশ ইত্যাদি) গাহিতে গাহিতে অনেক প্রকার মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন, 'দুই আঙুল দ্বারা দুই কান বন্ধ কর দেখি।' আমি তাহাই করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গান শুনতে পাচ্ছিস?' আমি উত্তর করিলাম, 'একটু একটু পাচ্ছি।'

বঙ্কিম। 'আরও জোরে কান বন্ধ কর।' এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। আমি তাহাই করিয়া বলিলাম, 'এখন কিছুই শুনিতে পাই না।'

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'তবে একবার কথকঠাকুরের মুখপানে চা দেখি।' আমি কিছুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বালক বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সম্মুখে আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের চোখরাঙা ভুরু-ভাঙা দেখিয়া আমরা মাথা হেঁট করিলাম। বোধহয় এস্থলে আর বুঝাইতে হইবে না যে যদি একজন বধির কোনো মুদ্রাদোষ বিশিষ্ট গায়কের গান শুনিতে বসেন, তিনি গান শুনিতে পাইবেন না, কেবল গায়কের হাত মুখ নাড়া, নানা-প্রকার অঙ্গভঙ্গী ও দন্তের নানারূপ বিকাশ দেখিয়া হাসিয়া উঠিবেন। আমার তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনে ঐরূপ দুষ্টামী করিতেন। যদি কোনো গায়কের গান ভাল না লাগিত, আপনি আপনার কান টিপিয়া গায়কের মুখ-প্রতি চাহিয়া থাকিতেন, এবং অপরকেও ঐরূপ করাইতেন। হাকিম হইয়া যখন উকীল মোক্তারের বক্তৃতা শুনিতেন, তখন কান টিপিয়া তাহাদের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিতেন কি না, সে বিষয়ে কোনো সংবাদ আমরা পাই নাই। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রদর্শিত প্রকরণ কিছুদিন তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এই ক্ষুদ্র লেখকও আ[illegible]কেন।

তাঁহার একটি জমিদার আত্মীয়ের নাক বড় লম্বা ছিল, তিনি তাঁহার সহিত তামাশা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি পেট ভরে খেতে পান তো?'

ইহা শুনিয়া জমিদারবাবু খুব হাসিয়াছিলেন। ঐরূপ কথার দুষ্টামী তাঁহার যাবজ্জীবন ছিল, বাল্যকালে কিংবা কোনো কালে বাক্য ভিন্ন কার্যে তাঁহার দুষ্টামী ছিল না।

প্রতিদিন কথকতা শেষ হইলে বালক বঙ্কিমচন্দ্র কথকঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিতেন, এবং নানা প্রশ্ন করিতেন। কথকঠাকুর তেমন পণ্ডিত ছিলেন না, সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন না, সুতরাং বিরক্ত হইতেন। এইরূপ প্রতি-দিন করাতে কথকঠাকুর একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজকে (সঞ্জীবচন্দ্র) বলিলেন, 'আপনার এ ভাইটি আমায় বড় বিরক্ত করিয়া থাকে।' বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজের তখনো কৈশোর উত্তীর্ণ হয় নাই,—তিনিও একজন প্রতিভাশালী যুবক ছিলেন, হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'বালক শিখিবার জন্য আপনাকে বিরক্ত করে।' সেই অবধি বঙ্কিমচন্দ্র আর কথকঠাকুরকে কোনো প্রশ্ন করিতেন না।

প্রতিদিন কথকতা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি চেয়ার অথবা টুল লইয়া নদীতীরে বসিয়া থাকিতেন, পিতামহীর গঙ্গাবাস উপলক্ষে চেয়ার ও টুলের অভাব ছিল না। তিনি বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এখন তিনি রহস্য প্রিয় বালক নহেন, সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গাম্ভীর্যশালী প্রবীণের স্বভাব পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহীর গঙ্গাতীরে বাসকালে প্রথম দুই সপ্তাহ কৃষ্ণপক্ষ ও শেষ সপ্তাহ দেবীপক্ষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিন সপ্তাহকাল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগীরথীর তীরে বসিতেন, কখনো আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে—তাহাই দেখিতেন, কখনো বা আকাশে কাস্তের ন্যায় চাঁদ উঠিতেছে—দেবীপক্ষে তাহাই দেখিতেন, সঙ্গিগণ তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি দ্বারা তারা গুণিত, 'ঐ একটা, ঐ দুটো, রাখাল বল দেখি, তোর আমার ক' চোক?' সে উত্তর করিত 'চার চোক। ঐ দেখ, শুক্র শালার এক চোক্।' এইরূপে অন্যান্য বালকগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিত, কিন্তু প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র একমনে ভাগীরথী তীরে সন্ধ্যার সৌন্দর্য দেখিতেন। অন্ধকার ধীরে ধীরে নদীবক্ষে বিচরণ করিতেছে, দেখিতে দেখিতে নদীবক্ষ গাঢ় অন্ধকারময় হইল, কিছুই দেখা যায় না, কেবল এ-পারের ও-পারের নৌকাশ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোগুলি মনুষ্য-জীবনের আশার ন্যায় একবার নিবিতেছে, একবার জ্বলিতেছে, আর দুই একখানি পানসী অন্ধকারে কলিকাতার দিকে বাহিয়া

যাইতেছে, তাহাদের দাঁড়ের ছপ ছপ শব্দ শুনা যাইতেছে। এই বাল্যস্মৃতি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পুস্তকের স্থানে স্থানে অঙ্কিত করিয়াছেন, যথা:—

'সন্ধ্যাগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। রজনীদত্ত তিমিরাবরণে গঙ্গার বিশাল হৃদয় অস্পষ্টিকৃত হইল। সভামণ্ডলেপরিচালক-হস্ত-জ্বালিত দীপমালার ন্যায়, অথবা প্রভাতে উদ্যান-কুসুমসমূহের ন্যায় আকাশে নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল। প্রায়ন্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশসমীরণ কিঞ্চিৎ খরতরবেগে বহিতে লাগিল। - - - নাবিকেরা নৌকাসকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।'—মৃণালিনী।

আর একস্থানে লিখিয়াছেন,—'নবীন শরদুদয়ে ভাগীরথী বিশালোরসী বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর প্রতিঘাতে কজ্জলতরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী নববারি-সমাগমে প্রহ্লাদিনী।'—মৃণালিনী।

দুই

এই গ্রামের দক্ষিণদিকে একটি অপ্রশস্ত খাল ছিল। বর্ষাকালে ভাগীরথীর জলে উহা পূর্ণায়তন হইয়া পূর্বদিকে একটি বিলে মিশিত; খালটি এমন অপ্রশস্ত যে, উভয় পার্শ্বের গাছের ডালের পাতায় পাতায় মিশিয়া ঐ খালের উপর পাতার ছাদ হইয়াছিল, সেজন্য খালটি সর্বদা অন্ধকারময় থাকিত। বঙ্কিমচন্দ্রের স্কুলে (হুগলী কলেজ) যাইবার জন্য একটি ছোট ডিঙি নৌকা ছিল। তিনি বর্ষাকালে প্রায় সর্বদাই স্কুলের ছুটি হইলে বাটীতে প্রত্যাগমন না করিয়া, বরাবর ঐ নৌকাতে ঐ খালে প্রবেশ করিতেন; এই লেখকও ঐ নৌকাতে থাকিতেন, কেন না, তিনিও বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ঐ স্কুলে যাইতেন। তাঁহার নৌকা খালে প্রবেশ করিলে, উহার উপরের পাতার ছাদ হইতে অসংখ্য পক্ষী উড়িত, চীৎকার করিত, আবার বসিত। খালের উভয় পার্শ্বে নিবিড় বন ছিল, তাহাতে নানা প্রকার বনফুল ফুটিত। বর্ষার জলে গাছগুলি অর্ধনিমজ্জিত, নৌকা প্রবেশ করিবামাত্র উহার জলতাড়নে তাহারা নানাবর্ণের ফুলের সহিত হেলিত, দুলিত, নাচিত। বালক কবি তাহাই দেখিতেন, হাসিতেন, ক্ষণকালের জন্য তাহারা তাঁহার সঙ্গী হইত।

তখন তাঁহার বয়স তের কি চৌদ্দ হইবে। একদিন গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সদরবাটীতে আসিয়া তাঁহার নৌকার মাঝিকে ও দ্বারবানকে উঠাইলেন, (পূর্বে ইহা বন্দোবস্ত ছিল) পরে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিঃশব্দে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বর্ষাকাল,

পূর্ণিমারাত্রি, চন্দ্রমা মধ্যগগনে বিরাজ করিতেছেন, নীলাকাশে অসংখ্য তারা জ্বলিতেছে, পৃথিবী আলোকময়ী, নিস্তব্ধ। একটা কুকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। বালক কবির সেই অন্ধকারময় খালে বিচরণ করিবার উপযোগী সময় বটে। বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসঙ্কোচে নৌকায় উঠিলেন, কিছু দূর ভাগীরথী বাহিয়া গিয়া খালে প্রবেশ করিলেন। এই সময় জলোচ্ছ্বাসে খাল পরিপূর্ণ ছিল। প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি ফিরিলেন। উঁহার এই খালে বিচরণের কথা পৌরজনের মধ্যে কেহ জানিতে পারে নাই। কেবল তাঁহার অনুজ (এই লেখক) যিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে শয়ন করিতেন, তিনিই জানিতেন, কিন্তু ভয়ে ঐ কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। অনুজ কিছু দূর তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধমক খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের 'সাগ্‌রেত' 'সাধুরঞ্জন' 'প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথ অধিকারীর সহিত কবিতা লেখার যুদ্ধ করিতেন। নিশীথে খাল-বিচরণ অতি অল্প দিনের মধ্যেই কলম-জাৎ হইল। যথা—

'মহারণ্যে অন্ধকার, গভীর নিশায়।
নির্মল আকাশ নীলে, শশী ভেসে যায়॥
কাননের পাতা ছাদ, নাচে শশিকরে।
পবন দোলায় তার সুমধুর স্বরে॥
নীচে তার অন্ধকারে, আছে ক্ষুদ্র নদী।
অন্ধকার মহাস্তব্ধ, বহে নিরবধি॥
ভীমতরু-শাখা যথা পড়িয়াছে জলে।
কল কল করি বারি সুরবে উছলে॥
আঁধারে অস্পষ্ট দেখি যেন বা স্বপন।
কলিকাস্তবকময় ক্ষুদ্র তরুগণ॥
শাখার বিচ্ছেদে কভু, শশধরকর।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে নীল জলোপর॥'—'ললিতা' প্রথম সর্গ।

তিন

যে গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাটী তাহার আশে পাশে বড়ো বড়ো গ্রাম, আর সম্মুখে অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে তিন-চারিটি বড়ো বড়ো নগর ছিল, তাহাতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। সে কারণ দুর্গোৎসবের

বিজয়ার দিন ভাগীরথীবক্ষে বড় সমারোহ হইত ; এক্ষণে কাল মাহাত্ম্যেই হউক, অথবা দরিদ্রতা জন্যই হউক, সেরূপ সমারোহ আর নাই। ঐ সময় বিজয়ার দিনে বিকালে ফরাসডাঙার নীচে অনেক নৌকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দশভুজার প্রতিমা লইয়া জাহ্নবীবক্ষে বিচরণ করিত ; কোনো নৌকাতে যাত্রা হইত, কোনো নৌকাতে নাচ হইত, আর এই সকল নৌকার কিঞ্চিৎ দূরে অর্থাৎ বাহির-নদীতে অনেকগুলি ছত্রহীন বাচের নৌকা বাচ খেলাইয়া বেড়াইত, ইহাকেই 'বোট রেস' বলে। কাহারও বার দাঁড়, কাহারও বা ষোল দাঁড়। এই সকল নৌকা সন্ সন্ বেগে যাইতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, এবং অন্যান্য নৌকার দাঁড়ীদিগের গাত্রে দাঁড়ের জল দিতেছে! দর্শকগন দশভুজার প্রতিমা ভুলিয়া গিয়া এই বাচের নৌকা-গুলির গতি দেখিতেছে, এবং বাহবা দিতেছে।

তখন চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়ঃক্রম, তখন একখানি নৌকাতে বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতাদিগের সহিত ফরাসডাঙায় ভাসান দেখিতে গিয়াছিলেন। আসিবার সময় সন্ধ্যা হইল। ভাগীরথীর পূর্বতীরে শ্মশানভূমিতে একটি শবদাহ হইতে-ছিল। নিকটে অনেকগুলি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ; একটি স্ত্রীলোক উন্মত্তার ন্যায় প্রজ্জলিত চিতাতে ঝাঁপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গিনি-গণ তাহাকে ধরিল। অবশেষে এই সদ্যোবিধবা স্ত্রী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল, সকলেরই ঐরূপ হইল। নৌকাতে অব-স্থিতিকালে বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যঃ একটি গীত রচনা করিলেন। ঐ নৌকাতে এই লেখক ছিলেন, তাহাকে চুপি চুপি ঐ গানটি শুনাইলেন ; কেন না, তাঁহার অগ্রজেরা ঐ নৌকাতে ছিলেন। কিছুদিন ঐ গানটি মল্লার রাগিণীতে প্রচলিত ছিল, পরে লুপ্ত হইয়া যায়। গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে, আর নাই ; যথা—

'হারালে পর পায় কি ফিরে মণি—কি ফণিনী, কি রমণী ?'

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বঙ্গসাহিত্যের পুনরুজ্জীবন হয়। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবিত—ভূদেব, মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র কলম ধরিয়া ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তখন স্ফুটনোন্মুখ। বঙ্গকুলকামিনিগণ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধানা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী। এই সকল লেখকদিগের মধ্যে দু-চারিজন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় সমবেত হইলে তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথোপকথন হইত, কেহ যদি তাহা বিবৃত করিতে পারিত, তাহা হইলে, উহা যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে সাদরে পঠিত হইত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই কথোপকথনে দেশী ও বিদেশী কাব্য ও নানাশাস্ত্রের আলোচনা এবং নূতন পুস্তকাদির সমালোচনাও হইত। ভাটপাড়ার মহামহোপাধ্যায়গণ উপস্থিত থাকিলে, চুটকি বিচারও চলিত। আবার এই কথোপকথনের মধ্যে শান্তিপুরের একটা ভূত কিরূপ সমারোহে তাহার বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছিল, সে গল্পও থাকিত, দীনবন্ধুর গল্প এবং নানা প্রকার রহস্যের কথাও থাকিত। আমি কখনো এই কথোপকথন বিষয়ে কিছু লিখিবার চেষ্টা করি নাই। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত লিখিতে বসিতাম, তাহা হইলে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু সে সময় আমার অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন বঙ্কিম-প্রসঙ্গ দুই-চারিটা প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কেবল তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে।

কথিত আছে যে, প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগের জীবনচরিত লিখিত হয়, প্রধানতঃ লোকশিক্ষার জন্য। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের দুই-একটা ঘটনা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কোনো উদ্দেশ্য লইয়া লিখি নাই। এ বয়সে সেসব কথার আলোচনায় নিজে তৃপ্তি পাই, তাই লিখি, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধু, ও পাঠকগণের সে সকল ভাল লাগিতে পারে, এই জন্য লিখি।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান। পিতৃদেব তখন ঐ স্থানে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতি সাহেব উহার হেড মাস্টার ছিলেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ঐ স্কুলে যাইতেন। একদিন ঐ সাহেব ক্লাস-পরিদর্শনে আসিয়া তাঁহার পরিচয় লইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র অনুজের কথা বলিবার সময় তাঁহার যে এক বেলার মধ্যে বর্ণ-পরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। টিড্ সাহেব শুনিয়া প্রীত হইলেন, এবং পরে তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহা ঘটিল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে বৈকালে টিড্ সাহেবের বিবি লোক পাঠাইয়া লইয়া যাইতেন। আমাদের বাসার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠে স্কুল ছিল। ঐ স্কুল বাটীতেই তাঁহাদের বাসা ছিল। এখন সেখানে স্কুল নাই, সে মাঠে সরকারী বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন বৈকালে ঐ স্থানে যাইতেন। এই সময়ের মলেট সাহেব নামে এক হ্যালুবরি সিভিলিয়ান মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। টিড্ সাহেবের বিবির সহিত তাঁহার বিবির বিশেষ প্রণয় ছিল। টিড্ সাহেবের বিবি তাঁহার ছেলেদিগকে ও বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া প্রতিদিন বৈকালে ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠীতে যাইতেন। মলেট সাহেবের বাটী আমাদের বাসার উত্তরে, মধ্যে কেবল একটা মাত্র উচ্চ প্রাচীরের ব্যবধান। শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র বসিয়া বিবিদের সহিত গল্প করিতেন, ও তাঁহাদের ছেলেরা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করিত। বঙ্কিমচন্দ্র দৌড়াদৌড়ি করিতে পারিতেন না, সেজন্য কখনো বলিষ্ঠও ছিলেন না।

এইরূপ প্রায় তিন বৎসর কাল বৈকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। হঠাৎ একটা ঘটনায় যাতায়াত বন্ধ হইল। একদিন সন্ধ্যার সময় মলেট সাহেবের কুঠীর মাঠে টেবিল-চেয়ার পড়িল। বিবিরা চা প্রস্তুত করিতে উঠিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কুঠীর ভিতর হইতে একজন অপরিচিত সাহেব আসিয়া ছেলেদের ডাকিয়া লইয়া চা খাইতে গেলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকেন নাই। বালক বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন; পরে আর ঐ কুঠীতে যান নাই— টিড্ সাহেবের কুঠীতে গিয়াছিলেন বটে। ইহার দিন কয়েক পরেই পিতৃদেব কলিকাতায় আলিপুরে বদলি হইলেন। এই সময় মলেট

সাহেবের সহিত পিতৃদেবের দেখা হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কুঠীতে যাতায়াত বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া সাহেব আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিন বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিলাতি পরিবারের সংশ্রবে আসায় তাঁহার কোনো ফল ফলিয়াছিল কিনা, তাহা কেহ বুঝিতে পারে নাই।

মেদিনীপুর ত্যাগ করিবার প্রায় এক বৎসর পূর্বের কথা আমার মনে পড়ে। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁঠালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন সেসন্ খুলিলে তথায় ভর্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট টিউটব নিযুক্ত হইল।

কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিখিলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠাগ্রজের বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর বিস্তর ভদ্রলোক আসিতেন। তন্মধ্যে একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। যেটি ভাল লাগিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন, এবং ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করাইয়া লইতেন। আর, বাংলা কবিতাগুলি—যাহা সর্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত। তখন তাঁহার সহিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু আমাদের বাটীতে 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জন' পত্রিকা আসিত। উহার মধ্যে যে কবিতাগুলি ভাল লাগিত। বঙ্কিমচন্দ্র সে সমস্তই কণ্ঠস্থ করিতেন।

একালে যেমন রেসিটেশন্-এর একটা হুজুক উঠিয়াছে, পুরস্কারের জন্য ছাত্রেরা ঘরে ঘরে বাংলা ও সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে অনেকগুলি শ্লোক ও কবিতা তেমনই আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার আবৃত্তির সময়াসময় ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র সুলেখক বলিয়া সাধারণে পরিচিত, কিন্তু তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট পাঠক ছিলেন তাহা অনেকে জানেন না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের নূতন সৃষ্টি হইলে উহার নামে আমার গায়ে জ্বর আসিত। কিন্তু যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রকে "মেঘনাদবধ কাব্য" পাঠ করিতে শুনিলাম, সেইদিন হইতে আমি এই কাব্যের গোঁড়া হইলাম। কতবার উহা পড়িয়াছি, তাহার ঠিক নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে পড়িতাম। তিনি যখন পুস্তক পাঠ করিতেন, সকলে নিঃশব্দে শুনিতেন। বাল্যকালে তিনি যখন কবিতা বা শ্লোক আবৃত্তি করিতেন, তখন আশে-পাশে লোক দাঁড়াইয়া শুনিত। একদিন তিনি তাঁহার পড়িবার ঘরে বসিয়া "পদাঙ্কদূতে"র 'গোপীভর্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী' ইত্যাদি

শ্লোকটির আবৃত্তি করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ ঘরে অনেকগুলি পণ্ডিত প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে দেশবিখ্যাত পরমপূজ্য পণ্ডিত ৺ হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় ছিলেন। ইঁহারা পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি এই পড়িবার ঘরে থাকিতাম, পড়ি-না-পড়ি, একখানি পুস্তক হাতে লইয়া বসিয়া থাকিতাম। আর সময় সময় ঢুলিতাম। বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময় ঢুলিতে ঢুলিতে ঐ স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িতাম। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একজন প্রতিভাবান ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বোধহয়, স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ভিন্ন তাঁহার তুল্য পণ্ডিত বাংলাদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বসাইলেন ও তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অনুরোধে শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন। ইহার পর হইতে চূড়ামণি মহাশয় মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের অনেক কথা শুনাইতেন। তাঁহারই নিকট "নলোপাখ্যান" ও "শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান" আমি প্রথম শুনি। আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা চূড়ামণি মহাশয়ের প্রতিভাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, নতুবা এই অসাধারণ পণ্ডিত বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শিক্ষা দিবার জন্য এত চেষ্টিত হইবেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তর্কচূড়ামণি মহাশয় পিতৃদেবের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু বালক দুইটা ভাষা একসঙ্গে শিখিতে পারিবে না, এই উত্তরে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের একটা কবিতা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে সর্বদা শুনিতাম,—

'বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।'

যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রের ছন্দোবন্ধের বড় প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বের প্রশংসা করিতেন না। দুর্গেশনন্দিনীর আশমানীর রূপবর্ণনা পাঠ করিলে সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এই মত চিরস্থায়ী ছিল কিনা জানি না, কেন না, তাঁহার মতামত চিরদিনই পরিবর্তনশীল ছিল, সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থগুলি প্রতি সংস্করণে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্তিত হইত। এমনকি, তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে "ইন্দিরা" উপন্যাসটি আবার রি-রাইট করিবেন, এমন ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

জয়দেবের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী' কবিতাটি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কি বাল্যে, কি কৈশোরে, কি যৌবনে, এই কবিতাটি তাঁহার মুখে শুনিতাম। যখন নিষ্কর্মা হইয়া বসিতেন, বাহিরের লোক কেহ ঘরে

থাকিত না, তখন উহা আওড়াইতেন। ঐ কবিতাটি যে তাঁহার প্রিয় ছিল। তাহার স্মৃতি "আনন্দ মঠে" রাখিয়া গিয়াছেন, যথা—

'ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে বরনারী
মা কুরু ধনুর্ধরি গমন বিলম্বন মতি বিধুঁরা সুকুমারী।'

আর একটি গীত তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যকালে আপনি গীতটিতে মাতিয়াছিলেন। পরে আনন্দমঠের সন্তানদিগকেও এই গীতে মাতাইয়াছিলেন। একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে এই গীত তিনি প্রথম শুনিলেন। মাঘমাসের প্রথমেই এক রাত্রিশেষে এক বৈষ্ণব খঞ্জনী বাজাইয়া সদর রাস্তায় এই গানটি গাহিতেছিল, আমি তখন জাগ্রৎ—মধুরকণ্ঠে এইরাত্রে কে গীত গাহিতেছে শুনিয়া অগ্রজকে উঠাইলাম; গান শুনা যাইতেছিল না। অগ্রজ একটা জানালা খুলিয়া দিলে গীতটি শুনিতে পাইলাম—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে, গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে।' বৈষ্ণব এই গীতটি গাহিতে গাহিতে ঠাকুর-বাটীর দিকে চলিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' আওড়াইতে আওড়াইতে জানালা বন্ধ করিলেন। পররাত্রে ঠিক ঐ সময়ে আসিয়া বৈষ্ণব সেই গীতটি গাহিল। এইরূপ কয়েক রাত্রি ধরিয়াই তিনি গানটি শুনিলেন। ইহার পর অষ্টপ্রহর এই গীতটি তাঁহার মুখে শুনিতাম।

দোলের পূর্বরাত্রে আমাদের ঠাকুর-বাড়িতে বড় ধূম হইত। নেড়াপোড়া হইত। অনেক বাজি পুড়িত। রাত্রে যাত্রা অথবা কীর্তন হইত। এই উপলক্ষে অনেক ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইতেন, ইতর লোকের তো কথাই ছিল না। মেদিনীপুর হইতে আসিবার পর প্রথম দোলযাত্রার এই দিন আমার বিশেষ স্মরণ আছে। ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রি—মধুযামিনী—বঙ্কিমচন্দ্র চিরদিনই স্বভাবের সৌন্দর্য দেখিতে ভাল বাসিতেন, আজ রাত্রে তাঁহার ভারি স্ফূর্তি,—কখনো অর্জুনা পুষ্করিণীর ধারে, কখনো গঙ্গাতীরে কখনো বা এখানে-ওখানে বেড়াইতেছেন—অবশেষে ঠাকুর-বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর-বাড়িতে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলিয়া মন্দিরমধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। কীর্তন হইবে, চারিদিকে আলো জলিতেছে। এক স্থানে অনেকগুলি ভাটপাড়ার পণ্ডিত পৃথগাসনে বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তিনি ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে বসিয়া বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রীকৃষ্ণের অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটি এই যে, যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য আপনি কষ্ট-

কবিয়া আসিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ইতর-ভদ্র, মেয়ে-পুরুষ সকলেই জপ করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি ষোলশো গোপিনীর ভর্তা ছিলেন? তিনি গোপিনীদিগের বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র ইহার পূর্বে বাংলা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিবামাত্র সমবেত পণ্ডিত ও ভদ্রলোকগণ স্তম্ভিত হইলেন। চূড়ামণি মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রকে আদব করিয়া বসিলেন, এ প্রশ্নেব উত্তব আমি তোমাকে পরে দিব, এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা কবিলেও তুমি তাহা বুঝিতে পাবিবে না? তবে এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র।

এই প্রশ্নে কি প্রাচীন, কি যুবা, সকলেই সে বাত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন, কেন না, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত! তাঁহারা জানিতেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া লীলাখেলা করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে সামান্য ঘটনা সামান্য কথা বহুদিন ধরিয়া আন্দোলিত হইয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রেব এই কথা লইয়া কিছুদিন বিস্তর আন্দোলন চলিয়াছিল। সেই জন্যই কথাটা আমার স্মরণ আছে। আক্ষেপের বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্রের পরমবন্ধু চূড়ামনি মহাশয় ইহার অল্পকাল পরেই স্বর্গারোহণ করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেকালের পল্লিগ্রাম মাত্রেই পাঠশালা থাকিত। আমাদের গ্রামেও পাঠশালা ছিল। আমাদের বাটীর সন্নিকটে একটি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে তো নহে। হুগলি কালেজে ভর্তি হইবার পূর্বে তাঁহাকে একজন প্রাইভেট টিউটর সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বালক, উপনয়ন হয় নাই। এই অবস্থায় তিনি মধ্যে মধ্যে ঐ পাঠশালায় উপস্থিত হইতেন। গুরুমহাশয় কায়স্থ সন্তান, বড় রাসভারি লোক, ছাত্রেরা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। যখন তিনি ভূমিতে বেত আছড়াইয়া, 'লেখ্ লেখ্ শুয়াবরা' বলিয়া চীৎকার করিতেন তখন ছাত্ররা থরহরি কাঁপিতে থাকিত। বালক বঙ্কিম, এক একদিন বৈকালে এই পাঠশালায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনাস্বরূপ গুরুমহাশয় হাসিয়া তাঁহার হস্তে বেতগাছটি তুলিয়া দিতেন। বালক বঙ্কিম বেত লইয়া কোনো কোনো ছাত্রের নিকট গিয়া তাহার পরীক্ষা করিতেন। ছাত্রেরা কেহ বা তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ, কেহ সমবয়স্ক, কেহ বা বয়ঃকনিষ্ঠ। অধিকাংশ ছাত্র তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে দুই-তিনজন বালকের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের মাথার উপর বেত তুলাইয়া বলিতেন, "মারি মারি, আজ তোমরা কেন আমাদের বাড়ি তাস খেলতে যাও নাই?" বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে খেলার মধ্যে কেবল তাস খেলিতেন, দুই প্রহরের সময়ে ঐ কয়জন বালকের সহিত কোনো কোনো দিন তাস খেলিতেন। বালকদিগের দৌড়াদৌড়ি এবং অন্যান্য খেলা—যাহাতে শরীরের পুষ্টিসাধন করে—তাহা খেলিতেন না। খেলিতে ভাল লাগিত না, সেইজন্য দুর্বল ও ক্ষীণদেহ ছিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বালকদিগের পরীক্ষা করাতে তাহাদের উৎসাহ হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বাল্যকালে দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতেছিল। উহার প্রভাবে অন্যান্য বালকেরা তাঁহাকে ভক্তি করিত। সকলে তাঁহার নিকট ঘেঁষিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও ভাল বলিলে, তাহার আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধিত হইত। স্কুলে, কলেজে, তাঁহার সমাধ্যায়ীদিগের উপরও ঐরূপ প্রভাব ছিল, ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভারই মহিমা। লেখাপড়ার উৎসাহ প্রদান করা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যখন যৌবনে একজন বিখ্যাত বাংলা লেখক হইলেন, তখন

অনেকগুলি সুশিক্ষিত যুবককে উৎসাহ দিয়া লেখক করিয়াছিলেন, ও তাঁহারা এক একজন বিখ্যাত লেখক হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র না জন্মাইলে, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কখনও বাংলা ভাষার লেখক হইতেন না, চিরকাল ইংরাজি লেখক থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় ও অনুপ্রাণনে তাঁহারা বাংলা ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

পৌষ কি মাঘ মাসে একদিন সূর্যোদয়ে পাঠশালায় যাইয়া গুরু মহাশয়-দত্ত বেত লইয়া, বালক বঙ্কিম কোনো একটি বালকের নিকট বসিয়া তাহার লেখা-পড়া দেখিতেছিলেন, এমন সময় একটা গোল উঠিল যে, গঙ্গারঘাটে গোরার বহর লাগিয়াছে। এই সংবাদে চারিদিকের লোকজন, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কি বালক—ছুটাছুটি করিয়া পলাইতে লাগিল। পাঠশালার ছাত্রগণ পাততাড়ি ফেলিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় চটিজুতা পায়ে ফট-ফট শব্দে পলাইলেন। একব্যক্তি একবাজরা বেগুন লইয়া নৈহাটির বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল, সে উহা আমাদের ঠাকুর-বাড়ির দরজার নিকটে ফেলিয়া পলাইল। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা-ঘাট নির্জন হইল। সকল বাটির দরজা বন্ধ হইল, কেবল বালক বঙ্কিমের জন্য আমাদের বাড়ির দরজা খোলা রহিল, তিনি গুরু মহাশয় প্রদত্ত বেত হাতে করিযা আমাদের বাটীর দরজার নিকট রাস্তার ধারে দাঁড়াইলেন। সুতরাং আমাদের যত লোকজন ছিল, তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। পিতৃদেব তখন তাঁহার কর্মস্থলে, অগ্রজদ্বয়ও তাঁহার নিকটে। গ্রামে গোরার বহর লাগিয়াছে শুনিয়া গ্রামবাসীরা বিপদ ভাবিয়া পলায় কেন! সেকালে পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরারা কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত। পীড়িত গোরারা নৌকাযোগে আসিত। যেস্থানে সূর্যোদয় হইত, সেই স্থানে ঐ সকল গোরা প্রাতঃক্রিয়ার জন্য ডাঙায় উঠিত, এবং গ্রামে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকারে উৎপাত করিত। দুই-তিন বৎসর পূর্বে একবার গোরারা আমাদের গ্রামে নামিয়া ঐরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহর শুনিলে আমাদের গ্রামের লোকের হৃৎকম্প হইত। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুমহাশয়-দত্ত বেত্রহস্তে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময়ে একদল গোরা আসিতেছে দেখা গেল। তাহারা আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি কথা কহিতে লাগিল, একজন বেতটি লইয়া দেখিতে লাগিল, এইরূপে দলে দলে গোরা আসিতে লাগিল। বালক বঙ্কিম স্থিরভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অর্ধঘণ্টার মধ্যে তাহারা ফিরিয়া গেল, বহর ছাড়িয়া দিল, গ্রাম আবার সজীব হইল।

কথাটা অতি সামান্য বটে, কিন্তু যে গ্রামের লোকেরা গোরার ভয়ে পলা-

ইল, সকল দরজা বন্ধ হইল, বালক বঙ্কিম সেই গ্রামেই প্রতিপালিত, আকাশ হইতে পড়েন নাই। তিনি নির্ভয়ে বেত্রহস্তে গোরার সম্মুখে দাঁড়ান কেন, এই তেজটুকু বালকের পক্ষে অসামান্য বোধ হওয়াতেই এই স্থলে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিলাম। তিনি নিজেই চন্দ্রশেখরের একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন যে 'বাঙালীর ছেলে মাত্রেই জুজুর নামে ভয় পায়, কিন্তু এক একটি এমন নষ্ট বালক আছে যে, জুজু দেখতে চায়।'

বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন। মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না। একজন ভাল এক্স্‌জিকিউটিভ্‌ অফিসার ছিলেন। তথাপি কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না ১৭।১৮ বৎসর বয়ক্রমকালে আমি পিতৃ-দত্ত একটি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। তিনি পূজার ছুটিতে কর্মস্থল হইতে বাড়ি আসিয়া উহা জানিতে পারিয়া ঘোড়াটি বিক্রয় করাইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইনিই বাল্যকালে একদিন ডাকাতদের ভয় করেন নাই, কৈশোরে নদীবক্ষে ঝড় তুফানের ভয় করিতেন না, আর যৌবনে গুলি-ভরা পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া একজন সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দশ কি এগার বৎসর, তখন একদিন সংবাদ আসিল যে একদল ডাকাত আমাদের বাটীতে ডাকাতি করিবে। পিতৃদেব তখন বাটী ছিলেন না। জ্যেঠামহাশয়, খুড়ামহাশয়, পিসেমহাশয় প্রভৃতি মুরুব্বিগণ বন্দোবস্ত করিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা ও আমরা চারিভ্রাতা কয়েক রাত্রের জন্য প্রতিবাসীর গৃহে বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র বালক বঙ্কিম বাঁকিয়া বসিলেন। কুঞ্চিত কেশরাশি দুলাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'তাহা কখনই হইতে পারে না। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইব না।' পিসে-মহাশয় বলিলেন, 'তবে ডাকাত আসিয়া সকলকে কাটিয়া যাক।' বঙ্কিম বলিলেন, 'কেন কেটে যাবে? আমাদের বাড়িতে তো অনেক লোক আছে, আর গ্রামের তেওর বাগ্‌দি, যাহারা এক একজন লাঠিয়াল, ও বোম্বেটেগিরি করে, তাহাদের নিযুক্ত করুন। সাধ্য কি যে, ডাকাতরা আমাদের কেটে যায়!' তাঁহার অগ্রজদ্বয়েরও ঐ মতে মত হওয়াতে, বালক বঙ্কিমের পরামর্শমতে কার্য হইল। কয়রাত্রি ধরিয়া অনেক লোক আমাদের বাড়ি পাহারা দিত। ডাকাত আবার ফিরিয়া গেল। ঐ দিন হইতে গুরুজনেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে "বাঁকা" বলিয়া ডাকিতেন।

আমাদের গ্রামের আড়পারে হুগলি কালেজ, প্রায় সাত-আট বৎসর ধরিয়া

বঙ্কিমচন্দ্র নৌকা চড়িয়া ঐ কালেজে যাইতেন। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভেই এক একদিন ছুটির সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইত। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'কেমন রে, নৌকা ছাড়বি?' মাঝি নৈহাটীর পাটনি, কখন "না" বলিত না, নৌকা খুলিয়া দিত। কোনো কোনো দিন ঝড় উঠিবার পূর্বে নৌকা ঘাটে গিয়া পৌছিত, আর কোনো কোনো দিন মাঝগঙ্গায় পৌছিতে-না-পৌছিতে কালমেঘ দিগন্ত অন্ধকার করিত। নদীর জল কাল হইত। অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রবলবেগে ঝড় উঠিত। ভীষণ তরঙ্গ সকলের মাথাগুলি ভাঙিয়া ফেনার রাশিতে যেন নদীব বক্ষে তুলার মাড ভাসিত। যাঁহারা নদীবক্ষে ঝড়ে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কি ভয়ানক দৃশ্য। বঙ্কিমচন্দ্র একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেন। যিনি ষাঁড়গরু দেখিয়া ভয় পাইতেন, তিনি প্রকৃতির এই সর্বসংহারিণী মূর্তি অজ্ঞান হইয়া দেখিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কালেজ পরিত্যাগ করিবার তিন-চারি বৎসর পূর্বে, আমি ঐ কালেজে ভর্তি হই। সুতরাং আমাকেও মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত এই বিপদে পড়িতে হইত।

বাইশ-তেইশ বৎসব বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই সময়ে একজন নীলকর সাহেব, হাতির শুঁড়ে মশাল বাঁধিয়া একখানি গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল। তখন বেঙ্গল পুলিশের সৃষ্টি হয় নাই, ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে পুলিস কাজ করিত। দারোগাগণ ঐ সাহেবটিকে কোনোমতে ধরিতে পারিত না। কেন না তাঁহার নিকট সর্বদা গুলিভরা পিস্তল থাকিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পিস্তল গ্রাহ্য না করিয়া সাহেবটিকে গ্রেপ্তার করিলেন। সাহেবটি ব্রিটিশ বর্‌ন সাব্‌জেক্ট। সুতরাং হাইকোর্টে সোপরদ্দ হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ আদালতে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, কেন না তিনি উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচরিত্রের এইরূপ বিচিত্র আসামঞ্জস্য মধ্যে মধ্যে লক্ষিত হইত।

এইসঙ্গে একটা রহস্যের কথা মনে পড়িল, উহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক দিবস এরূপ কুয়াশা চারিদিক ব্যাপিয়া ছিল যে, কোলের মানুষ দেখা যায় নাই। আমার জীবনে কখনও ঐরূপ কুয়াশা দেখি নাই, কেন না, উহা প্রায় ১০।১১টা অবধি ছিল। আমরা সাড়ে-নয়টার সময় নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা ছাড়িতে বিশেষ আপত্তি করিল, বলিল, দিক ঠিক করিতে পারিব না। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শুনিলেন না, নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিলেন। তখন ভাঁটা, নৌকা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। আমাদের নৌকা দশ-পনর মিনিটে কালেজ ঘাটে পৌছিত। কিন্তু প্রায় একঘণ্টা হইল, নৌকা

চলিতেছে, কিন্তু কোথায় কালেজের ঘাট। নৌকা কেবল চলিতেছে, চলিতেছে! বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?' মাঝি বলিল, 'আজ্ঞে, তা জানি না।' 'সে কি রে?' 'আজ্ঞে, বোধহয় ভাঁটার স্রোতে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি।' মাঝি হাল ছাড়িয়া বসিয়া আছে, নৌকা ক্রমাগত স্রোতে ভাসিতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল হাসিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে নৌকা আপনা-আপনি একস্থানে তীরলগ্ন হইল। বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কোন্ জায়গা?' মাঝি বলিল, 'বুঝি মূলাজোড়?'

"কপালকুণ্ডলা" গল্পটি যে কুজ্ঝটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় এই ঘটনাবলম্বনে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যে এবং কৈশোরে গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন। কিন্তু যে-সে লোকের নিকট নহে, কিংবা যা-তা গল্প নহে—সেকালের লোকের নিকট, সেকালের গল্প। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই-একখানি উপন্যাস কোন কোন ঘটনা অথবা কোন কোন গল্প অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। গত চৈত্র মাসের 'ভারতী'তে "বঙ্কিমচন্দ্র-দীনবন্ধু" প্রবন্ধে কি ঘটনা অবলম্বনে কপালকুণ্ডলা রচিত হইয়াছিল তাহা লিখিয়াছি। এই প্রবন্ধে আরও দুইখানির কথা লিখিব। আমাদের খুল্ল-পিতামহ একশত আট বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি আমার পিতামহের মধ্যম ভ্রাতা। তাঁহাকে আমরা মেজ-ঠাকুরদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা সকলে গল্প শুনিতাম। যাহা শুনিতাম, তাহা বাংলার ইতিহাসের অন্তর্গত; উহা প্রায়ই বঙ্গের মুসলমান রাজত্বের অবসান কালের কথা। ইনি গল্প করিতে ভাল-বাসিতেন ও গল্প করিতে জানিতেন। আধুনিক কোনো কোনো বিদেশী গল্প-লেখকেরা যেমন নায়ককে মিস্টার ও নায়িকাকে মিস লিখিয়া থাকেন, এই বর্ষীয়ান তাঁহার নায়ককে মির্জা ও নায়িকাকে বিবি বলিতেন। তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনিয়াছিলেন; যদিও ঐ ঘটনা আকবর শাহা বাদশাহের সময় ঘটিয়াছিল, তথাচ তিনি উহা জানিতেন। সেকালের প্রাচীনেরা মুসলমান বাদশাহদিগের সময়ের অনেক ঘটনা জানিতেন। আমাদের মেজঠাকুরদাদার মধ্যে মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যাতায়াত ছিল। মান্দারণ গ্রাম, জাহানাবাদ ও বিষ্ণুপুরের মধ্যস্থিত। ঐ অঞ্চলে মান্দারণের ঘটনাটি উপন্যাসের ন্যায় লোকমুখে কিম্বদন্তীরূপে চলিয়া আসিতে-ছিল। মেজঠাকুরদা উহা ঐ স্থানে শুনিয়াছিলেন এবং মান্দারণের জমিদারের গড় ও বৃহৎ পুরী ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে

উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারের পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুতকুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন। এই গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্র আঠার-উনিশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শুনিয়াছিলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইল। সরকারী কার্যোপলক্ষে সঞ্জীবচন্দ্র কিছুকাল জাহানাবাদে ছিলেন। তিনিও ঐ ঘটনাটি সেখানে শুনিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। তখন বোধহয় দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের 'মতিবিবি' একটা গল্প অবলম্বনে রচিত হয়। কোনো দরিদ্র গৃহস্থের বধূ যৌবনারম্ভে কুলত্যাগিনী হইয়া কোনো ধনাঢ্য যুবার রক্ষিতা হয়। প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পরে হঠাৎ একদিন তাহার স্বামীকে দেখিল, দেখিয়া তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, সে কান্না আর থামিল না। কিছুদিন পরে প্রভুর অতুল ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া তাহার যাহা-কিছু সঞ্চিত ধন ছিল, তাহা লইয়া স্বামিদর্শন আকাঙ্ক্ষায় তাহাদের গ্রামে আসিয়া বাস করিল। এমত স্থানে বাসা লইল, যাহাতে প্রতিদিন স্বামীকে দেখিতে পায়, প্রতিদিন তাহাকে দেখিত, আর কাঁদিত। এইরূপ দিবানিশি কাঁদিত। কুলত্যাগিনী হইলেও তাহার প্রতিবেসিনিগণ তাহার দুঃখ শুনিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিত। এইরূপে কিছুদিন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই চির-অভাগিনীর যৌবনেই জীবনান্ত হইল।

ইহার চরিত্রের সঙ্গে মতিবিবির কোনো সাদৃশ্য নাই বটে, কিন্তু ঘটনার সাদৃশ্য আছে।

বর্ষীয়ান খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয়ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি। ইঁহার গল্প করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। যেরূপে ঐ সময়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহা আমার বোধহয় একজন লেখকেও পারিত কিনা সন্দেহ। সেকালের লোক "ফসল" "অজন্মা" এই সকল কথার, সর্বদা আন্দোলন করিতে ভালবাসিত। মেজঠাকুরদা প্রথমে ফসলের কথা তুলিলেন। পরে কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল, তাহা বিবৃত করিলেন। তিন-চারি বৎসর পূর্ব হইতে, অজন্মা হইল, আর ঐ বৎসর (১১৭৬ সালে) ফসল হইল না, এই কয় বৎসর অজন্মার ফলে নিম্নশ্রেণীর লোকদের আহার বন্ধ হইল, পরে মধ্য-শ্রেণীর গৃহস্থের, পরে ধনবানদেরও আহার বন্ধ হইল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর

লোকদিগের কাহারও কাহারও লক্ষ লক্ষ টাকা পোঁতা থাকিত, (সেকালে এইরূপে টাকা সঞ্চিত থাকিত), তবুও তাহারা অনাহারে মরিতে লাগিল, কেন না, টাকা খাইতে পারে না, টাকাতে যে ধানচাল কিনিবে, তাহা দেশে নাই। এইরূপ অবস্থাতে বঙ্গে নানা প্রকার পীড়ার আবির্ভাব হইল, অবশেষে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল। যাহাদের ঘরে টাকা পোঁতা ছিল, তাহারাও অন্না-ভাবে চোর-ডাকাত হইল। এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার অগ্রজের উহা মনে ছিল, কেন না, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধহয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোনো উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই। কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে "আনন্দমঠ" লিখিলেন।

"বন্দে মাতরম্" গীতটি উহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই গীতটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি ভবিষ্যৎ-বাক্য আছে। কয়েক বৎসর হইল শ্রীমান ললিতচন্দ্র মিত্র "সাহিত্যে" উহার সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিয়া ছিলেন বটে, তথাপি আমার যতটুকু স্মরণ আছে, আমিও লিখিলাম। বঙ্গদর্শনে মধ্যে মধ্যে দুই-এক পাত ম্যাটার কম পড়িলে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি তাহা ঐ দিনেই লিখিয়া দিতেন। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই-একটি "লোক-রহস্যে" প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। "বন্দে মাতরম্" গীতটি রচিত হইবার কিছু দিবস পরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া জানাইলেন, প্রায় একপাত ম্যাটার কম পড়িয়াছে। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আচ্ছা, আজই পাবে।' একখানি কাগজ টেবিলে পড়িয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের উহার প্রতি নজর পড়িয়াছিল, বোধহয় উহা পাঠও করিয়াছিলেন; কাগজখানিতে "বন্দে মাতরম্" গীতটি লেখা ছিল। পণ্ডিত মহাশয়, বলিলেন, 'বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখা আছে, উহা মন্দ নয় তো—ঐটা দিন-না-কেন।' সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কাগজখানি টেবিলের দেরাজের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল-কি-মন্দ, এসব তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিছুকাল পরে উহা বুঝিবে—আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি থাকিতে পার।' এই গীতটির একটা সুর বসাইয়া উহার গাওনা হইত। একজন গায়ক প্রথমে উহা গাহিয়াছিলেন। বহুকাল পরে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র সুর বসাইয়াছিলেন; পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী আর একটি সুর বসাইয়াছিলেন। বেহাগ সুরে ভাল লাগিলে লাগিতে পারে।

কমলাকান্তের "এসো এসো বঁধু এসো!"

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রজনী গভীর। গ্রাম নিস্তব্ধ। এমন সময় কোনো এক গৃহস্থের বাটীর সদর দরজা হইতে একটি লোক দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূরে আসিয়া বন্দুকের একটি আওয়াজ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুষুপ্ত গ্রামবাসিদিগকে জাগরিত করিয়া চারিদিক হইতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল। ঐ গৃহস্থের বাটীতেও ঐরূপ ঢাকঢোল বাজিল। মহাষ্টমী রাত্রিতে সন্ধিপূজা আরব্ধ হইল। সেকালে সকলের বাড়িতে ঘড়ি থাকিত না। সেইজন্য এই বাটীর গৃহস্থ বন্দুকের শব্দে অন্যান্য পূজা বাটীর কর্তৃপক্ষগণকে সন্ধিপূজার সময় জ্ঞাপন করাইতেন। রাত্রি তখন কত, তাহা আমার মনে নাই, কেন না, বহুকালের কথা। অনুমান দ্বিতীয় প্রহর হইবে, অষ্টমীর চাঁদ তখনো অস্ত যায় নাই। এই গৃহস্থের বাটীর ভিতর সর্বত্র আলোকময়। যে-দিকে চাহিবে, সেই-দিকেই আলোকের মালা, ছোট ছোট প্রদীপের আলো, সন্ধিপূজার আলো। গুটিকতক বালক ঐ আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল যেটি নিভিতেছিল, তৎক্ষণাৎ সেইটি জ্বালিয়া দিতেছিল। পূজার দালানেও ঐরূপ আলো, দশভুজার সম্মুখ হইতে উঠানে নামিবার সিঁড়ি পর্যন্ত ঐরূপ দীপের শ্রেণী। অল্পক্ষণ পরেই ঢাকঢোল বাজনা বন্ধ হইল, কেবলমাত্র দশভুজার সম্মুখে পুরোহিত ও তন্ত্রধারের মন্ত্রোচ্চারণ-শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভিতর দালানের মধ্যস্থলে সিংহ-পৃষ্ঠে অসুর-মর্দিনী বাটী আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, সম্মুখে স্তূপাকার বিল্বপত্র ও নানাপ্রকার ফুল, তন্মধ্যে পদ্মফুলের ভাগই বেশি, তাহার নিকটে পুরোহিত ও তন্ত্রধার বসিয়া পূজা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সন্নিকটে একটি থামে ঠেস দিয়া পৃথক আসনে একব্যক্তি বসিয়া, ইনি দেখিতে সাধারণ মনুষ্যের মতো নহেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধহয়, তিনি যেন সকলের হইতে স্বতন্ত্র। ইনিই বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা, কোনো মহাপুরুষের মন্ত্রশিষ্য, নিষ্কামধর্মাবলম্বী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবীচৌধুরানী ইঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, 'যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মের ব্রত করিয়াছিলেন ইত্যাদি।' এই মহাপুরুষের বয়ঃক্রম তখন প্রায় অশীতিবৎসর অতীত হইয়া থাকিবে।

দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, দেহ না-ক্ষীণ, না-স্থূল, অথচ বয়সোপযোগী বলিষ্ঠ, খড়্গের ন্যায় নাসিকা, চক্ষু দুইটির দৃষ্টি অতি তীব্র, মস্তক ও মুখমণ্ডল কেশহীন। কেবলমাত্র একখানি চাদরে গা ঢাকিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে বসিয়াছিলেন। বাড়ির দালানে কতকগুলি প্রাচীন ভদ্রলোক মাথায় চাদর জড়াইয়া একখানি গালিচায় বসিয়া জপ করিতেছিলেন। প্রতিমার পশ্চিম দিকে, অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে কতিপয় সধবা, বিধবা, প্রাচীনা গলায় অঞ্চল দিয়া বসিয়া জপ করিতেছিলেন।

আমি একটি থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। কি দেখিতেছিলাম ঠিক মনে নাই। ছেলেগুলি আলোর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পাছে তাহারা আলোতে কাপড় ধরাইয়া ফেলে, বোধহয় তাহাই দেখিতেছিলাম। এমন সময়ে আমার পশ্চাতে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। ফিরিয়া দেখিলাম—বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহাকে দেখিয়া আমি ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়া টানিলেন, অর্থাৎ সরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে, গোঁফের চুল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। মস্তকের অনেকগুলি কেশ পাকিয়াছে। তখন বঙ্গদর্শনের পূর্ণ-যৌবন—বঙ্গসাহিত্যে, সমাজে তাহার একাধিপত্য। তিনি অনেকক্ষণ স্থিরভাবে প্রতিমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোনো কথা নাই।

আমি তাঁহার কিছু পূর্বে আসিয়া অসুরের মাথায় কৃষ্ণবর্ণের একটি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহা যে কি, দূর হইতে তাহা বুঝিতে পারি নাই, পরে জানিয়াছিলাম, উহা বিল্বপত্র। বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অসুরের মাথায় ওটা কি?' কিছুক্ষণ পরে তিনি উত্তর করিলেন, 'উহা গণেশের ইঁদুর।' আমি বলিলাম, 'গণেশের ইঁদুর অসুরের মাথায় কেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'ক্ষুদ্র জানোয়ারদের অসুরের ঘাড়ে উঠিবার ঠিক এই সময় হইয়াছে, —দেখ, ঐ কার্তিকের ময়ূর অসুরকে ঠোকরাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতেছে, —আর ঐ দেখ, প্রতিমার চারিধারে সোলার পাখীগুলা আছে, উহারা ডানা ঝাড়িতেছে, উহারা উড়িয়া আসিয়া অসুরের ঘাড়ে বসিয়া ঠোকরাইবে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'অসুরের অপরাধ?' তিনি বলিলেন, 'অপরাধ কিছুই নহে, যাহারা প্রবল প্রতাপান্বিত, অপরাজেয়, যাহাদের সকলে ভয় করে, তাহাদের মুমূর্ষু অবস্থাতে ক্ষুদ্র প্রাণিগণ তাহাদের উপর যথাসাধ্য অত্যাচার করে।' আমি বলিলাম, 'অসুরের তো এখন মুমূর্ষু অবস্থা নহে, ঐ দেখুন, ভীষণ মূর্তি ধরিয়া দেবীকে তরোয়াল উঠাইয়া মারিতে উদ্যত।'

তাঁহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'বটে বটে! বীর পুরুষেরা, তেজস্বী পুরুষেরা, শত্রুহস্তে ঐরূপেই মরে, মরেও মরে না, কিন্তু অসুরের আর কি আছে, অসুর তো মরেছে, সিংহ ভীষণ দন্ত দ্বারা উহাকে কামড়াইতেছে। আর দেবী একটা ভয়ানক সাপ উহার গায়ে ছাড়িয়াছেন, সে মুহুর্মুহুঃ উহাকে ছোবলাইতেছে, আর তিনি স্বয়ং দক্ষিণের একহস্তে বর্শাদ্বারা সজোরে উহার বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছেন, আর বাকী অষ্ট হস্ত প্রসারণ করিয়া উহাকে নানা অস্ত্র দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করিতেছেন,—অসুর মরেছে, ক্ষুদ্র প্রাণীদের ঘাড়ে চড়িবার এই তো সময়।' কথাগুলি আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহা আমি আমার নিজের ভাষায় সাজাইয়া বলিলাম।

এই কথোপকথনের পর বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গেলেন। আমিও তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিলাম। সেখানে কেহ তামাক খাইতেছিলেন। কেহ বা খোস গল্প করিতেছিলেন, প্রায় সকলেই বঙ্কিমের প্রতিবাসী। কেহ কেহ প্রথম রাত্রের ফলাহারের পর আর বাটী যান নাই, ঐ ঘরেই ছিলেন। আর কেহ কেহ বাদ্যোদ্যম শুনিয়া আসিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বিদেশীয়, ঐ গ্রামের কোনও একব্যক্তি ঈস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে আফিসে চাকুরি করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান চাকুরি কলিকাতায় বড়মানুষদিগের মো-সাহেবী। যখন পরিবার পিত্রালয়ে থাকিতেন, তখন ইনি প্রতি শনিবারে ও অন্যান্য ছুটিতে কাঁঠালপাড়ায় আসিতেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের নিকট সর্বদা থাকিতেন। এই বাবুটির কথা এইস্থানে উল্লেখের কারণ—পরে প্রকাশ পাইবে। আর একটি বিদেশী লোক অতি কুণ্ঠিতভাবে বসিয়াছিল। ইহার নাম বলহরি দাস, রানীহাটী পরগণায় ইহার বাটী, যে স্থানের কীর্তন 'রেনিটী'র কীর্তন বলিয়া বিখ্যাত। এই লোকটি ভাল কীর্তন গাহিতে শিখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজের নিকটেই থাকিত। অদ্য তাঁহারই আদেশানুসারে উপস্থিত ছিল। কিছুক্ষণ পরে সকল ভ্রাতা উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও আসিলেন। বিখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র কোনো মজলিসে প্রবেশ করিলে সভাস্থ সকলের গায়ে যেন ইলেকট্রিসিটি ছড়াইয়া দেয়, সকলেই উল্লসিত হয়। আমি দেখিয়াছি, এই গুণটি যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল তাহা নহে। দীনবন্ধু ও হেমচন্দ্রেরও ছিল; মধুসূদনের কিয়ৎ পরিমাণে ছিল বটে, কিন্তু সে অল্পরূপ। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মজলিস সরগরম হইল, যাঁহারা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিলেন, তাঁহারা উঠিয়া বসিলেন।

হাসির হররা উঠিল, তামাকের ধোঁয়াতে ঘরের আলো মিট মিট করিতে লাগিল। অনেকে শুনিয়া চমকিত হইবেন, কেহ বা বিরক্ত হইবেন, আমরা চারিভ্রাতা একত্র বসিয়া তামাক খাইতাম—অতিরিক্ত তামাক খাইতাম। এমন কি, মুখ হইতে নল নামিত না। শুনিলে আরও হাসিবেন, আমি এ প্রাচীন বয়সে ধূমপান করিয়া জীবিত আছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র কিছুক্ষণ পরে ঐ মোসাহেব বাবুটি তাঁহাকে আত্মীয়তার ভাবে অনেক কথা শুনাইতে লাগিলেন।

কলিকাতার লোকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছিল, তাহাই শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অপরাধ এই যে, তিনি তাঁহার বঙ্গদর্শনে "উত্তর-চরিতে"র সমালোচনা করিতে গিয়া পুরাতন লেখকদলের চাঁইকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।*

পুরাতন দলের লেখকগণ ও তাঁহাদের ভক্তেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে যেরূপ গালি-গালাজ করিয়াছিল, মোসাহেববাবু তাহা শুনিয়া আসিয়া সে কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু গালি শুনিয়া কোনো উত্তর দিলেন না। কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল—দুই ভ্রূ এক হইল। আর সজোরে ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন। খুব বেশি পরিমাণে ধূম উদ্গীরণ হইতে লাগিল।

এই "উত্তর-চরিতে"র সমালোচনা সম্বন্ধে আরও-একটা কথা এখানে মনে পড়িয়া গেল। বঙ্গদর্শনের একজন প্রসিদ্ধ লেখক একদিন ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পুরাতন দলের চাঁইকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে কেন?'

উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'পুরাতন মন্দিরগুলিকে নাড়াচাড়া করা উচিত নয় কি?' লেখক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?' বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'নাড়া চাড়া করিতে করিতে মন্দিরগুলি ভাঙিয়া পড়িবে, উহার স্থানে নূতন মন্দির উঠিবে।'

তাহাতে লেখক কি বলিলেন, তাহা ঠিক মনে নাই। তবে উহার মর্ম এই যে, 'উহা বড় কঠিন।'

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন, 'দেখা যাউক।' বঙ্কিমচন্দ্র এক "উত্তর-চরিতে"র সমালোচনায় পুরাতন দলের প্রধানকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহাতে

* বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণকালে বিদ্রূপ-কথাগুলি তুলিয়া দিয়াছিলেন।

আবার পুরাতন ভাঙিয়া নূতন গড়িবেন বলিয়া গর্ব করিয়াছিলেন, এই দুই কারণে পুরাতন দলে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব হইতেই উঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার বিরোধী ছিলেন। যখন "দুর্গেশনন্দিনী" প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন হইতেই তাঁহারা বিরোধী। "সোমপ্রকাশ" কাগজে "দুর্গেশনন্দিনী"র সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা বঙ্কিমের ব্যাকরণ-দোষ, ভাষা, উপন্যাসখানি ইংরেজি গল্পের অনুকরণ, এই কয় দোষ ধরিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের ব্যাকরণ-শিক্ষা ভালরূপেই হইয়াছিল। ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তবে কেন যে লিখিতে বসিলে সকল সময়ে ব্যাকরণ গ্রাহ্য করিতেন না, তাহা বোধহয় আধুনিক লেখকদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সুহৃদ দীনবন্ধু "সোমপ্রকাশের" সমালোচনার উত্তর দিয়া কিছু দিনের জন্য পুরাতন লেখকদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইত আর তাঁহারা ঝাঁকিয়া উঠিতেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক লেখা বন্ধ হয়। কেন না উহা অসাধু ভাষায় লিখিত, এবং বিদেশীয়ভাবে পরিপূর্ণ। উহা পাঠ করিলে লোকের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না, তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা দুর্দমনীয় বেগে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। ঐ ভাষার নামকরণ হইল বঙ্কিমী-ভাষা, এবং তাঁহার পুস্তকের "দূষিত বিদেশীয়ভাব" জাতীয় উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপন করিল।

যাহা হউক, এ বারে মহাঅষ্টমীর সেই রাত্রের কথা বলি। রাত্রি তখন অধিক হইয়াছিল। আলস্য বোধ হওয়াতে আমি একটা তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিলাম, ঘুমাইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, হঠাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অতিদূরনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। আমার যে কি সুখানুভব হইল, তাহা যাঁহারা নিশিথে অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় মধুর সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল অনুভব করিতে পারিবেন। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, আর পূর্বোল্লিখিত কীর্তন-গায়কটি ঐ ঘরে একটি গীত গায়িতেছিল। যেমন মধুর গীত, তেমনই মধুর স্বর। আমি স্থিরভাবে রহিলাম। পাছে নড়িলে এ মোহ ঘুচিয়া যায়। অনেকক্ষণ ধরিয়া গায়ক গীতটি গায়িল। গীতটি এই—

'এসো এসো বঁধু, এসো' আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মানিক নও যে, হার ক'রে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ!
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণ নিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইতে কেশ নাহি বাঁধি
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥'

অনেকক্ষণ পরে গীত বন্ধ হইল। গায়ক বাহিরে উঠিয়া গেল। আমি তখন উঠিয়া বসিলাম, এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র বামহস্তে মস্তক রাখিয়া নীরবে বসিয়া আছেন, মুখ হইতে নল অনেকক্ষণ খসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দৃষ্টি কোথায়? একখানি ছবির প্রতি। ছবিখানি বিলাতি ছবি, একটি অনুপমা সুন্দরী, এক ছড়া মতির মালা গলায়, আর এক-ছড়া মতির মালা একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে সঙ্কুচিতভাবে তুলিতেছেন। আর হাসি হাসি মুখে বাম দিকে অপাঙ্গে কাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, যেন কাহার অমতে তুলিতেছেন।

অলঙ্কারপ্রিয়া সুন্দরীর একছড়া মতির মালায় মন উঠে নাই, আবার এক-ছড়া তুলিতেছেন, যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সেই ব্যক্তি ঐ পটে অঙ্কিত নাই। ছবিখানি সুন্দর, সকলেই উহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কি ঐ ছবির সৌন্দর্য দেখিতেছিলেন? তাহা নহে। কে বলিবে তাঁহার মনে তখন কি হইতেছিল? মানবের স্বভাব এই, একাগ্রভাবে চিন্তা করিবার সময় সাধারণত সে অনন্যমনে একটা পদার্থের প্রতি চাহিয়া থাকে; তাহার দৃষ্টি একস্থানে আবদ্ধ থাকে। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। সম্মুখে ঐ ছবিটি ছিল, সে জন্য দৃষ্টি উহার প্রতি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছেন—

'যখন এই গান কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশ-তলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত—মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টি কুশলী

কবির সৃষ্টি দৈব বংশী লইয়া মেঘের উপর যে বায়ুস্তর শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই—এই গীত কখনো ভুলিতে পারিলাম না, কখনো পারিব না।'

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন গান শেষ হইলে ছবির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন, তেমন তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র গীত শেষ হইলে শয়ন করিয়া কড়ি বরগার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। তিনিও প্রতিভাশালী, তাঁহার মনে কত কি উদয় হইতেছিল। কে জানে? গায়ক পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। আবার গান আরম্ভ হইল। এবার অন্য গান হইল, 'এস তোমার নয়নে লুকাইয়া থাকো' ইত্যাদি। ভাবিলাম, ইহা অন্য কবির রচিত। এমন সময়ে সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন, 'এ অন্য কারিগরের হাতের।' তারপরে অনেক বৈষ্ণব কবির, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতির রচিত গীত চলিল। অবশেষে 'এসো এসো বঁধু এসো' গাইবার ফরমাশ হইল। আবার সেই সুরের তরঙ্গ উঠিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইল, সকলে নিস্পন্দ হইয়া শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইল। ইতিমধ্যে কে একজন আমার নিকটের জানালা খুলিয়া দিল, জানালার মধ্য দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভোর হইয়াছে। কিন্তু তখনও একটু অন্ধকার আছে, নীলাকাশে নক্ষত্রগণ হীনজ্যোতি হইয়াছে, কেবল পূর্বদিকে একটা তারা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে। উহা বুঝি শুকতারা। বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র মাঠ ছিল, তাহার পূর্বে ও দক্ষিণে আম্রকানন ছিল। উহার গাছগুলির উপর অসংখ্য পাখী কলরব করিতেছে। ক্রমে ফরশা হইল, পাখিগুলি আহারান্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে উড়িয়া গেল, আর বৈঠকখানার বাবুরা আপন আপন কার্যে চলিয়া গেলেন। এইস্থলে মহাষ্টমীর রাত্রিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র 'এসো এসো বঁধু এসো' গানটি প্রথম শুনিলেন। উহার বহুদিন পরে কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রসন্ন গোয়ালিনীকে "বঙ্গদর্শনে" এই গান শুনাইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধুত্ব বঙ্গে আদর্শস্বরূপ ছিল। ইঁহাদের বন্ধুত্বের কথা বঙ্গদেশে সুশিক্ষিত সমাজে বিখ্যাত। ইঁহারা যখন উভয়েই বালক, তখন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইয়া "প্রভাকরে" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তের কি চৌদ্দ বৎসর হইবে। উভয়েই কবিতা লিখিতেন। কখনো দেখাশুনা নাই, চোখাচোখি নাই, পত্রের দ্বারা এই সময় ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল। ইউরোপের 'রয়্যাল লাভারস'দের ন্যায় ভালবাসা জন্মিল। সর্বদাই উভয় উভয়কে পত্র লিখিতেন। কখনো কখনো পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত। আদরের কবিতা, কখনো গালাগালির কবিতা থাকিত। "প্রভাকরে" দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র কবিতাতে পরস্পর পরস্পরকে গালি দিতেন। সংবাদপত্রে উহাকে কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, রহস্যপ্রিয় দীনবন্ধুর জন্য উহা ঘটিয়াছিল।

আমার স্মরণ আছে, বহুকালের কথা সে,—একদিন একখানি পত্র পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় হাসিয়া উঠিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে—পত্রে কি লিখিয়াছে?' তিনি কোনো উত্তর না দিয়া আবার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন, আবার হাসিলেন। এইরূপ বারংবার পড়িয়া পত্রখানি বাক্সের ভিতর রাখিলেন। আমি তখন 'দেখি দেখি' বলিয়া উহা তাঁহার হাত হইতে লইবার চেষ্টা করিলাম—আমি তখন বালক, আমাকে ধমক দিয়া দাদা বাক্স বন্ধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এইরূপ ছিল যে, যদি কখনোও কাহারও উপর বিরক্ত হইয়া ধমক দিতেন, তাহার পরক্ষণেই আবার সেই ব্যক্তিকে ভাল কথা বলিতেন। এই স্থলে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। পরক্ষণেই নরমস্বরে আমাকে বলিলেন, 'তুমি কি বুঝিবে? ইহা কবিতা। দীনবন্ধু কবিতায় আমাকে গালি দিয়াছে।' আমি বলিলাম, 'আপনিও গালি দিয়া লিখুন।' 'উত্তরে তিনি বলিলেন,' লিখিব বই কি!'

আমি তখন দীনবন্ধুর নাম শুনিয়াছিলাম। "প্রভাকর" ও "সাধুরঞ্জন" সংবাদপত্রে কবিতার নীচে দীনবন্ধুর নামও দেখিতাম।

দীনবন্ধুর বাল্যকালের পত্রগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের বাক্সের ভিতর থাকিত। সেগুলি কি হইল, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। ঐ পত্রগুলি যে এক্ষণে

সাহিত্যসমাজের ভিতর আদরের হইত, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঐরূপ পত্রের দ্বারা বিদ্রূপ করবার অভ্যাস তাঁহাদের চিরদিনই ছিল। দীনবন্ধু কোনো এক বিশেষ সরকারী কার্যোপলক্ষে কাছাড়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সে স্থলের এক যোড়া জুতা, যাহা এখানে তখন পাওয়া যাইত না, বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন, এবং তাহার সহিত একখানি তিন কথার পত্র লিখিয়াছিলেন। যথা—'বঙ্কিম, কেমন জুতো?' পত্রখানি আমি পড়িয়াছি; অনেকেই পড়িয়াছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র উত্তরে কি লিখিয়াছিলেন তখন আমরা জানিতে পারি নাই। পরে সঞ্জীববাবুর নিকট শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'তোমার মুখের মতোন।'

হাস্যরসে ও বাকপটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, এইরূপ অনেকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন। কেবল একব্যক্তি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পরাভূত করতেন। তিনি অতি সামান্য ব্যক্তি, অশিক্ষিত, কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমান, ব্রাহ্মণ, কুলীনের সন্তান, স্বাধীন, অর্থাৎ জমিজমা চাষ বাস ইত্যাদিতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার জীবিকা নির্বাহ হইত। ইনি ভাঁড়ামীতে অদ্বিতীয় ছিলেন। সেকালের বিখ্যাত ভাঁড় শান্তিপুরের গুরুচরণ বাঁড়ুয্যে ওরফে গুরোতুম্বো মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাটীতে আসিতেন, কিন্তু এ ব্যক্তিকে পরাস্ত করতে পারতেন না। ইঁহার নাম মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি নাচ দেখিয়া নাচিতে, গান শুনিয়া গায়িতে শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কখনো কোনো ওস্তাদের নিকট শিক্ষা পান নাই। ইনি সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতাদিগের বৈঠকখানায় থাকতেন। একদিন কাঁঠালপাড়ার বাটীতে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র ও অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। এমন সময়ে ভাটপাড়ার এক ভট্টাচার্য মহাশয় (পণ্ডিত মহাশয় নহেন) উপস্থিত হইলেন। শিষ্যগৃহে গমন উপলক্ষে ইঁহার সর্বদা কৃষ্ণনগরে যাতায়াত ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় কথায় কথায় দীনবন্ধু পত্নীর সুখ্যাতির কথা করিতে লাগিলেন। সকলেই আনন্দ সহকারে ইহা শুনিতেছিলেন, কিন্তু উল্লিখিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একযোড়া ঘুঙুর পায়ে দিয়া একটি গীত ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন। (ঘুঙুর জোড়াটি ঐ ঘরে সংগ্রহ করা থাকিত)। গীতটি এই—

'কালা তাই বটে, কালা তাই বটে,
বাবলার গাছে গোলাপফুল ফোটে।'

এই গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল। দীনবন্ধু খুব হাসিলেন। দীনবন্ধুর পত্নীর সুখ্যাতির পর এই গীতের অর্থ এই বুঝাইল যে, দীনবন্ধু বাবলাগাছ ও

তাঁহার পত্নী গোলাপফুল—বাবলাগাছে গোলাপফুল ফুটিয়াছে। ঐ দিবস হইতে দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্নী-সহোদর-বাচক সম্বোধন করিয়া ডাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহাতে নারাজ ছিলেন না। এক বৎসর শ্যামাপূজার সময় বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার দুই অগ্রজ ভ্রাতা যখন কৃষ্ণনগরে দীনবন্ধুর সহিত দেখা করিতে যান, তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহাদের সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে দীনবন্ধু তাঁহার পত্নীর নাম করিয়া ভাই-ফোঁটার দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় সাদরে উহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আহারের সময় গোল বাধিল। ছাই পাঁশ, গরুর চোনা ইত্যাদি বন্দ্যোপাধ্যায়কে খাওয়াইবার জন্য দীনবন্ধু অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সফল হইতে পারেন নাই। সাধ্বী পতিপরায়ণা, যিনি ভাইফোঁটা দিয়াছিলেন, তিনি অদ্যাপি জীবিতা।

যশোহরে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমের প্রথম চাক্ষুষ আলাপ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বাহাল হইয়া যান, দীনবন্ধু তখন ঐ ডিভিসনের পোস্ট-অফিস সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। এই দুই অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির মিলনে বঙ্গসাহিত্যের কি শুভ ফল ফলিল, তাহা বিস্তারিত করিয়া লেখা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষমতাতীত। এই মিলনের পর হইতে দুইজনে প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন। একজন বঙ্গের প্রধান নাট্যকার হইলেন, দ্বিতীয়জন প্রধান ঔপন্যাসিক হইলেন। প্রথম ব্যক্তি "নীলদর্পণ" রচনা করিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি "দুর্গেশনন্দিনী" প্রণয়ন করিলেন। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" যে সাহিত্য সমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। লং সাহেব কারারুদ্ধ হইলেন, একজন বড় সিভিলিয়ান অপদস্থ হইলেন, এবং অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রীম কোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, দীনবন্ধুর প্রথম নাটকখানি সর্বাংশে শক্তিশালী, এবং কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট। এই নাটকখানি ইউরোপে অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস সাহিত্য জগতে ভাষার ও ভাবের যে নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছে, তাহা বলাও নিষ্প্রয়োজন। "দুর্গেশনন্দিনী"র আবির্ভাবে প্রথমত কলিকাতার সংস্কৃত ওয়ালারা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজি ওয়ালারা অবশ্য দুহাত তুলিয়া বাহবা দিয়াছিলেন। উদাহরণস্বরূপ একটি সামান্য ঘটনা এস্থলে প্রকটিত করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনো পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও সে

পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে দিতেন না। কিন্তু "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হইবার পূর্বে উহা কাঁঠালপাড়ার বাটীতে অনেককে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। বোধহয়, তাঁহার নিজের লেখনী-শক্তির প্রতি তখন তাদৃশ বিশ্বাস জন্মে নাই, সেজন্য অন্যের মতামত জানিবার আকাঙ্খা হইয়াছিল। আমাদের পিতাঠাকুরের সহিত ও ভ্রাতৃপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অনেক ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিতেন, ভাটপাড়ার খ্যাতাপন্ন পণ্ডিতগণও আসিতেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; কেবলমাত্র একজন জীবিত, তিনি কাশীবাস করিতেছেন। এক সময় বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার ঠিক মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত "দুর্গেশনন্দিনী" তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেও শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। একটি দুই বছরের শিশু ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট দাঁড়াইয়া খড়খড়িব পাখি টানিতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া ঐ ছেলেটিকে কোলে লইয়া বাহিরে চাকরদিগের নিকট রাখিয়া আসিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অহিফেনভোগী ছিলেন, মুহুঃমুহু তাঁহাদের তামাক আবশ্যক হইত তাঁহারা তামাক ডাকিতে ভুলিয়া গেলেন। পণ্ডিত-মহাশয়েররা নস্যের ডিবা খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন কিনা, সেটি আমি লক্ষ্য করি নাই, কেন না, আমিও অনন্যমনে পাঠ শুনিতেছিলাম। একজন প্রাচীন ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, 'আ মরি, আ মরি! কি বক্তৃতাই করিতেছেন।' এইরূপে দুইদিনে গল্পপাঠ শেষ হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে "দুর্গেশনন্দিনী"র ভাষা ব্যাকরণ দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্পপাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাষায় ব্যাকরণ-দোষ আছে উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?' মধুসূদন স্মৃতিরত্ন (সংস্কৃত কলেজের হৃষীকেশ শাস্ত্রীর পিতা,) বলিলেন, 'গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি।' বিখ্যাত পণ্ডিত ৺চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলিলেন যে, 'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণ দোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও সুন্দর হইয়াছে। ভাটপাড়ার পণ্ডিত মহাশয়দিগের মতামত এস্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা কলিকাতার পণ্ডিত-দিগের অপেক্ষা কোনো শাস্ত্রে খাট ছিলেন না। কিন্তু কলিকাতার যে সকল

পণ্ডিত বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র চালাইতেন, তাঁহারাই কেবল নবীন লেখকের ভাষার অবতারণা করিবার অসমসাহসে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন।

"দুর্গেশনন্দিনী" প্রচারিত হইবার পূর্বে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেববাবুর জামাতা) এবং সেকালের বিখ্যাত-সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য উহা পাঠ করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিয়াছিলেন, 'তোমায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তুমি "দুর্গেশনন্দিনী" অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিবে, কিন্তু এই উপন্যাসটি যেমন সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিবে, তেমন তোমার অন্য উপন্যাস করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ?' ক্ষেত্রনাথের ভবিষ্যৎ বাক্য সফল হইয়াছিল। যতদিন না "দেবীচৌধুরানী" প্রকাশিত হইয়াছিল, ততদিন "দুর্গেশনন্দিনী"রই বিক্রয় বেশী ছিল।

"নবপ্রকাশিত "সংকল্প" মাসিকপত্রে কোনো প্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারানী" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়া অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা গ্রন্থখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।' কথাটা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি উপরেই বলিয়াছি যে বঙ্কিমচন্দ্র যখন "দুর্গেশনন্দিনী"র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন, তখন সঞ্জীবচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন, তিনি অনুজের উপন্যাসখানি শুনিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্যামাচরণও পরে উহা পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ—মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন তাঁহার অনুজ তারাচরণ বিদ্যারত্ন (শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের পিতা), যিনি পাণ্ডিত্যে দেশ-বিদেশে জয়ী হইয়া দিগ্বিজয়ী উপাধি পাইয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন ও মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি দশ-বারজন ধুরন্ধর পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট সর্বদাই আসিতেন; তিনি তাঁহার ইংরাজি শিক্ষিত বন্ধুদিগের যেরূপ আদর সম্মান করিতেন, ইঁহাদেরও সেইরূপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। ন্যায় কি দর্শনশাস্ত্রে ইঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না বটে, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ও ইংরাজি সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন থাকাতে পণ্ডিত মহাশয়েরা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত শাস্ত্রবিচারে হটিয়া যাইতেন। ভাটপাড়ার এক্ষণকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবরাম সার্বভৌম অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর হৃষিকেশ শাস্ত্রী যুবা বয়সে শ্লোক রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনাইতেন।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবার এক বৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিপত্নীক হইয়া পিতামাতার অনুরোধে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একবিংশতি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠদ্দশা হইতে লব্ধ-প্রসিদ্ধ। একে, বি. এ. ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তারপর দেখিতে সুপুরুষ, একুশ বছরের যুবা,—আরার তাঁহার পিতৃদেবের এ অঞ্চলে নামযশঃও ছিল, সুতরাং অনেক পাত্রী জুটিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন, সুহৃদ-প্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরে একটি পাত্রী মনোনীত করিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন। ইনি গত ১০ই ভাদ্র বুধবার সায়ংকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়া মহকুমাতে (এক্ষণে উহাকে কাঁথি মহকুমা বলে) ছিলেন, তখন সেইখানে একজন সন্ন্যাসী কাপালিক তাঁহার পশ্চাৎ লইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে নিশীথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় প্রদর্শন করিতেন, তবুও মধ্যে মধ্যে আসিত; যখন তিনি সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাঙ্গালায় বাস করিতেন, তখন এই সন্ন্যাসী প্রতিদিন গভীর রাত্রিকালে দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় বনজঙ্গল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারনা হইয়াছিল যে, ঐ সন্ন্যাসী সমুদ্রতীরে সেই বনে বাস করিত। কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ স্থান হইতে খুলনা মহকুমার (খুলনা তখন জেলা ছিল না) বদলী হন। ঐ সময়ে তিন-চারি দিন বাটীতে অবস্থিতিকালে দীনবন্ধু আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিলেন। যথা—

'যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনো কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারো মুখ না দেখিতে পায়, এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে যদি কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে?' যখন বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুকে এই প্রশ্ন করেন, তখন সেইস্থানে কেবল সঞ্জীবচন্দ্র ও আমি উপস্থিত ছিলাম।

সঞ্জীবচন্দ্র বড় ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। তিনি কহিলেন, 'যদি দরিদ্র ঘরে তাহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে মেয়েটা চোর হইবে। বনজঙ্গলে ভাল দ্রব্যাদি খাইতে পাইত না, সমাজে আসিয়া ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিয়া বড় লোভী হইবে। দরিদ্র ঘরে ভাল আহার জুটিবে না, পরের ঘরে চুরি করিয়া

খাইবে। অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পরিবে।' পরে ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলিলেন। 'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে। পরে সন্তানাদি হইলে স্বামি-পুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।' ভাবগতিকে বুঝিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা মনোগত হইল না। দীনবন্ধু কোনো মতামত প্রকাশ করিলেন না। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে "কপালকুণ্ডলা" প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাপালিকের প্রতিপালিতা কন্যাকে সমুদ্রতটবিহারিণী বনচারিণী, সৃষ্টিছাড়া এক অপূর্ব মধুর প্রকৃতির মোহিনী মূর্তিরূপে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

"বঙ্গদর্শনে"র "বিদায় গ্রহণ" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, 'দীনবন্ধু আমার সাহিত্যে সহায়, সংসারে সুখদুঃখের ভাগী' লিখিবার অবসর পাইলে দীনবন্ধুও নিশ্চয় ঐ কথাই বলিতেন। আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, যশোহরে ইঁহাদের প্রথম চাক্ষুষ আলাপের পর ইঁহারা প্রবীণ লেখকের ন্যায় কলম ধরিলেন, উভয়ে যেন পরামর্শ করিয়া লিখিতে বসিলেন; ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের তিনখানি পুস্তক, "দুর্গেশনন্দিনী" "কপালকুণ্ডলা" ও "মৃণালিনী" দীনবন্ধুর মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিষবৃক্ষ" প্রচারের কিঞ্চিৎ পূর্বে কি সেই সময়ে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়।

দীনবন্ধুর সমস্ত পুস্তক বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত লইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। "বিয়ে পাগলা বুড়ো" পুস্তকখানির প্রচার করিতে বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহা অনেক দিবস অপ্রকাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত দীনবন্ধু-জীবনীতে উহার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর "লীলাবতীতে" বঙ্কিমচন্দ্র স্থানে স্থানে লিখিয়াছিলেন, বন্ধুত্ব হিসাবে, আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন; কিন্তু হাস্যরসে দীনবন্ধুর লেখার সহিত সুর মিলিয়াছিল কিনা জানি না। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকে কিন্তু দীনবন্ধু কখনো কিছু লেখেন নাই। তাঁহার কোনো কোনো পুস্তকে শিক্ষানবিশীরূপে তাঁহার অনুজ এই ক্ষুদ্র লেখক দুই-এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছে বটে, কিন্তু সে লেখা যে কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

কোনো গৃহস্থের বাটীতে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণির এক বিখ্যাত কারিগর, নাম কালাচাঁদ পাল, দুর্গোৎসবে দশভুজার প্রতিমা গড়িত। ষষ্ঠীর দিন রাত্রিকালে বিদেশ হইতে বাটীর কর্তা আসিয়া প্রতিমা দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কালাচাঁদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই দালানে একটি লোক দাঁড়াইয়া ছিল; সে করযোড়ে বলিল, 'আজ্ঞে এ প্রতিমা আমি গড়িয়াছি।' কর্তা

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' সে লোকটি বলিল, 'আমি কালাচাঁদের ভাইপো।' কর্তা কহিলেন, 'না তা কখনই হইতে পারে না, এ প্রতিমা কালাচাঁদ গড়িয়াছে।' সে ব্যক্তি পুনর্বায় বলিল, 'আমি ইহাতে খড় জড়াইয়া এক-মেটেমো করিয়াছি, আমার খুড়ো মশাই দো-মেটেমো করিয়াছেন, মুখ গড়িয়া বসাইয়াছেন।' তখন কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া তাহাকে একটি টাকা বখশিশ দিলেন। আমি সেইরূপ দুই-একটি পরিচ্ছেদ এক-মেটামো করিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র দো-মেটামে করিয়াছিলেন। কোন্ পরিচ্ছেদে কি ঘটনা লিখিতে হইবে, তাহা তিনি বলিয়া দিতেন, আমি সেইরূপ লিখিতাম, পরে তিনি উহা তাঁহার লেখার সুরের সহিত মিলাইয়া লইতেন। আমি উপ-যাচক হইয়াই লিখিতাম, কখনো কখনো তিনি ইচ্ছা করিয়া ও আমাকে লিখিতে বলিতেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বঙ্কিম ও দীনবন্ধু প্রসঙ্গ লিখিতে নিজের কথা কেন। একটা বিষয়েব কৈফিয়ৎ দিবার জন্যই নিজের কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

"ভারতী"র "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধের লেখকের সহিত কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিয়া ছিলাম যে, "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র কোনো কোনো পবিচ্ছেদে আর উইল চুরি পরিচ্ছেদে আমার একটু আধটু লেখা আছে। এমন বুঝিতেছি, তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে পরিচ্ছেদেটি সমুদয় আমার লেখা। তজ্জন্য ১৩১৮ সালের কার্তিক সংখ্যার "ভারতী"তে "বঙ্কিম যুগ" প্রবন্ধে তিনি ভ্রমবশতঃ লিখিয়াছিলেন যে, রোহিণী ও কৃষ্ণকান্তের হাস্যরসের কথোপকথনটি আমারই লেখা। আমি তাঁহাকে কখনো এমন কথা বলি নাই যে, ঐ অংশটুকু আমার লেখা! আমি যদি পূর্ব হইতে তাঁহার নিকট পরিচিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার এমন সাংঘাতিক ভ্রম হইত না। তাঁহার সহিত ঐ আমার প্রথম আলাপ। "উইল-চুরি" পরিচ্ছেদে আমার কতটুকু লেখা আছে, তাহা নিম্নে বুঝাইতেছি।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল-চুরি পরিচ্ছেদে লিখিতে ছিলেন। এমত সময় পাঁচটার ট্রেনে কলিকাতা হইতে তাঁহার দুইটি বন্ধু আসিলেন। তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, 'কি লিখিতেছিলেন—বলিয়া দিন, আমি উহা লিখিব।' তিনি আমার আবদার রক্ষা করিয়া হাসিতে হাসিতে লিখিতে অনুমতি দিয়া; ঐ পরিচ্ছেদে যাহা লিখিতে হইবে, বলিয়া দিলেন। আমি তখন ঐ হাসির অর্থ বুঝিতে

পারি নাই, পরে লিখিতে বসিয়া বুঝিলাম—দেখিলাম, 'ব্রহ্মার বেটা' বিষ্ণু আসিয়া বৃষভারূঢ় মহাদেবের কাছে এককোটা আফিং কর্জ লইয়া ঐ দলিল লিখিয়া দিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন, মহাদেব গাঁজার ঝোঁকে ফোর-ক্লোজ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।' এই পর্যন্ত লিখিয়াছেন!—এইসুরে লেখা আমার অসাধ্য বুঝিয়া আমি এই স্থানে রোহিণীকে আনিয়া কৃষ্ণকান্তের সহিত সাক্ষাৎ করাইলাম, এবং তাঁহাদের উভয়ের কথোপকথন আমার সাধ্যমতে লিখিলাম। পরদিন বন্ধুগণ চলিয়া গেলে বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিতে বসিয়া ঐ পরিচ্ছেদে আমার লেখার প্রথমাংশ অর্থাৎ রোহিণীর সহিত কৃষ্ণকান্তের আফিমের ঝোঁকে কথোপকথন নূতন করিয়া লিখিলেন, আমার লেখার অবশিষ্ট অংশতে "দো-মেটোমো" করিতে হয় নাই, তবে এক একস্থানে "মাটি" লাগাইয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য কিছুকাল আমাদের পরিবারে প্রায় সকলের মধ্যে সাহিত্যানুশীলন অর্থাৎ লিটারারি একটিভিটি জন্মিয়াছিল, কিন্তু "বঙ্গদর্শনে"র বিদায়ের সঙ্গে উহার অবসান হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়ে আফিমের কি সাহেবসুবার কথা কহিতে ভালবাসিতেন না, ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মাত্রই সাহেবের কথা ও আফিসের কাজ কর্মের কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতেন না। এক রাত্রিতে কোনো ডেপুটির বাড়িতে একটা বড় ভোজ ছিল। ডেপুটিতে ডেপুটিতে ঘর পুরিয়া গিয়াছিল; বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতারাও উপস্থিত ছিলেন। একজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ইহার কিছু পূর্বে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কি কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা এই সভাতে আনুপূর্বিক বিবৃত বলিতেছিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—

'ধন্য এক জনা হয়েছে,

পেখের কলম কানে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা কয়েছে।'

এই ডেপুটীবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন, সেইজন্য তিনি তাহাকে এরূপ ভৎ'সনা করিলেন। একজন ডেপুটী কোনও বিশেষ সরকারী কার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, ঐ কার্যে তিন বৎসরে শেষ হইবে, কেন না ঐ কার্য সম্পাদনের জন্য জেলায় জেলায় ঘুরিয়া অনেক বিষয়ের তদন্ত করিবার ছিল। কিন্তু ডেপুটী বাপুটী ঐকার্য দেড় বৎসরে শেষ করিয়া বাহবা পাইয়াছিলেন। ডেপুটীর তাঁহার কার্যদক্ষতা ও কি প্রকারে

এত অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কার্য সমাধা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিতেছিলেন। পরিচয় শেষ হইলে দীনবন্ধু বলিলেন, 'ওহে, তবে তুমিও বুঝি ত্রেতাযুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলে!'

ডেপুটী বাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন, তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁষিতেন না। কিন্তু নানা কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহারা আনুগত্য করিতেন।

দীনবন্ধু কলিকাতায় সদর অফিসে আসিলে পোস্টাল ডিপার্টমেণ্টে তাঁহার একাধিপত্য জন্মিল। কত দরিদ্র সন্তানকে তিনি চাকুরি দিয়া অন্নদান করিয়াছেন, তাহার গণনা হয় হয় না। কাহাকেও কেরানীগিরি, কাহাকেও সাব-পোস্ট মাস্টারী, যে যাহার যোগ্য, তাহাকে তাহাই দিতেন। সেজন্য উমেদারগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন।

একদিন আমাদের বাটীতে "গোলামচোর" খেলা হইতেছিল, এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'দীনবন্ধুবাবুর নিকট আমার এক দরখাস্ত আছে।' তিনি আমাদের পরিচিত, কিন্তু স্বগ্রামবাসী নহেন, পার্শ্বস্থ একটি গ্রামে তাঁহার বাস। দীনবন্ধু তখন খেলিতে বসিয়াছিলেন, বলিলেন 'একটু বসুন, পরে শুনিব'।

গোলামচোর খেলা, পল্লীগ্রামে কি নগরে, গৃহস্থের বাটীতে কি ধনাঢ্যের বাটীতে, সকল স্থানেই হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গের দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি প্রকারে সেই সামান্য খেলাতে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন, তাহা যদি এস্থলে উল্লেখ করি, তাহা হইলে, আশা করি, পাঠক মহাশয়েরা বিরক্ত হইবেন না। আমাদের গ্রামস্থ সাত-আটজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। দীনবন্ধু সঞ্জীবচন্দ্র ও আরও কয়েকজন লোক খেলা আরম্ভ করিলেন, তন্মধ্যে পূর্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (যাহাকে দীনবন্ধু ভাইফোঁটা দিয়াছিলেন) খেলিতে বসিলেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই বন্দ্যোপাধ্যায়কে চোর করিয়া সাজা দেন, কারণ, ইনি সকলকেই গালি দিতেন, কাহাকেও ছাড়িতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ ও আমরা অনেকে দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্রের দলভুক্ত হইয়া খেলা দেখিতে লাগিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিঃসহায় ছিলেন এমন নহে, তাঁহারও দলে অনেক লোক ছিল। তন্মধ্যে একটি লোকের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি, কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে আসিলে কি প্রকৃতির ব্যক্তিদিগকে লইয়া সর্বদা আনন্দে থাকিতেন, তাহা এই পরিচয়ে

কতকটা বুঝিতে পারিবেন। এই লোকটি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন, কিন্তু বড় মূর্খ ছিলেন, আবার সেই সঙ্গে এইরূপ অভিমান ছিল যে, চেষ্টা করিলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর ন্যায় লেখক হইতে পারেন—সর্বদা লিখিবার জন্য "সাবজেক্ট" খুঁজিতেন। একদিন সঞ্জীবচন্দ্র বলিলেন, 'আপনি চূত ফল সম্বন্ধে লিখুন, বেশ ভাল "সাবজেক্ট"।' মুখোপাধ্যায় মহাশয় জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'চূত ফল কাহাকে বলে?' বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আম।'

কিছুদিন পরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া আমাদের শুনাইলেন। প্রবন্ধটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে, উহা নিম্নে প্রকটিত করিতে ইচ্ছা করি, যদি পাঠক মহাশয়েরা রাগ না করেন।—

'আঁব অতি মিষ্ট, আঁব আবার টক, বাঘাতেঁতুলের মতো টক, আঁব আঁশাল, কোনো কোনো আঁব আঁশাল হয় না, কারণ ভাল গাছের আঁব আঁশাল হয় না ইত্যাদি।' এই প্রবন্ধটির পাঠ শেষ হইলে আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণবাবু গম্ভীরভাবে উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, সকলেই প্রশংসা করিলেন, কিন্তু একব্যক্তি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই হাসিতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, পরে বঙ্কিমচন্দ্রের সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন; 'তবে আমার প্রবন্ধটি ছাপাইয়া দিন।' বঙ্কিমচন্দ্র উহা হাত পাতিয়া লইলেন বটে, কিন্তু যেখানে রাখিয়াছিলেন সেই-খানেই সেটা পড়িয়া রহিল। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং রহস্যের জন্য মধ্যে মধ্যে অনেককে পাঠ করিয়া শুনাইতাম, সেইজন্য উহার প্রথমাংশ আমার স্মরণ আছে।--- খেলা আরম্ভ হইলে দীনবন্ধু, সঞ্জীবচন্দ্র এবং তাঁহাদের দলভুক্ত অনেকেই, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক কৌশল করিতে লাগিলেন, যাহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় চোর হয়; কিন্তু 'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।' দীনবন্ধু সঞ্জীবচন্দ্রের মধ্যেই একজন চোর হইলেন। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহানন্দে ঘুঙুর যোড়াটি পায়ে দিয়া রূপচাঁদ পক্ষীর একটি গীত ধরিয়া তাঁহা-দের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। নৃত্যগীত শেষ হইল। দীনবন্ধু তখন পূর্বোক্ত উমেদার ব্রাহ্মণকে নিকটে বসাইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বড় গরীব, অনেকগুলি বিধবা, নাবালক, নাবালিকা প্রতিপালন করিতে হয়, দিন চলে না, তাহার একমাত্র পুত্র যদি একটা চাকুরি পায়, তাহা হইলে অনেকগুলি ব্যক্তির জীবন রক্ষা হয়। দীনবন্ধু ব্রাহ্মণটিকে পুত্রের সহিত তাঁহার অফিসে যাইতে বলিলেন। কিছু দিন পরে শুনিলাম, ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রোমোট,

অফিসে চাকুরির জন্য নাম রেজিস্টারী হইয়াছে, খালি হইলেই পাইবে, কিন্তু খালি কবে হইবে তার ঠিক নাই। একমাস হইতেপারে, ছয়মাসও হইতে পারে। ইতিমধ্যে হুগলীর একটি ডেপুটী বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার অধীনে রোডসেস ডিপার্টমেণ্টে একটি চাকুরি খালি ছিল। ব্রাহ্মণ-পুত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ঐ চাকুরি দেওয়াইলেন। আবার মাস দুই বাদে দীনবন্ধু উহাকে সাব-পোস্টমাস্টারি-পদে বাহাল করিয়া পরওয়ানা পাঠাইলেন। ঘটনাটি অতি সামান্য। এইরূপ উপকার অনেকেই করিয়া থাকেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের পরিচয় শুনিয়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কষ্ট সত্বর বিমোচন করিতে কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয়-স্বরূপ উহা এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

আমি উপরে বলিয়া গিয়াছি যে, নানা প্রকৃতির লোক বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে সর্বদা যাতায়াত করিতেন। এখানে আর-একটি লোকের কথা বলিলে সেকালের পল্লীগ্রামের কবির পরিচয় পাইবেন। ইহার নিবাস আমাদের বাটীর অর্ধক্রোশ পূর্বে মাত্রাল গ্রামে, নাম কৃষ্ণমোহন মুখুয্যে। ইনি সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। বাটীতে দোল দুর্গোৎসব হইত। ইনি একজন উপস্থিত-কবি ছিলেন। এই কবি সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকট আসিতেন, সকলেই তাঁহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কখনো তাঁহাকে কোনো প্রশ্ন করেন নাই। একদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন, ‘আপনি কখনো আমায় প্রশ্ন করেন নাই, আমার ইচ্ছা, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই।’ বঙ্কিমচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা।’ অল্পক্ষণ পরেই একটি প্রশ্ন করিলেন—

‘গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।’

এই প্রশ্নে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ‘এ কি উদ্ভট প্রশ্ন? যাহা কখনও পৃথিবীতে ঘটে নাই, তাহার কবিতা কিরূপে হইবে? আকাশে কখনো কি শেয়াল উঠেছে যে, গগনেতে হুয়া হুয়া করে ডাকবে?’

এইরূপে সকলে পরস্পরে বলাবলি করিতেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভৎর্সনাতে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কবিবর মস্তক নত করিয়া ভাবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া একটি কবিতা শুনাইতে লাগিলেন। ঐ কবিতার প্রথম দুই-চারি পঙ্‌ক্তি শুনিবামাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘ঘাট হইয়াছে; আপনি অপরাজেয়।’ পরে কবিবর সমুদয় কবিতাটি শুনাইলেন। উহার মর্ম এই, ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ হইলে [illegible] পুত্র

সুষেণের ব্যবস্থানুসারে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণীর পাতা আনিতে গিয়া উহা খুঁজিয়া না পাইয়া গন্ধমাদন পর্বত উপাড়িয়া লইয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে সূর্যদেবকে বগলে পুরিয়া লইয়া পাহাড় মাথায় করিয়া আসিতেছিলেন, ঐ পাহাড়ে বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতি পশুগণ বাস করিত; তন্মধ্যে শিবাগণ ভোরের সময় তাহাদের সংস্কারসিদ্ধ হুয়া হুয়া ডাক ডাকিয়া উঠিল। দারুণ গ্রীষ্মযন্ত্রণায় এক দম্পতি গৃহ-ছাতে শয়ন করিয়াছিল, আকাশে ঐ হুয়া হুয়া ডাক শুনিয়া স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া স্ত্রী বলিল—

'কভু শুনি নাই নাথ, ভুবন মাঝারে,
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।'

পরোপকার দীনবন্ধুর জীবনের ব্রত ছিল। তাহার প্রথম পরিচয় নীলদর্পণ প্রচারে পাওয়া যায়। এ তো গেল একটা গুরুতর উদাহরণ। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে সর্বদা উহার পরিচয় পাওয়া যাইত। যে ঘটনা অন্যের পক্ষে রহস্যজনক, দীনবন্ধুর উহা কষ্টকর বোধ হইত। একজন মাতাল ট'লে ট'লে খানায় পড়িতেছে, লোকে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছে, হাসিতেছে, কিন্তু দীনবন্ধু তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া তাহার সাহায্য করিলেন। এই গুণটি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। দীনবন্ধুর সম্বন্ধে একটি ঘটনা, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা এখানে বলিব। বহুকাল হইল, সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা) ও আমি নৈহাটী স্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ফাডার রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। স্টেশন হইতে প্রায় একবিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকের ড্রেনে একটি ধবল পদার্থ দেখিলাম। মেটে মেটে জ্যোৎস্না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না, এই ধবল পদার্থটি কি? উহা মাঝে মাঝে নড়ায়, প্রথমে বোধ হইল, একটা গরু ড্রেনে পড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, উহা গরু নয়, একটা বাবু মাতাল ড্রেনে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তিনজনে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম, একটি নবীন যুবা, পরিপাটী কেশবিন্যাস, কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতালবাবু বলিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুরবাড়ি আসিতেছিলেন। স্টেশনের বাবুদের সহিত শুঁড়ীর দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুরবাটী যাইতে খানায় পড়িয়া গিয়াছেন। শ্বশুরের নাম-ধামেরও পরিচয় দিলেন। তাঁহার শ্বশুর সেখানকার একজন সম্রান্ত লোক, আমরা সকলে তাঁহাকে জানিতাম। দীনবন্ধু ঐ বাবুর

শ্বশুবেব নাম শুনিয়া বলিলেন— 'আপনি অমুকের জামাই!' এই কথাতে মাতালবাবু বলিলেন, 'ইউ নো মাই ফাদার-ইন-ল স্যাব, দেন ইউ আর মাই ফাদাব-ইন-ল, স্যাব, ইয়েস স্যার, সন্ ইন-ল স্যার, আই স্যার সন্-ইন-ল!'— এই বুলি ধবিলেন। যতক্ষণ আমাদেব সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার মুখে কেবল ঐ বুলি। দীনবন্ধু কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে তাহাব উত্তব দিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ কথাতে 'ইয়েস, স্যার, সন্-ইন-ল স্যার।' এই ধুয়া ববাবরই ছিল। পৃথিবীব উপবিস্থ পদার্থেব প্রতি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেমন স্যাব আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ঐদিন আমরা তেমনই মাতালেব প্রতি খানাডোবার আকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করিলাম। কেন না মাতাল বাবু যে দিকে খানা, কেবল সেই দিকেই টলিয়া টলিয়া আসিতেছেন, পূর্বদিকে সমতল ভূমি, সেদিকে কোনো মতে টলিবেন না, ইহা দেখিয়া দীনবন্ধু কোমবে চাদর জড়াইয়া তাহার বাম হাতখানি ধরিলেন। আমি দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ড্রেনের দিকে দাঁড়াইলাম, এবং তাহাকে ঠেলিয়া রাখিতে লাগিলাম। ঐ প্রকাবে কিছুদূর যাইয়া দীনবন্ধুর কষ্ট দেখিয়া আমি বলিলাম, 'আপনি ছাড়িয়া দিন, আমি ড্রেনের দিকে আছি, কোনোমতে বাবুকে খানায় পড়িতে দিব না।'[১] তিনি বলিলেন, 'না হে না।' তিনি আমাকে বিশ্বাস কবিলেন না। আমাব তখন ২২।২৩ বৎসর বয়স। পশ্চিমদিকে বৈদিক-পাড়াব একটি গলি হইতে দুইজন বৈদিক ঠাকুর বড রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুকে তাঁহাবা চিনিতেন, আনন্দসহকারে তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসব হইলেন, কিন্তু দীনবন্ধু একজনের হাত ধরিয়া টানা-টানি কবিতেছেন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'এ কি, ইনি কে?' তখন মাতাল-রাজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা বুক চাপড়াইয়া 'সন-ইন-ল স্যার, ইয়েস স্যাব, সন-ইন-ল স্যাব!' বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু তাঁহার হাত ছাড়িলেন না। সহসা এইরূপ সম্বোধনে বৈদিক ঠাকুরদ্বয় নিঃশব্দে টিকি উড়াইয়া দৌড়িতে লাগিলেন, তাঁহাদের চটিজুতার ফট ফট শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম—বৈদিক-ঠাকুরেরা 'দাঁতাল-মাতাল'কে বড় ভয় করিতেন। এইরূপে প্রায় দশ-পনের মিনিটে আমরা বাটী পৌঁছিলাম। পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া দীনবন্ধুকে বাতাস দিতে হইল। যতক্ষণ রাস্তায় মাতালকে ধরিয়াছিলেন, ততক্ষণ তিনি গম্ভীরভাবে ছিলেন। এক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া নিজমূর্তি ধরিলেন। হাসিতেছেন, হাঁপাইতেছেন, আবার হাসাইতেছেন, এবং হাসিতেছেন। এখানে বলা বাহুল্য,

মাতালকে খাওয়াইয়া পাল্কী করিয়া শ্বশুরবাটী পাঠান হইল। শ্বশুরবাটী গ্রামান্তরে। অজ্ঞাত অপরিচিত ব্যক্তি। যাহার পেশা মাতাল হইয়া খানায় পড়া, তাহাকে কে এরূপ যত্ন করিয়া আশ্রয় নিয়া থাকে? সে কেবল দীনবন্ধু। অন্য কোনো ভদ্রলোক হইলে উহাকে খানা হইতে তুলিয়া নিকটস্থ কোনো দোকানে (ঐ স্থানে অনেক দোকান ছিল) রাখিয়া বাটী চলিয়া যাইতেন; আবার কেহ কেহ বা দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেন, কিন্তু দীনবন্ধু অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিপদগ্রস্ত লোককে প্রাণপণে সাহায্য করিতেন। করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার একটি বিশেষ রোগ ছিল; বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া যদি উহাকে, নাটকোপযোগী মনে করিতেন, তাহা হইলে কোনো নাটকে সে চরিত্রটি অঙ্কিত করিতেন। এই মাতালবাবুই "সধবার একাদশী"র "ভোলা" মাতাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক বন্ধু ছিল, দীনবন্ধুর অসংখ্য বন্ধু ছিল। কিন্তু ইঁহারা দুইজনে প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। যখন "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "সাহিত্যের সহায়" দীনবন্ধুর নিকট বিশেষ সাহায্য পাইবেন, এমন ভরসা করিয়াছিলেন। কিন্তু "বঙ্গদর্শন" প্রকাশের অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সময়ে তাঁহার জন্য বঙ্গসমাজের চারিদিক হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কেহ বা সংবাদপত্রে, কেহ বা মাসিক পত্রিকাতে, কেহ বা কবিতাতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু "বঙ্গদর্শন" মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। ইহা অনেকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর শোকে "বঙ্গদর্শনে"র কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে যখন "বঙ্গদর্শন" বিদায় গ্রহণ করিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বিদায় প্রবন্ধে বঙ্গদর্শন-লেখকগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে গিয়া দীনবন্ধুর কথা উত্থাপন করেন। কিরূপ কাতরতার সহিত উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নের কয়েক ছত্রে প্রকাশ পাইবে:

'আর-একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখদুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়া উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে-না-হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য বঙ্গ সমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই। কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে? কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে? অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক,

আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গী। সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনো কিছু বলি নাই, এখনো আর-কিছু বলিলাম না।'

বস্তুতঃ আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম, দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর হইতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কথা উত্থাপন করিতেন না। যদি কেহ দীনবন্ধুর কথা বা তাঁহার রহস্যপটুতার কথা কহিত, তখনই বঙ্কিমচন্দ্রের একটা পরিবর্তন লক্ষিত হইত, তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ইহাতে আমরা বুঝিতাম যে, তিনি দীনবন্ধুর শোক ভুলিতে পারেন নাই, দীনবন্ধুর স্মৃতি তাঁহার কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় আট বৎসর পরে "আনন্দ-মঠে"র উৎসর্গ-পাত্রে "কুমারসম্ভব" হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, 'হে ক্ষণভিন্নসৌহৃদ! আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে!' বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলিয়াছিলেন, 'দীনবন্ধু আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বড স্নেহপ্রবণ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মশিক্ষা

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাসের "নারায়ণ" পত্রিকায় পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-প্রসঙ্গ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। যখন আমরা উভয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের বাটীতে মিলিত হইলাম (আমি তখন রঙ্গপুরে একজন ডেপুটি ছিলাম) ঐ সময় বঙ্কিম-প্রসঙ্গ উঠিত ও আমার পিতৃদেবের কথা আমার মুখে শুনিতেন (ইহার প্রায় আট মাস পূর্বে আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন) এবং তাহা অবলম্বনে আমাদের পিতৃ-প্রসঙ্গ প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুশিক্ষিত এবং তেজস্বী পুরুষ আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর সহিত তখন তাঁহার আলাপ-পরিচয় ছিল না, তথাচ তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া ডাক্তার ঘোষ তাঁহার গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কথা উত্থাপন করিতেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই যে, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর একদিন বাংলার পণ্ডিত-সমাজের অগ্রণী হইবেন, তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটা আসিয়াছিল যে, তিনি একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান, এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত।

বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশই অমূলক। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ঐরূপ একটা কথা লইয়া "নারায়ণ" ক্ষেত্রে দেখা দিয়াছেন। সে কথাটি এই—'পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ও সংসর্গদোষে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বজীবন কিঞ্চিৎ বিক্ষিপ্ত হইলেও, পরে তাহা সংশোধিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এই সময়ে আলবার্ট হলে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দেন। তাঁহার শ্রোতা ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র, বন্ধুবর ইন্দ্রনাথ, --- শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ। ইহাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপকার হয়, পিতৃপিতামহের ধর্মের দিকে আকর্ষণ বাড়িয়া উঠে।'

এই কথা কতদূর অসঙ্গত, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে নিম্ন উদ্ধৃত মন্তব্য পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই বক্তৃতা সভার দিন-দুই যাইয়া বঙ্কিমবাবু আর যাইলেন না, তাহাতে অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। তিনি গত বৈশাখ

মাসের "নারায়ণ" পত্রিকার "বঙ্কিম-স্মৃতি" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 'দুই-তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর আর তাঁহাকে (বঙ্কিমবাবুকে) দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামতো তাঁর সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কয়দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। এরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোকে নাচিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোনো স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম টাঁকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, তিনি এখনো বুঝিতে পারেন নাই যে. নানাসূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এ দেশের সমাজ-ধর্ম এখন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা-খুশি-তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত?'

এই মন্তব্য পাঠ করিয়া কি বুঝা যায় যে, চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্কিমবাবুর উপকার হইয়াছিল, এবং পিতৃপিতামহের ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়াছিল?

আসল কথা এই যে, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক-ভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, তখন তিনি "নবজীবনে" ও "প্রচারে" হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ সভা বসে, তাহাতে অনেক সাহিত্যিক ও স্বধর্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন! অ্যালবার্ট হল বক্তৃতার স্থান স্থির হইল; বক্তৃতার একটা দিনও স্থির হইল। প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল শ্রোতা ছিলেন এমত নহে, তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তার পর দুই-একদিন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।

ইহার বহুপূর্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াই তাঁহার হৃদয়ে প্রথম ধর্মের উদ্দীপন হয়। আমাদের মাতামহ সেকালে সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহুব্যয়ে ও বহুযত্নে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই

গ্রন্থগুলি সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল, এখন তো বটেই। বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতের দিকে বড় ঝোঁক দেখিয়া আমাদের মাতুল ঐ সমুদয় গ্রন্থ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। উহা পাইয়া তিনি প্রত্যেক গ্রন্থখানি নূতন খেরুয়া কাপড়ে বাঁধিয়া একটি আলমারি সাজাইলেন, আলমারি ভরিয়া গেল। ইহার মধ্যে কোন্ শাস্ত্র না ছিল। এমন কি, জ্যোতিষ ও তন্ত্রের পুঁথিও ছিল। সেজন্য তিনি ফলিত-জ্যোতিষ শিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলি পড়িয়াই বঙ্কিমবাবুর সংস্কৃতশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য জন্মে। নতুবা শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য পড়িয়া তাঁহার সংস্কৃত-বিদ্যার খতম হইত। এই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি গ্রন্থের পঠন ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কৃত গ্রন্থের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তারপর যখন হুগলীতে বদলী হইয়া আসিলেন, তখন কয় বৎসর পিতৃদেবের নিকট থাকিয়া ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। কিছুদিন চুঁচুঁড়ায় থাকিতে হইয়াছিল; তথাপি রবিবারে রবিবারে কাঁঠালপাড়ায় আসিতেন। এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম শিক্ষা হইল। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি তর্কচূড়ামণির হিন্দু-ধর্ম-ব্যাখ্যায় আস্থা প্রদর্শন করেন নাই, এই শিক্ষার ফলেই তাঁহার মন কখনো ধর্মপ্রচারকদের বক্তৃতায় গলিয়া গিয়া হিন্দু-ধর্মের দিকে প্রবাহিত হয় নাই, এই শিক্ষার ফলেই তিনি ধর্ম-তত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, এই শিক্ষার ফলেই তিনি গীতাব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই শিক্ষার প্রভাবেই তিনি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে-এ বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধারাবাহিক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা শেষ করিতে না পারিয়া স্বর্গারোহন করিলেন। কোনো ধর্মপ্রচারকের নিকট তিনি হিন্দুধর্ম শিক্ষা পান নাই। তাঁহার একমাত্র ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন আমাদের পিতৃদেব! দেবীচৌধুরানী গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন; 'যাঁহার কাছে নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্ম ব্রত করিয়াছিলেন—' ইত্যাদি।

বঙ্কিমচন্দ্রের চুঁচুঁড়ায় থাকাকালেই পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরই তাঁহার ভিতরে একটা গুরুতর পরিবর্তন হয়। ইহার পর যাহা লিখিতেন, তাহাই হিন্দু-ধর্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিতেন; ইহার পর যে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ উদ্দেশ্য থাকিত। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আপনার কণ্ঠদ্বারা যে হিন্দু-ধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র কলমের দ্বারা হিন্দু-ধর্মের ঠিক সেই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন, এমন বলা যায় না।

১৮৮১ সালে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। উহার মাস কয়েক পরে সঞ্জীবচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে" "আনন্দমঠ" প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮২ সালে "স্টেটসম্যান" সংবাদপত্রে হিন্দু-ধর্ম লইয়া রেভাঃ ডঃ হেস্টি সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধ হয়। ১৮৮৩ সালে "দেবীচৌধুরানী" বাহির হয়। ১৮৮৪ সালে "নবজীবনের" প্রথম সংখ্যায় "ধর্মতত্ত্ব" প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পর ১৮৮৫ সালে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা আরম্ভ হয়। এখন পাঠক মহাশয়রা বলুন দেখি, তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতায় বঙ্কিমচন্দ্রের মন হিন্দু-ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল কি?

বঙ্কিম সম্বন্ধে পণ্ডিতরাজ আর-একটি কথা লিখিয়াছেন, তাহা অমূলক। যথা— 'সত্য মিথ্যা জানি না, স্বর্গীয় ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, শেষ জীবনে নাকি বঙ্কিমচন্দ্র জপের মালা গ্রহণ করিয়াছিলেন।' আমি যতদূর জানি বঙ্কিমচন্দ্র জাপক ছিলেন বটে তবে জপের মালা ঘুরাইয়া জপ করিতেন না। আমাদেয় পিতৃদেবও জাপক ছিলেন, তিনিও কখনো জপের মালা গ্রহণ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পূর্বে প্রায় চারি বৎসর আমি আলিপুরে বদলি হইয়া তাঁহার নিকটেই ছিলাম, কই, কখনো তো জপের মালা ঘুরাইতে তাঁহাকে দেখি নাই।

পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর আমাদের পিতৃদেবের সম্বন্ধে একটি ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা এরূপ শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন যে, উহা আমি চিরকাল স্মরণ রাখিব। তিনি লিখিয়াছেন, ঐ ঘটনাটি আমার মুখে শুনিয়াছেন। সে আজ অনেক দিনের কথা, প্রায় ৩৪।৩৫ বৎসর হইবে। ১৮৮১ সালে আমার সহিত তাঁহার দেখাশুনা হয়। এই দীর্ঘকালে যে আমার পিতৃদেবের কথাটি তাঁহার স্মরণ আছে, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিজের ভিন্ন পরের কথা ভালরূপ স্মরণ থাকা সম্ভব নহে, এজন্য এ ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার দুই-একটি ভুল হইয়াছে। আমাদের পিতৃদেব প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সেকালের প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি। ঐ গল্পগুলি এখানে বিবৃত করিতে আমার সাহস হয় না; ঐগুলি অলৌকিক ঘটনায় জড়িত। তবে এইরূপ ঘটনায় বুঝা যায় যে, সাধারণের ধারণা ছিল যে, পিতৃদেব বাল্যকাল হইতে দেবভক্ত ছিলেন, এবং দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। বোধহয় এই ভক্তির জন্যই ভগবান্ তাঁহাকে অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই এক মহাপুরুষের দ্বারা দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তাঁহার প্রবন্ধে দীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু

লেখেন নাই। ঐ মহাপুরুষের দ্বারা পিতৃদেবের দীক্ষা হওয়াতে, এই গল্পটি আমাদের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে এবং আমিও পণ্ডিতরাজকে ও ডাক্তার কে. ডি. ঘোষকে বলিয়া থাকিব। প্রায় চারি বৎসর হইল, দীনবন্ধুর ষষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ ললিতচন্দ্র এই ঘটনাটি "মানসী" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তাঁহার শুনা কথা। আমিও যাহা লিখিব নিম্নে তাহাও আমার শুনা কথা।

আমাদের জ্যেষ্ঠতাত ৺কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাজপুরের নিমক-পোক্তানের দারোগা ছিলেন। সেকালে ওইটি একটি লোভনীয় পদ ছিল, কেন না ঐ পদের মর্যাদাও খুব ছিল, এবং বেতনও ভাল ছিল। জ্যাঠামহাশয় ঐ স্থানে বহুকাল ছিলেন, এবং সে দেশের লোকের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তিনি সেখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি উহা কাশীনাথ মন্দির বলিয়া খ্যাত। আমাদের দেশের অনেক লোক তাঁহার নিকট থাকিয়া প্রতিপালিত হইত, তিনি সকলকেই এক-একটি চাকুরিও দিয়াছিলেন; তন্মধ্যে তাঁহার পিসতুতো ভাই ৺ ভজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একজন ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহারই নিকট নিম্নলিখিত ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম।

পনর-ষোল বৎসর বয়সে পিতৃদেব তাঁহার পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া, আমাদের ঠাকুরের প্রধান পূজারীর নিকট কিছু টাকা কর্জ লইয়া একদিন রাত্রিযোগে গৃহত্যাগ করিয়া যাইলেন। যাজপুরে তাঁহার অগ্রজের নিকট যাইবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন। পিতামহ পরদিন প্রত্যূষে উহা জানিতে পারিয়া দুইটি বিশ্বাসী লোক তাঁহার পশ্চাৎ পাঠাইলেন; কিন্তু পথে তাঁহার সহিত তাহাদের দেখা হইল না। পিতৃদেব পদব্রজে কয়দিনে যাজপুরে পৌছিলেন, সেইখানে তাহাদের সহিত দেখা হইল। রাস্তায় তাঁহার কাপড় চাদর ও টাকাকড়ি চুরি গিয়াছিল কিনা, শুনি নাই। যাজপুরে কিছুদিন থাকিয়া পার্‌সী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। আমার জ্যাঠামহাশয় ঐ ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। পিতৃদেবকে ঐ ভাষা শিখাইবার জন্য একজন মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পরে জ্যাঠামহাশয় অনুজকে একটিন্ দিয়া পিসতুতো ভাই ও দেশের লোকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রাখিয়া মাস কয়েকের জন্য ছুটি লইয়া বাড়ি আসিলেন। একজন প্রধান কর্মচারী কাজ চালাইত; পিতাঠাকুর কেবল দস্তখত করিতেন। কিছুদিন পর তাঁহার জ্বর হইল। তখন তাঁহার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম। অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি সেস্থানের

লোকের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অনেক লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। জ্বর ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বিকারে পরিণত হইল; অবশেষে নাড়ী ত্যাগ হইল এবং তাঁহাকে বৈতরণী তীরস্থ করিতে হইল। প্রাণত্যাগ হইয়াছে বুঝিয়া, তাঁহাকে একখানি চাদরে ঢাকিয়া আত্মীয়েরা সৎকারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে ভীড় ঠেলিয়া ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাজুটধারী, পরিধানে গেরুয়া বসন, পদযুগলে খড়ম—এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। ইঁহার মূর্তি দেখিয়া সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ইঁহাকে প্রণাম করিল। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'রক্ষা করুন!' ইঁহাকে দেখিয়া কাহারও সন্ন্যাসী বলিয়া ধারণা হইল না। সকলেই বুঝিল, ইনি দৈবপ্রেরিত। এই মহাপুরুষ পিতৃদেবের নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখ হইতে চাদর তুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'কি সুন্দর! ছেলেটি কি সুন্দর!'—পরে বলিলেন, 'মরে নাই, জীবিত আছে।' এবং গরম দুধ আনিতে অনুমতি করিলেন। এই স্থলে পণ্ডিতরাজ লিখিয়াছেন যে সন্ন্যাসী মন্ত্রপূত জল ছিটাইতে ছিটাইতে পিতৃদেব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু আমি শুনিয়াছি, মস্তক হইতে নাভি পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ দুই হস্ত চালনা করাতেই পিতাঠাকুর পাশমোড়া দিলেন। ক্রমে ঐরূপ করিতে করিতে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলেন। পরে কিছু দুগ্ধ পান করাইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহাকে বাসায় আনা হইল। মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় পিতার সঙ্গে বাসায় আসিলেন, পরে তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। ইহা বুঝিতে পারিয়া পিতাঠাকুর শয়নাবস্থাতেই তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। মহাপুরুষ বলিলেন, 'ভয় নাই, তুমি সুস্থ হইয়াছ।' পিতা ঠাকুর কহিলেন, 'তাহা আমি জানি; তবে আমার একটি ভিক্ষা আছে।'

'কি ভিক্ষা? বল?'

'যদি আমার জীবন দান করিলেন, তবে আমায় দীক্ষিত করুন।'

মহাপুরুষ বিস্ময় বিস্ফারিতলোচনে অনেকক্ষণ পিতাঠাকুরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে স্বীকৃত হইয়া একটি দিন স্থির করিয়া বলিয়া গেলেন যে, ঐ দিনের প্রত্যূষে স্নাত হইয়া থাকিবে। তিনি আসিয়া দীক্ষিত করিবেন। ঐ দিনের ঠিক সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেবকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'না ভালরূপ তোমার স্নান করা হয় নাই, এস, আমি বৈতরণী হইতে তোমাকে স্নান করাইয়া আনি।' এই বলিয়া পিতা ঠাকুরের হস্ত ধারণ

করিয়া বৈতরণীর জলে তাঁহাকে অনেকবার ডুব দেওয়াইয়া লইয়া আসিলেন। আমাদের ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া উহা দেখিয়াছিলেন। পরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটি ঘরে তাঁহার দীক্ষা আরম্ভ হইল। ইহা সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব হইল। বাসার লোকে অনাহারে ছিল। দীক্ষাকার্য শেষ হইলে, পিতার গুরুদেব দ্বার খুলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেই লক্ষ্য করিল, তাঁহার পায়ে খড়ম নাই। খালিপায়ে চলিয়া গেলেন। ভজকৃষ্ণ জ্যাঠামহাশয় তখন দীক্ষাঘরে পিতাঠাকুরকে দেখিতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, অষ্টাদশ বর্ষীয় সুন্দর কিশোর বালক পীতাম্বর-পরিধানে একটি আসনে বসিয়া হাসিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ক্রোড়ে গামছা-বাঁধা একটি পুঁটুলি রহিয়াছে। তিনি পিতাঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'তোমার ক্রোড়ে কিসের পুঁটুলি দেখি।' যেমন কোনো শিশুর হাতের পুতুল কেহ দেখিতে চাহিলে সে উহা বুকে করিয়া 'না না' বলে, আমার পিতৃদেব সেইরূপ চমকাইয়া 'না না, উহা দেখাইব না' বলিয়া পুঁটলিটি বুকে চাপিয়া ধরিলেন। পুঁটলিতে কি ছিল পাঠকের বোধহয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। উহাতে ছিল তাঁহার গুরুদেবের পায়ের খড়ম ও উপবীত। অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে অষ্টাশী বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কখনো কোনো দিন তিনি উহা নিজের কাছ ছাড়া করেন নাই যদি সরকারী কার্যোপলক্ষে কোনোদিন কোনো স্থানে রাত্রি কাটাইবার আবশ্যক হইত, উহা সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইরূপ সত্তর বৎসর উহা বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রতিদিন প্রত্যূষে উহার পূজা করিতেন। এবং সেই সঙ্গে সন্ধ্যা-আহ্নিক-জপ ইত্যাদি করিতেন। পরে মৃত্যু-শয্যায় উহা ত্যাগ করিয়া আমাদের বলিলেন; 'উহাতে আমার গুরুদেবের খড়ম ও উপবীত আছে। দীক্ষার পর তিনি গলা হইতে উপবীত ও আমার প্রার্থনানুসারে তাঁহার পায়ের খড়ম দিয়াছিলেন।' পিতৃদেব কখনো তাঁহার গুরুদেবের কথা কহিতেন না। আজ পুঁটলি আমাদের দিয়া আদেশ করিলেন, 'উহাতে পাথর বাঁধিয়া অতলস্পর্শে নিক্ষেপ করিবে।' অতলস্পর্শ অনেক দূর, সেই সাগর সঙ্গমে। ততদূর যাইবার সুবিধা হইল না। হুগলীর নীচে ঘোলঘাট খুব গভীর ছিল, ঐ স্থানে পাথর বাঁধিয়া উহা নিক্ষেপ করা হইল। পিতা ঠাকুরের মৃত্যুর পর আমরা উহা খুলিয়া দেখিলাম,—একজোড়া খড়ম, উহার 'বৌল' হাতির দাঁতের উহা এত বড় যে কলিযুগে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী নহে; আর দেখিলাম—উপবীত, সূতার প্রস্তুত নহে, আমার অগ্রজদের বিবেচনায় উহা কোনো গাছের ছাল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, তিব্বতদেশের গাছের ছাল; উহা তিন দণ্ডী।

মধ্যস্থলে একটি গ্রন্থিদ্বারা আবদ্ধ। ঐ উপবীতের প্রত্যেক দণ্ডীর উভয় পিঠে কি লেখা ছিল; কি ভাষা বুঝা গেল না; বঙ্কিমচন্দ্রের বোধ হইল উহা তিব্বতী ভাষা। এই খড়ম ও উপবীত দেখিয়া বুঝা যায় যে, আমাদের পিতৃগুরু একজন সামান্য মানুষ অথবা বিভূতিমাখা সন্ন্যাসী ছিলেন না—তিব্বতী পাহাড়ের একজন তাপস ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় দুইমাস পূর্বে একদিন রবিবারে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইবার অভিপ্রায়ে তিনি ও আমি বাড়ি হইতে বহির্গত হইতেছি, এমন সময়ে এক ব্যক্তির সহিত বাড়ির সামনের গলিতে দেখা হইল। তাহার পরিধানে মালকোঁচা মারা গেরুয়া ধুতি, গায়ে গেরুয়া জামা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়া হিন্দী ভাষায় বলিলেন, 'আপনি কি বঙ্কিমবাবু? আপনার সঙ্গে কথা আছে।' বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে' কোথা হইতে আসিয়াছেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি তিব্বত হইতে আসিয়াছি। সেই স্থানের কোনও ব্যক্তি আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন।' বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'সেদেশের কোনো ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ নাই।' তিনি বলিলেন, 'আপনার নাই বটে, কিন্তু আপনার বাবার ছিল।' তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্মানের সহিত তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন; সদর মহলের তেতালার একটা নির্জন ঘরে (যেঘরে বসিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন) প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, আমি দোতালায় বৈঠকখানায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় রাত আটটার সময় দ্বার খুলিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঐ ব্যক্তির সহিত কি কথোপকথন হইয়াছিল, এবং উনি কে?' কোনও উত্তর পাইলাম না। ইহার দুইমাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

আমার অগ্রজের ধারণা ছিল যে, তাঁহার গুরুদেবের সহিত পিতৃদেবের মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত, নতুবা যে ধর্মে তিনি ব্রতী ছিলেন, উহা কোথায় পাইলেন, যাহা হউক, পিতৃদেবের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার গুরুদেব যে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুশয্যায় প্রলাপে ব্যক্ত হইয়াছিল।

অর্জুনা পুষ্করিণী

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনেকে এই পুষ্করিণীকে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র "বারুণী" পুষ্করিণী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ঠিক নহে। "বারুণী" পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। এই পুষ্করিণী বঙ্কিমচন্দ্রের পৈত্রিক। গ্রামোপ্রান্তে অতি নির্জন স্থানে উহার খনন হইয়াছিল, কিন্তু কোন সময়ে উহা খাত হইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। অর্জুনা পূর্বে সুবৃহৎ জলাশয় ছিল, জল দেখা যাইত না, পদ্মপত্রে ঢাকা থাকিত, আর উহার উপর অসংখ্য পদ্মফুল বায়ু-তাড়িত হইয়া দুলিত। চারিদিকের পাড় আম্রকাননে সুশোভিত এই আম্র-বনের গাছে গাছে অসংখ্য পাখী বাস করিত। প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যার সকল সময়েই তাহাদের কলরবে এই নির্জন সরোবরের চিরনিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইত।

এই পুষ্করিণী এক্ষণে মজিয়া গিয়া সঙ্কীর্ণ-আয়তন হইয়াছে, এবং পাড়ে পাড়ে প্রজা বসিয়াছে। ইহার সে রম্যতা আর নাই।

"অর্জুনা"র উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্রদিগের ফুলবাগান ছিল। উহাতে একটি ক্ষুদ্র বাগানবাটিও ছিল, একব্যক্তি উহাতে কিছুদিন বাস করিতে পারিত, কোনো কষ্ট হইত না। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঐ বাগানের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র উহা একটি উৎকৃষ্ট ফুলবাগান করিয়াছিলেন। তের-চৌদ্দ বর্ষ বয়ঃক্রমে জলপানি পাইয়া ঐ টাকা হইতে, এবং পিতৃদেবের সাহায্য হইতে হুগলী কালেজের মালীর দ্বারা নানাপ্রকার ফুলের চারা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে বিশ্রামের জন্য ইষ্টক-নির্মিত বসিবার স্থান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঐ বাগানের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বড় বড় মনসা কাঁটার বেড়া ছিল, আর দক্ষিণ দিকে ইষ্টক-নির্মিত ভিতের উপর রেলিং ছিল এবং একটি ফটক ছিল। এই রেলিং-এর পরই, অর্থাৎ বাগানের দক্ষিণেই "অর্জুনা"। মাঠাল গ্রামে যাইবার জন্য কেবল মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ রাস্তা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই ফুলবাগানে ও পুষ্করিণীর পাড়ে বেড়াইতে ভালবাসিতেন এবং যত-দিন-না তাঁহাদের বসতবাটীর সম্মুখে একটি বৈঠকখানাবাটি নির্মাণ করাইয়া-ছিলেন, ততদিন, এই ফুলবাগানে সর্বদা থাকিতেন। ঐ ফুলবাগানের এক্ষণে আর কোনো চিহ্ন নাই, ঐ জমিতে এখন প্রজা বসিয়াছে।

বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র

চন্দ্রনাথ বসু

যখন স্কুল ও কলেজে পড়িতাম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংস্কৃতের ব্যবস্থা ছিল না। ঐ সকল পরীক্ষায় বাঙ্গালাই তখন আমাদের "দ্বিতীয় ভাষা" ছিল। তথাপি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বড়ই অনাদর ছিল। কেবল যে বড় বড় ইংরাজি-ওয়ালারা উহার অবজ্ঞা করিতেন তাহা নহে ; যাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইত, তাহারাও অবজ্ঞা করিত।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের যখন এইরূপ অনাদর, তখন বঙ্কিমবাবুর নাম প্রথম শুনি। শুনি যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজি ধরনের একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা আমি কখনই ঘৃণা করি নাই, তথাপি ঐ কথা শুনিয়া একবার মনে হইয়াছিল, এ আবার কি। এত ইংরাজি পড়িয়া বাঙ্গালায় বই লেখা কেন। কিন্তু উহা ভিন্ন আর কিছুই ভাবি নাই। মনে বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে অবজ্ঞার ভাব উদয় হয় নাই। ক্রমে শুনিলাম, তিনি ঐ রকম আর একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। এবার কিন্তু প্রথমবারের মতো বিস্ময়ের ভাব একেবারে জন্মে নাই। বরং বাঙ্গালা ভাষার উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। দিন কতক পরে শুনিলাম বঙ্কিমবাবু আরও একখানা উপন্যাস লিখিয়াছেন। অনেকের মুখে তাঁহার পুস্তকগুলির প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কাহারো কাহারো মুখে নিন্দাও শুনিলাম। আরও শুনিলাম, কেহ কেহ দুই-চারিটি অক্ষর ভুল প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রাণান্ত করিতেছেন এবং বঙ্কিমবাবুর বিষম নিন্দা রটনা করিতেছেন। নিন্দা শুনিয়া মনে হইল, বুঝিবা বঙ্কিমবাবুর জন্য কাহারো কাহারো গাত্রদাহ আরব্ধ হইয়াছে। তখন "দুর্গেশনন্দিনী", "মৃণালিনী" ও "কপালকুণ্ডলা" কিনিয়া পড়িলাম। "দুর্গেশনন্দিনী" পড়িয়া মনে হইল, উহা স্কটের "আইভান হো" পড়িয়া লিখিত। অনেকদিন পরে বঙ্কিমবাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার আগে আইভ্যান হো পড়ি নাই।' আর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'তুমিই হিন্দু পেট্রিয়টে "দুর্গেশনন্দিনী"র নিন্দা করিয়াছিলে ?' আমি বলিয়াছিলাম, 'না, হিন্দু পেট্রিয়টে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহা তোমারই কাছে প্রথম শুনিলাম !' তিনি বলিয়াছিলেন, 'সমালোচনা অন্যায্য হয় নাই এবং পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম, উহা

তোমারই লেখা—প্রতিকূল হইলেও অমন সমালোচনা পড়িয়া সুখ হয়—সমালোচক জানিতেন না যে, তখন আমি "আইভান হো" পড়ি নাই, তাই নিন্দা করিয়ছিলেন।'

তিনখানি উপন্যাস পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। তাঁহার "বঙ্গদর্শনে"র গ্রাহক হইলাম। "বঙ্গদর্শনে" "বিষবৃক্ষ" প্রকাশিত হয়। কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হইলে পর, আমাদের দেশের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি "বঙ্গদর্শনে"র প্রসঙ্গে অতিশয় ক্রোধ, বিরক্তি ও অবজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে আমার কাছে বলিয়াছিলেন, 'ঐ আবার "কুন্দনন্দিনী" একটা কি বাহির হইতেছে?' তেমন লোকের মুখে ওরূপ কথা শুনিয়া আমার মনঃকষ্ট হইয়াছিল—সে মনঃকষ্ট এখনও যায় নাই, বোধহয় কখনও যাইবে না। "বঙ্গদর্শন" পড়িয়া যাহা বুঝিয়াছিলাম, উহা পড়িবার পূর্বে তাহা বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা ভাষায় সকল প্রকার কথাই সুন্দররূপে বলিতে পারা যায়। আর বুঝিয়াছিলাম যে ভাষা বা সাহিত্যের দারিদ্র্যের অর্থ মানুষের অভাব। "বঙ্গদর্শন" বলিয়া দিয়াছিল বঙ্গে মানুষ আসিয়াছে—বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিভা প্রবেশ করিয়াছে।

তখনও কিন্তু আমি বঙ্কিমবাবুকে দেখি নাই। না দেখিলে সকলে যাহা করিয়া থাকে, আমিও তাহা করিতাম। মনে মনে তাঁহার মূর্তি কল্পনা করিতাম। তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, এমন কেহ কেহ আমায় বলিতেন, 'বঙ্কিমের চেহারায় বুদ্ধি যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।' আমিও প্রাণপণে মূর্তি কল্পনা করিতাম। কিন্তু তাঁহাকে যখন দেখিলাম, তখন আমার কল্পিত মূর্তি লজ্জায় কোথায় যেন লুকাইয়া পড়িল তাহার ঠিকানা রহিল না। ২২ কি ২৩ বৎসর হইল "কলেজ রি-ইউনিয়ন" নামে ইংরাজি-ওয়ালাদের একটা বাৎসরিক উৎসব হইত। সকল কলেজের পুরাতন ও নব্য ছাত্রেরা বৎসরে একদিন কলিকাতার নিকটস্থ একটা বাগানবাটীতে সমবেত হইয়া পড়াশুনা, কথোপকথন, আলাপ-পরিচয়, জলযোগ প্রভৃতি করিতেন। শুনিতাম, এরূপ করিলে দশজনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মিয়া একতা স্থাপনের সুবিধা হয়। এখনও শুনি যে, এইরূপ সম্মিলনাদি হইতে এইরূপ সুফল লাভ করা যায়। আমি তখনও একথা বিশ্বাস করিতাম না, এখনও করি না। মানুষের-মতো মানুষ হইলে তাহাদের সম্মিলনে সুফল ফলিতে পারে, নহিলে পারে না। আমরা তো মানুষই নহি। তথাপি ঐ "কলেজ রি-ইউনিয়নে" যাইতাম। যাইতাম ওরূপ কিছু

মনে করিয়া নয়। যাইতাম—কৃষ্ণ বন্দোঃ, রাজেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, প্যারীচাঁদ, রামশঙ্কর, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় আমিও একজন কলেজোত্তীর্ণ—আমিও তাঁহাদের সমান, এই শ্লাঘার ভরে। এবং আমার বিশ্বাস যে অনেকেই আমার ন্যায় শ্লাঘার ভরে যাইতেন। সদ্ভাব সৃষ্টি বা বন্ধুত্ব বিস্তারের আকাঙ্খী হইয়া কেহ যাইতেন না।

কিন্তু ও সকল কথা এখন থাক। আমি দ্বিতীয় "কলেজ রি-ইউনিয়নে"র সহকারী সম্পাদক হইয়াছিলাম। সম্পাদক হইয়াছিলেন রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার "মরকতকুঞ্জ" নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে সেবারকার উৎসব হয়। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা করিতেছি এমন সময় একটা বিদ্যুৎ সভাগৃহে প্রবেশ করিল। অপরকেও যেভাবে অভ্যর্থনা করিতেছিলাম বিদ্যুৎকেও সেইভাবে অভ্যর্থনা করিলাম বটে, কিন্তু তখনই একটু অস্থির হইয়া পড়িলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে ? শুনিলাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম—'আমি জানিতাম না, আপনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আর একবার করমর্দন করিতে পাইব কি ?' সুন্দর হাসি হাসিতে হাসিতে বঙ্কিমবাবু হাত বাড়াইয়া দিলেন। দেখিলাম হাত উষ্ণ। সে উষ্ণতা এখনো আমার হাতে লাগিয়া আছে। সে হাত পুড়িয়া যায় নাই—আমার হাতের ভিতরেই আছে। যে ভালবাসাইয়া যায়, আগুনে তাহাকে পোড়াইতে পারে না।

সেদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার অধিক কথাবার্তা হয় নাই। কিন্তু সন্ধ্যার পর রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের মূর্তিমান রাগাদি (tableux vivantes) দেখিবার সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'আপনি আপনার কোন্ উপন্যাসখানিকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করেন।' ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়া, কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"বৃষবৃক্ষ"। তখন বোধহয় "চন্দ্রশেখর" পর্যন্ত লিখিত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরেই এক বিচিত্র ব্যাপারে আমাকে বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল কৃষ্ণকিশোর ঘোষ মহাশয়ের উইলসূত্রে হাইকোর্টে এক মকর্দমা উপস্থিত হয়। উইল বাঙ্গালায় লিখিত এবং উহার একটি বিধানের অর্থ লইয়া বিবাদ। একপক্ষের ইচ্ছা, বঙ্কিমবাবুর দ্বারা উহার অর্থ করান। বঙ্কিমবাবুকে সম্মত করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হয়। বঙ্কিমবাবুর পিতৃবন্ধু, ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্তী সরিষা গ্রাম নিবাসী রামকুমার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র

আমার সহোদর সদৃশ দুর্গারামকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম। তখন তিনি হুগলীর অন্যতম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কাছারি করিতেছিলেন। শামলা মাথায় দিয়া গিয়াছিলাম, কারণ আমি তখন প্রতিদিন বড় আদালতে হাওয়া খাইতে যাইতাম। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন না—উকিল মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা কোনো মকদ্দমায় আসিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'আমরা কোনো মকদ্দমায় আসি নাই, আমার নাম—' 'চন্দ্রবাবু'—এই বলিয়া উঠিয়াই দাঁড়াইয়া মহা সমাদরপূর্বক আমাদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন এবং আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন বলিলেন। কিন্তু নিজে এমন কষ্টকর অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকার করিয়া আমাদিগকে একটি অতি সুখকর অনুরোধ পালন করিতে স্বীকার করাইলেন—রবিবার তাঁহার বাড়িতে আসিয়া আহার করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়া সেই আমার প্রথম আহার। আহার করিলাম—আদর।'

সকলেই এখন জানেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাড়ি জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে। পূর্ববঙ্গ রেলপথে গমনাগমন-কালে অনেকে সে বাড়ি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কতক প্রাচীন ধরনের, কতক নব্য ধরনের অট্টালিকা। সদর বাড়ির বৃহৎ পূজার দালান ও প্রাঙ্গণ। দুর্গারাম ও আমি বেলা ৯ ঘণ্টার সময় পৌঁছিয়া দেখিলাম, সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে এবং পূজার দালানের প্রশস্ত রোয়াকে সমস্ত সমবেত শ্রোতৃবর্গের মাথার উপরে আপন মস্তক প্রায় অর্ধহস্ত উত্তোলিত করিয়া এক দীর্ঘকায় বিশালবপু বলিষ্ঠ বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। দুর্গারাম বলিলেন, 'উনিই বঙ্কিমবাবুর পিতা, রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।' আমার মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি বঙ্কিমবাবু এবং তাঁহার সহোদরদিগকে বড় পিতৃভক্ত দেখিয়াছি—সকলেই যেন এইভাবে বিভোর—'আমাদের পিতা অসাধারণ শক্তি ও মহত্ত্ব স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছেন।'

প্রাঙ্গণ বা পূজার দালানে বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে না পাইয়া একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায়? ভৃত্য বাহিরের একটি ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া দিল। গৃহটি একতালা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের শিবের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে। উহা বঙ্কিমবাবুর নিজের বৈঠকখানা—সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যেমন আপনি ছিলেন তেমনই। অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এবং অপূর্ব লেখা লিখিবার ও বন্ধুদিগের সহিত অকৃত্রিম অপরিমেয় আলাপ করিবার উপযোগী নিভৃততার জন্য

ঐ গৃহটি বঙ্কিমবাবুর বড়ই প্রিয় ছিল। উহা এখন সাহিত্যসেবিদিগের পীঠস্থান হইয়াছে। পীঠস্থানের বর্তমান অবস্থা কিরূপ জানি না। অনেক দিন তথায় যাই নাই। বড় আশা আছে, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয়তম দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দরের পরম স্থান হইবে।

ঐ ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদিগকে পাইয়া, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনারা যে সত্যই আসিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, আসিবেন না। রবিবার উকিলদের বাড়িতে মক্কেলের ভিড় লাগে। মক্কেল পাইলে আপনাদের তো আর কিছুই মনে থাকে না।' কাঁটালপাড়ার বাটীতে অনেকবার গিয়াছিলাম, একবারের কথা বলি। নবমী পূজার দিন প্রাতে গেলাম। সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূজার দালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তা হবে না, রাধানাথকে প্রণাম করিয়া আসিয়া বস।' দেবীর প্রতিমার দক্ষিণ পার্শ্বে সুন্দর বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিগ্রহের কথা কহিতে বড় ভালবাসিতেন, বলিতেন, 'উনি আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন, সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আবদার রক্ষা করেন—রোগে, শোকে, বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদিগকে বড় ভালবাসেন।' এমন সরলভাবে এমন ভক্তিভরে রাধানাথের কথা কহিতেন যে শুনিতে শুনিতে আমার চক্ষে জল আসিত। একবার বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর একখানি অলঙ্কার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন, 'অলঙ্কারখানি এখন পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধানাথের নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনো উদ্ধার হয় নাই।'

বঙ্কিমবাবু যে সময় কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হুগলীতে কর্ম করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া ঢাকায় যাই। তিনি কিন্তু আমায় বলিয়াছিলেন, 'যাইতেছ যাও, কিন্তু এ কাজে থাকিতে পারিবে না।' আমি ছয়মাস মাত্র ডেপুটিগিরি করিয়া উহাতে ইস্তফা দিয়া আসি। তাহার দিনকতক পরে বঙ্কিমবাবু হুগলীতে বাসা করেন। দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন। যোড়াঘাটের ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বের বাড়িতে তাঁহার বৈঠকখানা, এবং বৈঠকখানার দক্ষিণে দুইখানা বাড়ির পর একটি বাড়ি, তাঁহার অন্দর ছিল। অন্দর-বাটীর পূর্বাংশের চাতালটি স্তম্ভোপরি নির্মিত। উহার নীচে দিয়া গঙ্গার স্রোত প্রবাহিত হইত। ঐ চাতালে দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু একদিন

বলিয়াছিলেন, 'সন্ধ্যার পর আমরা এইখানে বসিয়া থাকি।' বুঝিয়াছিলাম, নিশীথে আপনার নাতিগুলিকে লইয়া ভাগীরথী ভোগ করেন। তিনি স্রোতস্বিনীর শোভা দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। বৈঠকখানা-বাড়িতে তিনটি ঘর ছিল, তন্মধ্যে মাঝের ঘরটি সর্বাপেক্ষা বড়। সেই ঘরে গঙ্গার দিকে একটি বাতায়নের পার্শ্বে একখানি ইজিচেয়ারে বসিতেন। কথা কহিতেন, আর গঙ্গা দেখিতেন। গঙ্গা দেখিয়া তাঁহার ক্লান্তি বা বিরক্তি হইত না। আমি প্রায় প্রতি শনিবারে সেখানে যাইতাম। কোনো শনিবার না গেলে তাঁহার বড় কষ্ট হইত। আমি প্রায়ই নৈহাটী দিয়া যাইতাম। নৌকায় আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র ঘাটের নিকটে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেন। একবার ঘাটে নৌকা পৌঁছিবামাত্র আমি নামিলাম না দেখিয়া বলিলেন, 'এস।' আমি বলিলাম, 'যাব কি না তাই ভাবছি।' যাইবামাত্র হাসি, আর আলিঙ্গন। সে কথা আর কি বলিব।

বঙ্কিমবাবুর খাওয়াইবার বন্দোবস্ত বড় চমৎকার ছিল। আদরের খাওয়া ভিন্ন তাঁহাব কাছে কখনই খাই নাই। যখনই গিয়াছি, দুই এক দণ্ড পরেই নানা সামগ্রী প্রস্তুত দেখিয়াছি। যখনই আসিতে চাহিয়াছি, তখনই নানা সামগ্রী খাইয়া আসিয়াছি। ভাবিতাম, এ সব কি মন্ত্রে প্রস্তুত হয়! শীঘ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, মন্ত্রেই প্রস্তুত হয়—আর তাঁহার পত্নীই সেই মন্ত্র। আমি তো অনেকবার গিয়া অনেক দেখিয়াছিলাম। আমাব ঋষিতুল্য বন্ধু রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবার মাত্র আমার সঙ্গে গিয়া বলিয়াছিলেন, 'বঙ্কিমবাবু কি বন্ধুবৎসল।' একবার সন্ধ্যার কিছু পরেই পৌঁছিয়া শুনিলাম, তাঁহার জ্বর হইয়াছে, তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। কিন্তু সংবাদ পাইবামাত্র উঠিয়া আসিলেন, আসিয়া নানা কথা কহিলেন। আমি যতক্ষণ আহার করিলাম, ততক্ষণ আমার কাছে উপবিষ্ট রহিলেন—যেন কোনো অসুখই হয় নাই, যেন দেহে ও মনে স্ফূর্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বঙ্কিমবাবু সাহিত্যানুরাগীদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন—আলাপ করিলে ভাল থাকিতেন। সাহিত্য ও সাহিত্যানুরাগীর সংসর্গ তাঁহার যেন প্রাণবায়ু ছিল। সে সংসর্গ না পাইলে তাঁহার প্রাণ যেন ফুলিয়া উঠিত। যেবার হেমচন্দ্রকে লইয়া যাই, সেবার গিয়া দেখি, মহামহোপাধ্যায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন। শীতকাল—সন্ধ্যা আগতপ্রায়। শীঘ্রই টেবিলের উপর দীপ জ্বলিতে লাগিল। সকলে টেবিল বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন। অতুল রূপ, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, অপূর্ব কমনীয়তা-মিশ্রিত অসীম প্রতিভা ও

পুরুষকার-ব্যঞ্জক মুখগৌরব লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্রাটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অন্তরে কি আনন্দ। হেমচন্দ্র উপস্থিত—অগ্রে রামায়ণ মহাভারতের কথা আরম্ভ হইল; সেইকথা হইতে আরও কত কথা আসিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কি স্ফূর্তি। স্ফূর্তিতে এই কথা ফুটিতে লাগিল—ইহাই তো সুখ। ইহাই তো জীবন,—এই রকমই তো চাই।

সাহিত্যের সংস্রব মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র সুখী হইতেন। এক শনিবার অফিস হইতে বেলা তিনটা কি চারিটার সময় তাঁহার কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখি, অসুস্থতার জন্য তিনি মেজের উপর শয্যায় শুইয়া আছেন, আর দুইখানা কেদারায় দুইটি যুবক বসিয়া আছেন। একটি যুবককে আমি চিনিতাম। তিনি একখানা ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমবাবুকে উপহার দিতে গিয়াছিলেন। আমি যাইবার দুই-চারি মিনিট পরেই যুবক দুইটি চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইঁহারা কতক্ষণ ছিলেন?' তিনি বলিলেন, 'দুই-তিন ঘণ্টা হইবে।' সাহিত্যের সংস্রব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমবাবু অত ছোট যুবক দুইটিকে লইয়া অতক্ষণ স্থির-ধীর-প্রফুল্লভাবে থাকিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলাম, যুবকদ্বয় স্বয়ং তাঁহার নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

মাতৃভাষায় লিখিতে, বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে তিনি অনেককেই উৎসাহিত করিতেন। আমি কখনো বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ঘৃণা করি নাই। তখন চারিদিকে মাতৃভাষার নিন্দা শুনিতাম, স্কুলেও উহা ভাল করিয়া শেখান হইত না। কিন্তু আমি লুকাইয়া বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিতাম। লিখিয়া লুকাইয়া রাখিতাম। কাহাকেও দেখাইতাম না। বঙ্কিমবাবু যখন যোড়াঘাটের বাড়িতে ছিলেন, তখন বাঙ্গালা লিখিবার জন্য আমায় বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, 'ভয় করে, বানান ভুল করিয়া হাস্যাস্পদ হইব।' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শন প্রেসে একজন পণ্ডিত আছেন, তিনি বানান ঠিক করিয়া দেন।' বঙ্কিমবাবুর যোড়াঘাটের বাড়িতে হরপ্রসাদকে প্রথম বন্ধুস্বরূপ পাই। হরপ্রসাদের বাড়ি নৈহাটীতে। তিনি সর্বদাই গঙ্গা পার হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় যাইতেন। তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরমভক্ত দেখিতাম, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার বুদ্ধির ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন, এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিতেন।

আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিমবাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটির দিন বৈকালে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাড়িতে যাইতাম। নানা শাস্ত্রজ্ঞ, গম্ভীর-প্রকৃতি বালকবৎ-সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন, রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার বাসায় তাঁহার আরও কয়েকটি বন্ধু বড় অনুরাগভরে আসিতেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কলিকাতায় থাকিলে তিনি ; তারাকুমার কবিরত্ন, বঙ্কিমের সহাধ্যায়ী বলাইচাঁদ দত্ত, কবি হেমচন্দ্র, কোমৎ-মতাবলম্বী যোগেন্দ্রচন্দ্র। আর সর্বদাই সেখানে থাকিতেন- বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম দাদা সঞ্জীবচন্দ্র। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা ও হৃদয়ের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে যাইতাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গদ্য রচনা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আমরা একপ কল্পনাপ্রিয় জাতি, রচনায় সত্য-মিথার প্রভেদ করা এত তুচ্ছ পদার্থ মনে করি যে, আমাদেব দ্বারা কাহারও জীবনচরিত লেখা, বোধকরি হইতেই পারে না। বঙ্কিমবাবু তো অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, সত্য মিথ্যা তাঁহাতে সকলই সাজে, তাহার পর আজি ১৭।১৮ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে অলীকবাদ যে উঠিবে, আশ্চর্য নহে। আমি সামান্য ব্যক্তি, এখনো 'জলজীয়ন্ত' জীয়ন্ত রহিয়াছি, আমার সম্বন্ধেও বিস্তব মিথ্যাকথা শুনিতে পাই। তাহাতে আবার আমার পিতৃদেবকে লইয়া টানাটানি করা হয়।

আমার বন্ধু, জ্যেষ্ঠসহোদরোপম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর মহাশয় "বঙ্গবাসী" প্রকাশিত গোপাল উড়ের টপ্পার পরিশিষ্টে লিখিতেছেন, 'এক সময়ে উমেশ ভূলোর মধ্যে মনোবাদ ঘটিয়াছিল, ফলে গোপাল উড়ের যাত্রার দুইটি দল হইল। শুনা যায় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চুঁচুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সবকার মহাশয়ের পিতা খ্যাতনামা গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় নিজ বাড়িতে এই উভয় দলের বায়না করিয়া এ বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন।' সবৈব মিথ্যা। এ মিথ্যায় আবার একটু ক্ষতি আছে। আমাদের বাড়িতে তৎকাল-প্রসিদ্ধ সমস্ত যাত্রার দলের গাহনা হইয়াছিল ; অথচ পিতৃদেব কখনো গোপাল উড়ের গান বাড়িতে দেন নাই। কেন দেন নাই, অনেকে বুঝিতে পারিবেন। তবে আবার তিনি বিবাদ মিটাইবার জন্য সেই দলের বায়না করিবেন কেন?

একটা আমার নিজের কথা বলি। "আর্যাবর্তে" "পুরাতন প্রসঙ্গ" নামে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী গুপ্তের কথাবার্তা প্রকাশিত হইতেছে। বিপিনবাবু বলিতেছেন, 'পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কিমবাবু কি কখনো আপনার Law Lectures শুনিতে আসিতেন?' তিনি বলিলেন, 'আমার Law Lectures? বঙ্কিমবাবু?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞা হ্যাঁ। আপনার।' তিনি বলিলেন, 'না, কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বল দেখি?' আমি বলিলাম, 'একজন প্রধাণ সাহিত্যসেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে ঐরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন ; ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পোশাক পরিয়া বঙ্কিমবাবু

আপনার ক্লাশে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেকচার শুনিতেন।' তিনি বলিলেন, 'দেখ একথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের পূর্বে আমি Law Lecturer হই নাই। কখনো যে তিনি আমার ক্লাশে আসিয়াছিলেন, এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমবাবু ও আমি একত্রে Law-Cla.;-এ লেকচার শুনিতে যাইতাম, প্রবীণ সাহিত্যসেবী এই অধম। আমি "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম।—

'প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। - - - তৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়—তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেস্টারি লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধবিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন, মহাশয়!' কৃষ্ণকমল বলিলেন, 'আচ্ছা!' অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদীঘির ধার দিয়া ছাতা ধরিয়া সটানে সমানে চলিয়া গেলেন।'

এরূপ ভুল বা ভ্রম হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। বিশেষ, আমার প্রবন্ধ যখন ছাপান রহিয়াছে। তাহার উপর "আর্যাবর্ত" সম্পাদক একজন কৃতবিদ্য প্রবীণ সম্পাদক; তিনি আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। এরূপ ভুল তাহার চক্ষু এড়াইয়া যাওয়া আরও ক্ষোভের বিষয়। আসল কথা, আমরা সত্য-মিথ্যার ভেদ করা তুচ্ছ জ্ঞান করি।

বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কোনো কথা বলিতে যাওয়া এখন একরূপ ঝকমারি হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমবাবু বাস্তবিক মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে আরো বাড়াইতে যাওয়া একরূপ বাতুলতা; ১৩০২ সনের বৈশাখে শ্রীমান হারাণচন্দ্র লিখিলেন 'সেই দুই মাস মাত্র পড়িয়া মেধাবী বঙ্কিম যথাকালে প্রশংসার সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।' এই শ্রাবণ মাসের "সাহিত্যে" শ্রীমান শচীশচন্দ্র লিখিতেছেন, 'পরীক্ষায় দুইজন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন, তাও আবার দ্বিতীয় বিভাগে। প্রথম স্থান অধিকার করিলেন বঙ্কিমবাবু, দ্বিতীয় হইলেন বাবু যদুনাথ বসু।'

এখন প্রকৃত কথা সরকারী বিবরণ হইতে শুনুন—

"The necessity for reducing the standard, as the Court of Directors had advised, was at once seen from the

Poor results of the first examination, in which only two students from the Presidency College obtained degrees, and these were conferred by favour"

—Report by the Bengal Provincial Committe 1884. Page 14. Para 45.

এমন করিয়া, খুঁটিনাটি করিয়া চরিত লেখা চলে না। তাহাতে এমনও কেহ মনে করিতে পারেন যে, আমি বঙ্কিমবাবুকে খাট করিবার জন্য এইরূপ কথা লিখিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে। বঙ্কিমবাবুর মতো মনীষী পাস করিতে পারেন নাই বলিয়া বি. এ. পরীক্ষার কঠোরতা কমিয়া গেল, এবং আমার মতো কত শত অভাজন বি. এ. পাস করিয়া কৃতার্থ হইল। আসল কথা, সত্য জানিতে পারিলে প্রকাশ করাই ভাল। তাহাতে ভাল ব্যতীত মন্দ হয় না।

কিন্তু সকল কথার প্রতিবাদ তো আর সরকারী বিবরণ দেখাইয়া করা যায় না। অথচ বঙ্কিমবাবুর চরিতে বা চরিত্রে অনেক মিথ্যা যোজিত হইতেছে। সেগুলি প্রতিবাদ করিবার উপায় কি? ধরুণ একটি কথা উঠিল—বঙ্কিমবাবু কেমন সাহসী ছিলেন। আমি চরিত-লেখক হইলে হয় তো, এ সকল কথা তুলিতাম না। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তুলিলে সেই কথার কোনোরূপ উত্তর না দিলে চলে কই? বঙ্কিমবাবু একজন বিশেষ সাহসী পুরুষ ছিলেন। এমন কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। এখন যাহাকে 'সাধুভাষা'য় nervous বলে, তিনি সেইরূপ nervous ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বটে, কিন্তু ঘোড়া চড়িতে একেবারে পারিতেন না; পর্বতে কখনো উঠেন নাই। কিন্তু তিনি nervous ছিলেন বলিয়া যে ভূত-ভয়-গ্রস্ত ছিলেন —এমনটা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে "ললিতা" প্রকাশিত হয়। একখণ্ড আমার আছে। তাহাতে ভৌতিক গল্প, এমন কোনো কথা নাই। ২২ বৎসর পরে, বঙ্কিমবাবু যখন প্রবীণ, তখন ঐটির পুনর্মুদ্রণ করেন। অনেক স্থলে খোল নলচে—দুই বদলাইয়া দেন। তাহাতেই ছাপা আছে,— "ললিতা ভৌতিক গল্প!" এই ভৌতিক কথা লইয়া, কোনো ভূতের ব্যাপারের সহিত গল্পের সম্পর্ক আছে, বুঝান হইয়াছে।

ঐরূপ বুঝান ভুল। প্রথম কথা, ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে যখন "ললিতা" ছাপান হয়, তখন "ভৌতিক গল্প" নাম ছিল না; "পুরাকালিক গল্প" নাম ছিল। তাহার পর বঙ্কিমবাবুর বাল্যাবস্থায় কাঁটালপাড়ার চাটুয্যেদের বাড়ির দক্ষিণে

খাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ খোলামাঠ ছিল। তাহাতে আশে-পাশে দুই-একটা ঝোপ থাকিলেও, বড় গাছের জঙ্গল একেবারেই ছিল না। আমি অবশ্য সে সময়ের কথার সাক্ষী নহি। তবে বঙ্কিমবাবুর মুখে শুনিয়াছি, তিনি সকালে-বিকালে সেই ক্ষুদ্র প্রান্তবের শস্প শয্যাব উর্ধ্বমুখে শয়ান থাকিতে ভালবাসিতেন। আর সেই যে প্রাণ-ভবিয়া স্বভাবেব শোভা-সন্দর্শন, তাহাতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তিব স্ফুরণ হইয়াছিল। সেই প্রভাতেব বালারুণচ্ছটা, সেই সন্ধ্যা-গগনের রক্তিম আভা, সেই ঢল-ঢল দুর্বাদলময় প্রান্তরেব সবুজ লীলা, সেই চারিদিকের গাছপালার বিচিত্র হরিৎ সমন্বয়, মাথার উপব মেঘের সেই বর্ষব্যাপিনী লীলা-খেলা—নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী। কিন্তু আমরা দেখি কি? দেখি না। বঙ্কিমবাবু বয়সকালে কিঞ্চিৎ colour-blind বা রং-কানা হইলেও অতি বাল্যাবস্থা হইতেই এই সকল দেখিতেন, প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আত্মহাবা হইতেন। শীতল সমীরণের নিয়ত সর-সর শব্দ, প্রভঞ্জনের স্বন-স্বন-স্বনন, সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ কুল্যাব কুল কুল রব, অজস্র বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলি, ক্বচিৎ উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষপুটধ্বনি, এবং বায়ুস্তর ভেদ করিযা শন্-শন্ গতি-শব্দ, বালক বঙ্কিম কান ভরিয়া, প্রাণভরিয়া শুনিতেন, উপভোগ কবিতেন, করিয়া স্বভাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে তিনি যেরূপ সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আর কয়জন বাঙ্গালী সেরূপ করিয়াছেন, আমি জানি না, কাঁটালপাড়াব সেই প্রান্তরটুকু, বাঙ্গালীর পুণ্যক্ষেত্র—গাছপালায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তোমরা সকলে এইবেলা একবার দেখিয়া আসিও।

বুঝাগেল, বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যাবস্থা হইতেই স্বভাব-সৌন্দর্যের সেবক। এই সেবার গুণে তিনি সকলরূপ সৌন্দর্যের উপভোগ করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সেইজন্য একজন প্রকৃত সাহিত্য-সবেক। এখন বাঙ্গালার সাহিত্য বিশ্ব-ব্যাপারে প্রসার পাইয়া নিতান্ত অগভীর হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা এইরূপ প্রসার বৃদ্ধিতে প্রশ্রয় দিতেছেন, তাঁহাদের সমীচীনতায় আমরা সন্দেহ করি। বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় আবার ইহার বিপরীত ছিল; বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসার তখন প্রায় কবিতা পর্যন্ত ছিল। যাত্রা, গান, কীর্তনের কথা এখন ধরিলাম না। তখন বঙ্গ-সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন কবিতার চর্চার নামই ছিল সাহিত্যচর্চা। পূর্ব হইতেই কাব্য-গ্রন্থ-পাঠ আমাদের সাহিত্য-চর্চার সীমা ছিল। 'কেবল পাঠশালা বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত; বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদী মুদীখানায় পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর ৺শিবের মন্দিরের ধারীতে বসিয়া, মোসাহেব মুখুয্যে মহাশয় বড়মানুষের

বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে কৃত্তিবাস কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজী ঠাকুর আখড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃ-মণ্ডলী মধ্যে "চৈতন্য চরিতামৃত" পাঠ করিতেন। তদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের "চণ্ডী", রামেশ্বরের "শিবায়ন", ঘনরামের "ধর্মমঙ্গল", দুর্গাপ্রাসাদের "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী" প্রভৃতি গীত ও পঠিত হইত। বহুকাল এইরূপ চলিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত আসিয়া কাব্য সাহিত্যে একরূপ নূতন ভাব আনিলেন।

তাঁহার কর্তৃক বঙ্গ সাহিত্যে ঢল নামিল, স্রোত চলিতে লাগিল, একটা জীবন্ত ভাব আসিল। কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়া চাড়া করিয়া সাহিত্য এখন আর সন্তুষ্ট নহে। যখন সমাজে যে বিষয়ের আন্দোলন হয়, গুপ্ত-কবি তখন সেই বিষয়েই কবিতা লেখেন, সমাজে সাহিত্যে যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাহারই প্রমাণ দেন। তাহার পর, বর্ষার সময়—বর্ষা-বর্ণন, গ্রীষ্মে—গ্রীষ্ম-বর্ণন, বড় ঝড় হইলে—ঝড়-বর্ণন করেন। ১লা বৈশাখের "প্রভাকরে" সমগ্র পূর্ব বৎসরের ঘটনাবলীর কাব্যচিত্র প্রদান করেন। কেহ খৃস্টান হইতে গেলে, তখনই তাহার বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচিত হইল। বিধবা-বিবাহের গোল উঠিল, ঈশ্বর গুপ্ত ক্রমাগত সেই বিষয়ে পদ্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কবিতা এখন আর নর-দানবের যুদ্ধ লইয়া বা কৌরব-পাণ্ডবের বিবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না। বাঙ্গালার সকল কথাই এখন বাঙ্গালা কবিতাতে আলোচিত হইতে লাগিল। কবিতা একটি জীবন্ত পদার্থ হইল। বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের সহিত বাঙ্গালা কবিতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সকলেই বুঝিতে পারিলেন।'

এই ঈশ্বর গুপ্ত যখন সম্রাট্, তখন বঙ্কিমবাবু নিতান্ত বালক। বালক তখন স্বভাবের সৌন্দর্য-উপভোগে অভ্যস্ত হইয়া সাহিত্যের রস-উপভোগে ব্রতী হইয়াছেন। "প্রভাকরে" পদ্য লিখিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমের মতো সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সাকরেদ, বঙ্কিমবাবু নিজে বলিতেছেন—

'দেশের অনেকগুলি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন বসু আর-একজন। ইঁহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকটে ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমারপ্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।'

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র আবার বলিতেছেন—

'যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক—স্কুলের ছাত্র। কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ সুন্দর-কান্তি-বিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্তা কহিতেন—তাহার কতকগুলা নন্দী-ভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাসের ভাব তাহাদের উপরে পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত একদণ্ড থাকিতে পারিতেন না।। স্ব-প্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকে শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না।। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তি শক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনা-শক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ, দিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনি প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা-প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মতো ছিল—সরল স্বচ্ছ দেশী কথায় দেশীভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধহয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র—সকলেই গিয়াছেন— তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।'

অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সময় হইতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা করিতে থাকেন। কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশলাভ করেন; বঙ্কিমের কোনো কোনো চরিত-লেখক বলিতেছেন, হুগলি কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি, শিক্ষা করেন। আমি বলি না। কেন বলি না, তাহা বুঝাইতে গেলে কেবল খুঁটিনাটিতেই আমার প্রবন্ধ পূরিয়া যাইবে, সে তো ভাল হইবে না। "চরিত"-লেখক নিজেই বলিতেছেন,—বঙ্কিমবাবু, ৫৭ সালে বি. এ. পরীক্ষা দেন, আর ঈশানবাবু ১৮৬৪ সালে হুগলী কলেজের হেড মাস্টার পদে নিযুক্ত হন। তবে ঈশানবাবুর কাছে বঙ্কিমবাবু শিখিলেন কবে? যাউক আর ও সকল অসাবধানতার কথা তুলিব না।

বঙ্কিমবাবুর প্রথম গ্রন্থ— 'ললিতা। / পুরাকালিক গল্প / তথা / মানস' পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া 'তথা কথাটি অনুধাবন করিবেন। 'তথা' অর্থ—এবং বা ও। ললিতা—পুরাকালিক গল্প, মানস তাহা নহে।

এই গ্রন্থ "কলিকাতা শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল,

২৮৫৬" সালে। সেই সময়ের লেখা গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন অনুসারে এবং ২২ বৎসর পরের লেখা অনুসারে, এই গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে, "লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়।" বঙ্কিম-বাবুই বলিতেছেন —'প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারিতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই'

গ্রন্থের বিষয় কিছু বলার প্রয়োজন দেখিলে, পরে বলিব, আপাততঃ সেই গ্রন্থে গ্রন্থকার-লিখিত গদ্য বিজ্ঞাপনই আমাদের আলোচ্য। সেই বিজ্ঞাপনটি এই,—

বিজ্ঞাপন

'সু কাব্যালোচক-মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা-রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন। তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয় মানস মাত্র রঞ্জনা-ভিলাষীজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবার তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্মার্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা-জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন। গ্রন্থকার'

বি. এ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে উপরের ঐ বিজ্ঞাপনটি থাকিলে, সকলেই হয় তো মনে করিতেন যে ওটি পরীক্ষকদিগের মন-গড়া সদোষ লেখা। তাহা নহে। ওটি পরে গদ্য-লেখার সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরচিত বিজ্ঞাপন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে তিনি কবিতা দুটি লেখেন, তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ তাঁহার যখন আঠার বৎসর বয়স, তখন বিজ্ঞাপন লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। তাহার পরই বর্ষকাল মধ্যে তিনি বি. এ. পরীক্ষা দেন। এখন একবার এর সময়ের বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাস আলোচনা করা যাউক।

খুরচা গদ্য বা কড়্‌চার কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রথম যুগের গদ্যলেখক রাজীব-লোচন রায়, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। ১৭২৫ খৃস্টাব্দ হইতে প্রায় সপাদ শতবর্ষ এই যুগের

পরিমানকাল। ১৮৪৩ সালে "তত্ত্ববোধিনীর" প্রকাশে বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল। বঙ্কিমবাবুর এই লেখাটি ১৮৫৬ সালের মধ্যে; একটি ছোট-খাট যুগ অর্থাৎ বার বৎসর গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি গদ্য-গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মার্শম্যান সাহেব, য়েটস (Yates) সাহেব প্রভৃতির কথা ধরিব না। মুক্তারামের "আবোধীঘোপাখ্যান" ও "অপূর্বোপাখ্যান" মদনমোহনের "ঋজুপাঠ" বা তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা বাংলা গদ্যের আদর্শ। তখনও আদর্শ, এখনও আদর্শ। তারাশঙ্করের স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক প্রাপ্ত-পারিতোষিক-প্রবন্ধ যেমন সরল রচনার দৃষ্টান্ত, তাঁহার "কাদম্বরী" তেমনই শব্দচ্ছটায় এবং ভাবঘটায় মোহকরী। ১৮৪৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "জীবনচরিত" প্রকাশিত হয়,—ইংরাজির এইরূপ প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রায় দেখা যায় না। তাহার পর "বেতাল-পঁচিশ" ও "বোধোদয়"। প্যারীচাঁদ মিত্র তখন "মাসিক পত্র" ও "আলালের ঘরের দুলাল" প্রভৃতি প্রকাশিত করেন। বঙ্কিমবাবু বহুপরে বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ বাঙ্গালা গদ্যে যুগান্তর আনয়ন করে। অক্ষয়কুমারের তিনখানি "চারুপাঠ" ও "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রকাশিত হইয়াছে। আর বোধকরি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "প্রাকৃত-ভূগোল" ও "বিবিধার্থ-সংগ্রহের" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। তাছাড়া এই সময়ে "তত্ত্ববোধিনী" ও "সমাচার-চন্দ্রিকা" তো ছিলই, "এডুকেশন গেজেট"ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, ঠিকঠাক বলিতে পারি আর নাই পারি, বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন লেখার সময় বাঙ্গালা গদ্য বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব রঙ্গ দেখাইতেছিল। বাঙ্গালার গদ্য, একটা শিক্ষার উপায় এবং উপভোগের সামগ্রী হইয়াছিল। সাহিত্যের প্রসার এখন আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই, গদ্যকেও আত্মসাৎ করিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্তের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম সমানে ঘোষিত হইতেছিল।

১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই গদ্য-সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল যে "অত্র কবিতা"র হইবায়" এইরূপ শব্দ দেখিয়া বলিতেছি, এমন নহে। 'হইবেক' 'জন্মিবেক' এরূপ কান্ত-পদ আরো অনেক দিন পর্যন্ত ছিল। তাহার জন্যও বলি না। সমস্ত লেখাটি পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব গদ্যের প্রসাদগুণের অভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই।

মনেহয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।

'অত্র কবিতা,' 'মনোনীত হইবার, ইত্যাদি পরিষ্কার আদালতি বাঙ্গালা, তাহার পর যখন উপসংহার পাঠ করি,—'অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে (গ্রন্থকার) প্রস্তুত নহেন।' তখন মনেহয় কোন বালক আসামী রায় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুরের সমক্ষে, উকিলের শিক্ষামতো কাতরতা জানাইতেছে। লেখাটিতে আদালতি ঢং জাজ্বল্যমান।

তাহার উপর আছে—পণ্ডিতি ঢং। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে টোলের পড়া বঙ্কিমবাবু অনেক পড়িয়াছিলেন। তাহাতেই আমরা দেখিতেছি—তাঁহার ভাষায় পণ্ডিটি প্রবেশ করিয়াছিল। 'সুকাব্যালোচক' পণ্ডিতি বেশ, কিন্তু বাঙ্গালা নহে। 'গুণ হৈতে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।' 'সু' দেখিতেছি, তাঁহাব হাতে পড়িয়া প্রায় 'কু' হইয়াছে। 'সুকাব্যালোচক,' 'সুত্তীর্ণ' আর 'সুরসজ্ঞ', এরূপ 'সু' তো ভাল নহে। 'সু' ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। 'কাব্যালোচক'—যে আলোচনা করে, সে অবশ্য শাস্ত্রমতো আলোচক, কিন্তু এইরূপ শাস্ত্র লইয়া আমরা তো লেখা-বলা করি না; কাব্যালোচক কথা তো তাহার পরে আর খুঁজিয়া পাই না। 'পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ়'—বেশ পণ্ডিতি বটে, কিন্তু যে পাণ্ডিত্যবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেতালপঞ্চবিংশতি গ্রন্থে লেখেন,—'পদবীতে পদার্পণ,' তাহা তো 'পদবীরূঢ়' পদে পাওয়া গেল না। নব্য লেখকগণকে বঙ্কিমবাবু উপদেশ দেন 'যাহা কিছু লিখিবে, সুন্দর করিয়া লিখিবে', 'পদবীতে পদার্পণে', যে সৌন্দর্য আছে, তাহা 'পদবীরূঢ়তে' নাই।'

এ সমালোচনা এই পর্যন্ত। আমরা কেবল এইমাত্র দেখাইতে চাই,—যিনি একসময়ে বাঙ্গালা গদ্যের শাহেনশা সম্রাট হন, তিনি আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত সেই ঐশ্বর্যময় গদ্যের আলোচনা করেন নাই, প্রত্যুত একান্তই অবহেলাই করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে তখন সাধারণে বাঙ্গালা কবিতাই বুঝিত। সে সাহিত্যে তাঁহার অবহেলা তো ছিলই না, গুপ্তের শিষ্যত্ব-স্বীকারেই সে কথার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যও তখন তিনি কিছু কিছু পাঠ করিয়াছিলেন। আর ইংরাজি কবিতা, সেক্সপিয়র হইতে বায়রন, তিনি

বিশেষ করিয়া অনুশীলন করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সৌন্দর্য দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া তিনি কবিতার সৌন্দর্য উপভোগ করিবার শক্তি লাভ করেন। যাত্রা, গান, কীর্তনের কথা এখন বলিব না।

এ প্রবন্ধ এখানেই থাক। দুইটা কথা আমি প্রথমে বলিলাম ১. বঙ্কিমবাবু বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই—কর্তৃপক্ষের favour বা অনুগ্রহে তিনি উত্তীর্ণ বলিয়া পরিচিত হন। এই কথাটির সরকারী দলিলী প্রমাণ দিয়াছি। ২. আর একটা কথা আমার অনুমান; বঙ্কিমবাবু তাঁহার আঠার বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঙ্গালা গদ্যের আলোচনা করেন নাই।

এই দুইটা কথায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার কি কিছু অবমাননা করা হইল? আমি বলি, তা তো নয়ই—প্রত্যুত তাঁহার প্রতিভার গৌরববৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলাম। প্রতিভা দুইভাবে বুঝা যায়,— ১. 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধিঃ প্রতিভা উচ্যতে।' Inventive genius ২. আর এক কার্লাইলের মতে—'Indefategable exertion in pursuit of an object।' আমি যতদূর জানি, তাহাতে বুঝি—এই দ্বিতীয় প্রকার প্রতিভাতেই বঙ্কিমবাবু আমাদের মধ্যে মহিমান্বিত হইয়াছেন।

উপসংহারে একটি নিবেদন করিব, বঙ্কিমবাবুর আত্মীয়-অনাত্মীয় নব্য লেখকেরা বঙ্কিম-চরিত লিখিবার সময় একটু দেখিয়া শুনিয়া সতর্কতার সহিত লেখনী চালনা করেন, আমরা কল্পনাপ্রিয় জাতি, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ আমরা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না—এইরূপ একটা জাতীয় বা বিজাতীয় কলঙ্ক যে আমাদিগের উপর আরোপিত হইয়া থাকে, বঙ্কিমবাবুর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তির চরিত্রাঙ্কনে সেই কলঙ্ক যেন স্পষ্টীকৃত করা না হয়। এই ভাদ্রের চতুর্থীর চন্দ্র আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি, কলঙ্ক আমাদের নিয়তই লাগিয়া আছে,—আপনাদের কৃত কার্যে সেই কলঙ্ক আবার বাড়াইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আমার বহরমপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে, বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যান। তিনি এরূপ সভায় কখনও মিশিতেন না। কেন, তাহার আভাস, প্রেসিডেন্সি কলেজে, তাঁহার যাওয়া-আসার পরিচয়ে একটু দিয়াছি। এখন আর-একটু বলিতে হইতেছে। তাৎকালিক বঙ্কিম-চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া, তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা। বঙ্কিমবাবু আমাদের সমাজে, সাহিত্যে গোলাপ ফুল। গোলাপের কেবল পাপড়ির রং দেখিবে, মিঠা-মিঠা সৌরভ দেখিবে, ঢল-ঢল রূপ দেখিবে; গোলাপের বৃন্তে যে কাঁটা আছে, তাহা কি দেখিতে নাই? গোলাপের কাঁটা আছে বলিয়া কি গোলাপের মর্যাদা কম?

'দেবের দুর্লভ নিধি বিরলে বসিয়া বিধি
সমাদরে সৃজন করেছে।
নরের নিষ্ঠুর করে পাছে লণ্ডভণ্ড করে
এই ভয়ে কণ্টকে ঘিরেছে।'

এইরূপ বর্ণনা করিয়া পিতৃদেব ঋতুবর্ণনে গোলাপের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিম সম্বন্ধেও যদি তাই হয়? যদি সামাজিকদের হাতে লণ্ডভণ্ড হইবার ভয়ে, বঙ্কিমকে কেহ অহঙ্কারের আলোক আবরণ দিয়া, ঘিরিয়া রাখিয়া থাকেন? অত কথা বুঝি আর না বুঝি, এই বুঝি যে, বঙ্কিমকে অহঙ্কারী বলিলে তাঁহার মর্যাদা হানি করা হয় না। কোনো সত্য কথাতে, কাহারো হানি করা করা হয় না; বিশেষ বঙ্কিম অহঙ্কারী ছিলেন বলিয়া, তিনি দাম্ভিক ছিলেন, এমন কথা বলিতেছি না। পিতৃদেব ও আমার সহিত পরিচয়-কাহিনী গোড়া হইতে বলা ভাল।

৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ, বঙ্কিমবাবুর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র, তখন জাহানাবাদে সব-রেজিস্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুই জনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিমবাবু বহরমপুরে যাইতেছেন, বলিয়া সঞ্জীববাবু পিতাকে পত্র লেখেন। আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন, এবং কাছারির নিকট বঙ্কিমবাবুর জন্য একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ি দেখিয়া

শুনিয়া একটি বাড়ি ঠিক করিয়া, ঝাড়াইয়া-ঝুড়াইয়া রাখিলাম, জল তুলাইয়া রাখিলাম, একটি ঠিকা চাকরকেও রাখিয়া দিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে গুণপণায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ সহকারে এই সকল কার্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিমবাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে, আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্র, বি. এল. পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন, বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ি দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিনখানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিনজন ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিমবাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবার্তা চলিল। পরদিন প্রাতে তাঁহার জিনিসপত্র, চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ি করিয়া নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ি করিয়া দিলাম, গাড়িতে তুলিয়া দিলাম। হায় রে হায়! তখনকার কথা মনে পড়িলে, এখনো বুক ফাটে! এ পর্যন্ত বঙ্কিমবাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না, অধীনের প্রতি কপালকুণ্ডলাকারের করুণা-কটাক্ষ হইল না। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখাইতেছিলেন, আমি ফিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন 'বঙ্কিম গেল হে?'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ!' 'তোমার সহিত দুদিনে একটি কথা হয় নাই?' আমি বলিলাম, 'কথা কি, আমি যে একটা জীব, এই বাসায় থাকি, সে খবর হয় তো তাঁহাতে এখনো পৌছে নাই।' পিতা বলিলেন, 'তাই বটে।' বলিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল; পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত,আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারির ফেরতা পিতা পুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা-অসুবিধা কত দূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিমবাবু 'আসুন' বলিয়া পিতাকে সংবর্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে, ব্রাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল, বঙ্কিমবাবুর আদেশমতো পিতাকে তামাক দিল। আমরা তিনজনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিমবাবুর কথোপকথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই-এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ

ন বিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না, তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া ফিরে যে,—

'কাদা মাখা সার হল মোর, মাছ ধরা হল না।'

এইরূপে দিন যায়। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারো জন্য বসিয়া থাকে না। আমারো দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্প গুজব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসেন না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা চার পাঁচ দিনের ছুটি হইল। বঙ্কিমবাবুও বাড়ি আসিবেন, আমিও বাড়ি আসিব। নলহাটিতে আসিয়া দুই জনের দেখা সাক্ষাৎ। সাত আট ঘণ্টা কাল, নলহাটিতে বিশ্রাম বা কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়তো ইস্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ি আসিবে। নয়তো দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাশের বিশ্রাম ঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। এতদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিমবাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে, বঙ্কিমবাবু কথা কহিতে লাগিলেন। এ-কথা সে-কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল—রহস্যকার বোনম্ভের কথা। তখন দুইজনে অসিধার বেনম্ভের মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া বসিয়া তৃপ্তি-পূর্বক, দুইজনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্বণের সেই রসগন্ধে, দুই-জনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল, দিন দিন সেই সহৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়, আমি ছোট। তিনি বয়সে বড়, জাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর 'বন্ধুবৎসলতা'র পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন? আমাদের এই নব বন্ধুতার অচিরাৎ একরূপ পরিণতি হইয়াছিল। দুইদিকে তাহার দুইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। সেই কথার একটু সবিস্তার পরিচয় এক্ষণে দিব। পাঠক, আবার বলি, আমার আত্মম্ভরিতা আবার মার্জনা করিবেন।

বহুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র "লুপ্ত-রত্নোদ্ধারে"র ভূমিকায় বলিতেছেন, 'উহাতেই [আলালের ঘরের দুলাল হইতেই] প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে,

যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, - - - বাঙ্গলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।' "দুর্গেশনন্দিনী", "কপালকুণ্ডলা" লিখিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সম্যক প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধহয় না। তাঁহার ভাষার "লম্ফত্যাগ", "নিদ্রাগমন" প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থসংগ্রহে" বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। আর কায়স্থকুলাধম আমি ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভক্তি লইয়া বঙ্কিমবাবুর সহিত বিচার-বিতর্ক করিয়াছি। মৃচ্ছকটিক নাটকে দেখিবেন, প্রাড্‌বিবাকের পার্শ্বোপবিষ্ট কায়স্থ প্রাকৃতে কথা কহিতেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ হউন, দীনবন্ধু হউন, প্যারীচাঁদ হউন আর রাজেন্দ্রলালই হউন, আমাদের প্রাকৃতের দিকে একটু টান আছে। আমরা বুঝি ধর্মকার্যে, প্রত্নতত্ত্বে, ছটাছন্দ-বিভূষিত কবিতার, সেই কবিতার লালিত্যে ও মাধুর্যে সংস্কৃতের প্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের গুরুজন। কিন্তু গুরুজন লইয়া তো সংসার হয় না। প্রধানত পুত্র-কলত্র, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব—এই সকল লইয়াই তো সংসার। এ সকল তো সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত। তা বলিয়া কেবল বিষয়কার্যের জন্য প্রাকৃত বা বাঙ্গালার প্রয়োজন, এমন নহে। জীবন্ত কাব্যের বাঙ্গালাই জান, অর্থাৎ প্রাণ।

যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায়, তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গলাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায় সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার-বিতর্ক অনেক দিন চলিল। বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে "গরু ঠেঙ্গাইতে" লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়-রূপ ভাষার সমাবেশ হইল। তখন বিষবৃক্ষ হাতের লেখায়, ছাপান হয় নাই।

মধ্যবর্তিনী ভাষার সূচনা হইতেই "বঙ্গদর্শন" প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কত দিন, কত জল্পনা চলিতে লাগিল। কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খৃস্টান ব্রজমাধববাবু প্রকাশকরূপে বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন। লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখক—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র,

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন, ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আর সকলে নামজাদা, কেবল আমিই নামহীন, অথচ আমার নাম ছাপা হইল। ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি "উদ্দীপনা" প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বড় খুশি।

আমি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চুপি চুপি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দেখাইলাম। 'ভোগ্য' 'ভোজ্য' এই দুটা কথায়, আমি একটা কি গোল করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ ভুলই করিয়াছিলাম। তিনি সেটি সংশোধন করিয়া দেন। ব্রজমাধব প্রথম সংখ্যায় আমার সেই প্রবন্ধের টিকি কাটিয়া বাহির করিলেন। প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না। বঙ্কিমবাবু এপলজি করিলেন বটে, আমি কিন্তু মনে মনে চটিয়া লাল। ওদিকে পিতাকে "বঙ্গদর্শন" পাঠান হয় নাই। তিনি চটিয়া আমাকে লিখিলেন—

'Why does not my friend Bankim Chandra send his Bangadarsan to me ? I am able to understand it and can afford to pay for it.'

এই ক্ষুদ্র কথা কয়টিতে পিতার, বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং বন্ধুর সামান্য অবহেলায় "রাগ" বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য বঙ্গদর্শন তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল, এবং পাঠ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর দুর্গোৎসবের পর মাতাঠাকুরাণীর বায়ুরোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম। বহরমপুরে আর গেলাম না, বাড়িতেই রহিলাম। ৮০ সালের বৈশাখ হইতে "বঙ্গদর্শনের" দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিমবাবুদিগের বাড়ি কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সঞ্জীববাবু কাঁটালপাড়াতেই প্রেস স্থাপিত করিলেন। ১২৮০ সালের ১১ই কার্তিক, অর্থাৎ আমি বাড়ি বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে "সাধারণী" প্রকাশিত হইল। আর সেই মাস হইতে, আমি "বঙ্গদর্শনে"র প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম। "সাধারণী"ও "বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে" কাঁটালপাড়ায় ছাপা হইতে লাগিল। ৮১ সালের শ্রাবণ মাসে, আমি চুঁচুড়ার কদমতলায় আমাদের বাড়ির সংলগ্ন আর একটি বাড়িতে, "সাধারণী যন্ত্রালয়" স্থাপন করিয়া "সাধারণী" প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্কিমবাবুর বাড়ি আমার বাড়ি হইতে বেশি দূর নয়। নৈহাটী স্টেশন হইতে তাঁর বাটী যতটুকু দক্ষিণ, আমার বাড়ি প্রায় ততটুকু উত্তর-পশ্চিম। তাঁহাদের বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ আছে, খুব জাঁকাল নিত্য-ভোগ হয়, রোজ দশ সের চাল রান্না হয়, আর নয় সিকা করিয়া নিত্য বাজার খরচ বন্দোবস্ত আছে। শুনিয়াছি, মুড়াগাছা পরগণায় রাধা-বল্লভের খুব একটা বড় তালুক আছে। তারই মুনাফা হতে তাঁহার সেবা চলে। দুইঘর চাটুয্যে মহাশয়রা রাধাবল্লভের সেবাইত, একঘর ফুলে, আর একঘর বল্লভী। বঙ্কিমবাবুরা ফুলে। চাটুয্যে মহাশয়দের সেবার জন্য কিছু দিতে হয় না। কেবল উঁহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা তত ভালো নয়, ভোগের এক অংশ তাঁহাদের বাড়িতে যায়। অনেক গরীব দুঃখী লোক মধ্যে মধ্যে রাধাবল্লভের প্রসাদ পায়। রাধাবল্লভের বারমাসে তের পার্বণ হয়। কিন্তু রথে খুব জাঁক হয়। রথখানি পিতলের, বেশ বড়। বারমাস রথখানি গোলপাতার ছাউনিতে ঢাকা থাকে। রথের সময় উহা বাহির করিয়া ঘসে-মেজে চকচকে করিয়া লওয়া হয়। রথের সময় বঙ্কিমবাবুদের বাড়ির দক্ষিণে একটা খোলা জায়গায় বেশ একটা মেলা হয়। প্রচুর পাকা কাটাল ও পাকা আনারস বিক্রি হয়, তেলেভাজা পাঁপর ও ফুলুরির গাঁদি লাগিয়া যায়, আট-দশখানা বড় বড় ময়রার দোকান বসে, গজা, জিলিপি, লুচি, কচুরি, মিঠাই, মিহিদানা, মুড়ি-মুড়কি, মটরভাজা, চিঁড়ে, চিঁড়েভাজা যথেষ্ট থাকে। আগে ঘিয়ের খাজা থাকিত, এখন আর সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। মেলায় মণিহারি দোকান অনেকগুলি থাকে। তাহাতে নানা রকম বাঁশী, কাগজের পুতুল, কাঠির উপর লাফ দেওয়া হনুমান, কটকটে ব্যাঙ্ কিনিতে পাওয়া যায়। এ সব তো গেল ছেলেদের। বুড়োদের একটি বড় দরকারি জিনিস এই মেলায় বিক্রি হয়—নানা রকম গাছের কলম। আমাদের দেশে যাহারা বাগান করিতে চায়, তাহাদের চারা কিনিবার এই প্রধান সুযোগ। অনেক নারিকেলের চারা, আমের কলম, নেবুর কলম, সুপারির চারা, লকেট ফলের গাছ, গোলাপজামের গাছ, পিচের গাছ, সবেদার গাছ, ফল্সার গাছ এবং গোলাপ, যুঁই, জাতি, বেল, নবমালিকা, কামিনী, গন্ধরাজ, মুচুকুন্দ, বক, কুরচি, কাঞ্চন,

টগর, সিউলি প্রভৃতি নানা ফুলের চারা ও কলম পাওয়া যায়। মেলা আট দিন হয়। প্রথম প্রথম বলিয়া দিলে মালীরা, যে কোনো গাছের চারা চাওয়া যায়, আনিয়া দিতে পারে।

আগে পুতুলনাচের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। প্রকাণ্ড এক দোচালার মধ্যে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ রকমের পুতুলনাচ হইত। সীতার বিবাহ, লবকুশের যুদ্ধ, কালীয়দমন—এসব তো ছিলই, তার উপর একটা মকদ্দমার সঙ ছিল—জজসাহেব বসেছেন, পেশকার কাগজ পেশ করিয়া দিল, কাঠগড়ায় আসামী থাকিল, সাক্ষীর জবানবন্দী হইল, উকীলের বক্তৃতা হইল। জজসাহেব রায় দিলেন। আসামীর ফাঁসি-শাস্তি হইল। ফাঁসিও হইল। ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে আসামীর কাপড়ের ভিতর দিয়া একরকম পদার্থ বাহির হইত দেখিয়া ছেলেরা হাসিয়া খুন হইত। আর-একরকম সঙ ছিল—আহ্লাদে পুতুল। তার একগাল হাসি লাগিয়াই আছে। সে হাত পা নাড়ে আর হাসে।

রাধাবল্লভের বাটীর গেটের বাহিরেই গুঞ্জবাড়ি। একখানা খুব বড় পাঁচ-চালা ঘর। গুঞ্জবাড়ি বলিলে অনেকেই মনে করেন, কৃষ্ণ রথের সময় মাসির বাড়ি যাইতেন, সেখানে অনেক ফুলের গাছ ছিল, কুঞ্জ ছিল, কুঞ্জ হইতে গুঞ্জবাড়ি হইয়াছে। কিন্তু সে কথাটা ঠিক নয়। গুঞ্জ শব্দের মূল—গুণ্ডিচা, অর্থ, কুঁড়েঘর, তামিল ভাষার শব্দ। উড়িয়ারা জগন্নাথকে গুণ্ডিচা বাড়ি লইয়া যায়, তাই দেখিয়া বাঙ্গালীরাও কৃষ্ণকে গুঞ্জবাড়ি লইয়া যায়। বঙ্কিম-বাবুদের পাঁচচালায় কৃষ্ণ আট দিন থাকেন, দিনের বেলায় পুরুষেরা দর্শন করে। সন্ধ্যার পর নানা গ্রামের বৌ, ঝি, গিন্নীবান্নী, আধাবয়সী ও বুড়ীরা আসিয়া দেখিয়া যায়। রাধাবল্লভের পূজারি প্রায়ই একজন খুব বেশকার। নীলমণি ঠাকুর যে বেশ করিতেন, তাহা সত্য সত্যই বলিহারি যাই। বড় বড় যুঁইয়ের গড়ে দিয়ে কৃষ্ণ রাধা তো প্রায়ই ঢাকা থাকেন, তাহার উপর নানা রকম ফুলের গহনা, ফুলের মুকুট ও ফুলের সাজ করিয়া দেওয়া হয়। সে সাজ দেখিয়া, দেশসুদ্ধ লোক চমৎকৃত হইয়া যায়। কোন্ দিন কোন্ সাজ হবে, আগে বলিয়া দেওয়া হয়। যাহার যে সাজ দেখিবার ইচ্ছা, সে সেই দিন আসিয়া তাহা দেখিয়া যায়। তাছাড়া ঘরটিকেও বেশ করিয়া ফুলের মালা-টালা দিয়া সাজান হয়। এই ঘরের সামনে একখানি প্রকাণ্ড আটচালা, চারিদিক্ খোলা, গুটিকতক চৌকা থামের উপর দাঁড়াইয়া আছে। চালাখানি আগে খড় দিয়া ছাওয়া হইত, এখন গোলপাতা দিয়া ছাওয়া হয়। এই

আটচালায় রথের সময় যাত্রা, নাচ, গান, কীর্তন প্রভৃতি হইত। এখন দুই-একদিন যাত্রা হয় মাত্র। আগে আট দিনই খুব জমজমাট থাকিত।

আটচালার পশ্চিমে একটি শিবমন্দির, পাথরের শিবলিঙ্গ, নিত্য-পূজার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে বঙ্কিমবাবুর বসিবার ঘর ও পশ্চিমদিকে একটি ঘর, তাহাকে বঙ্কিমবাবু আদর করিয়া তোষাখানা বলিতেন। সেখানে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম থাকিত। হুঁকা কলিকা, বৈঠক ফর্সি, গড়গড়া, তামাক, টিকা, গুল, আগুন, দেশালাই ইত্যাদি। সে ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বঙ্কিমবাবুর চাকর, নাম মুরলী। মুরলীর গলায় তুলসীর মালা, কিন্তু সে যে বিশেষ বৈষ্ণব ভক্ত, তাহা আমরা দেখি নাই। দক্ষিণ দিকে শিবমন্দির-সংলগ্ন একটি বড় দালান, উহার পূর্বদিকে দুটি দরজা একেবারে খোলাজমিতে পড়িয়াছে, আর পশ্চিমদিকে দুইটি জানালা, ঘরটি পুব-পশ্চিমে লম্বা। এই ঘরের দক্ষিণে দুটি ঘর। দালানটি যতখানি লম্বা, ঘরদুটিও ততখানি লম্বা। পশ্চিমের ঘরটিতে একখানি খাট থাকিত, পুবের ঘরটিতে একটি ফরাশ থাকিত। পশ্চিমের ঘরটিতে বঙ্কিমবাবু দিনের বেলায় শুইতেন, পুবের ঘরটিতে একা বসিয়া লেখাপড়া করিতেন, দুই-একজন বিশেষ আত্মীয়েরও সেখানে যাইবার অধিকার ছিল। কখনো কখনো সে ঘরটিতে দুই-একখানি চেয়ার টেবিলও দেখিয়াছি। দালানটিতে দালানযোড়া একটি ফরাশ পাতা থাকিত, অনেকগুলি তাকিয়া থাকিত, হারমোনিয়ম থাকিত, সময়ে সময়ে অন্যান্য অনেক রকমের বাজনাও থাকিত। দালানের উত্তর দিকে একটি দরজা থাকিত, সেই দরজা দিয়া তোষাখানায় যাওয়া যাইত।

এতক্ষণ যাহা বলিলাম, যে কোনো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে এসব হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে কবি, তাহার কোনো নিদর্শনই এখনো দিই নাই। সে নিদর্শনটি তাঁহার শুইবার ও বসিবার ঘরের দক্ষিণ দিকে দেখা যাইত। সে একটি ছোট্ট ফুলের বাগান, দুকাঠাও পুরা হইবে না। ঘরদুটি একত্রে যত লম্বা, বাগানটিও ততখানি লম্বা, আড়েও প্রায় ঐরূপ। তিনদিকে পাঁচিল দিয়া ঘেরা, সে পাঁচিলের আগায় একটি আলসে ও তাহার নিচে একটি বেঞ্চি। চারিদিকেই এইরূপ। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি চৌকা গাঁথা, হাতখানেক উঁচা, তাহারো আবার মাঝখানে একটি ছোট চৌকা হাতখানেক উঁচা, তাহারো মাঝখানে আবার একটি চৌকা হাতখানেক উঁচা, চারিদিকেই যেন গ্যালারির মতো। এই সমস্ত গ্যালারিতে চারিদিকেই টব সাজান থাকিত।

টবে নানারূপ রঙিন ফুল ও পাতার গাছ। বাগানে আর যেটুকু জমি ছিল, তাহাতে সুরকির কাঁকর দিয়া রাস্তা করা। বাকী জমিতে যুঁই, জাতি, কুঁদ, মল্লিকা ও নবমালিকার গাছ। বর্ষাকালে ফুল ফুটিলে সব সাদা হইয়া যাইত, এবং বৈঠকখানাটি গন্ধে ভরপুর হইয়া যাইত। বঙ্কিমবাবু বাগানটিকে বড়ই ভালবাসিতেন। যতদিন তিনি বাড়ি থাকিতেন, বাগানটি খুব সাবধানে পরিষ্কার রাখিতেন, এবং মাঝে মাঝে অবসর পাইলে আলসেটিতে হেলান দিয়া বেঞ্চির উপর বসিয়া ফুলের বাহার দেখিতেন।

আমরা বালককালে প্রতি বৎসরই রথ দেখিতে যাইতাম। রেলওয়ের গেট হইতে শিবের মন্দির পর্যন্ত দুইধারে অনেকগুলি কামিনীফুলের গাছ ছিল। আমরা প্রায়ই ফুল ছিঁড়িতাম। ফুল ছিঁড়িলেই কেহ-না-কেহ আসিয়া আমাদিগকে ভয় দেখাইত, 'তোমাদিগকে ধরিয়া সঞ্জীববাবুর কাছে লইয়া যাইব।' সঞ্জীববাবু আমাদিগকে কি শাস্তি দিতেন, জানিতাম না, কিন্তু সেই অবধি আমরা জানিতাম যে, শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহাশয়ের পুত্রেরা বড় দুষ্ট লোক ছেলেপিলে ধরিয়া মারেন, সেই ভয়ে আমরা অনেকবার সুযোগ হইলেও রায় বাহাদুরের বাড়ি বড়-একটা যাইতাম না। একবার ধরণী কথকের কথা হইতেছিল। তখন আমার বয়স বছর এগারো, টোলে পড়িতাম। টোলের ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে দুচার দিন ধরণী কথকের কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। রায় বাহাদুরের বাহির বাড়ির পাঁচফুকরে দালানের সামনে যে উঠান আছে, সেই উঠানে কথা হইত। কথকের জন্য যেমন সব জায়গায় ইঁটের বেদী হয়, এ বাড়িতে তাহা হয় নাই। একখানা বড় চৌকি ও একটা বড় তাকিয়া বেদীর কাজ করিত। ঐ বেদীর উপর একখানি ভাল গালিচা পাতা থাকিত। সামনে একটি বড় টিপায়ের উপর একখানি পিতলের সিংহাসনে শালগ্রাম থাকিতেন, তিনি কথার প্রধান শ্রোতা। উঠানময় গালিচা ও সতরঞ্চ পাতা থাকিত, ব্রাহ্মণেরা গালিচায় বসিতেন। শূদ্রেরা সতরঞ্চে বসিত। ধরণী কথক মহাশয় খুব ভাল কথা কহিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট অথচ গম্ভীর ও উচ্চস্বরে প্রথম হইতেই আসর জমজম করিত। কিন্তু তিনি যখন হাঁ করিয়া গালের কাছে হাত আনিয়া গান ধরিতেন, তখন সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা তখন গানের কি বুঝি? কিন্তু এখনো সে-সুর কানে লাগিয়া আছে। শুনিয়াছি বাড়ি হইতে কিছুদূরে, পুবদিকে, সঞ্জীববাবুর ফুল বাগানে ধরণী কথকের বাসা ছিল। সে ফুলবাগান দেখিবার আমাদের খুবই শখ

ছিল, কিন্তু পাছে সঞ্জীববাবু আমাদের মারেন, সেই ভয়ে কোনদিন সেদিকে যাই নাই। চারি-পাঁচদিন ধরণী কথকের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর একদিন গিয়া শুনিলাম, তাঁহার শরীর বে-এক্তার হইয়া গিয়াছে, তিনি আসিবেন না। তাহার পর আর কোনোদিন তাঁহার কথা শুনিতে যাই নাই। তাঁহার তো আর ঠিক ছিল না, কোন্‌দিন আসিবেন, কোন্‌দিন আসিবেন না।

আঠারশো চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's Character as set forth in ancient Sanskrit writers' একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে, তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও একবৎসরের বেশিই লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর খৃস্টাব্দের প্রথমে আমি বি. এ. পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারসিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন, সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গালার লেপ্টেনান্ট গবর্নর সার রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেইদিন শুনিলাম, রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। সার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক্‌ দিলেন, এবং কতকগুলি বেশ মিষ্টকথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন, এবং গবর্নর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্টকথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেন না একজন গ্রন্থকার হই? তাহার পর ভাবিলাম, এম. এ. ক্লাশ পর্যন্ত তো একরকম স্কলারশিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না; তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা।

অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ, মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ.; আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র "আর্যদর্শনে" আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন, 'তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল "ভিউ" দিয়াছ আমার সঙ্গে তা মেলে না। আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।' আমি বলিলাম, 'আমার তো মহাশয় নিজের কোনো "ভিউ" নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।' যাহা হোক তিনি উহা ছাপাইতে রাজি হইলেন না। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোট গোলদিঘীর ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন। কিন্তু আমি তিনচারি বৎসর কাল তাঁহাদের বাড়ি যাই নাই, বা তাঁহাদের কাহারো সহিত দেখা করি নাই। তিনি সেজন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন, এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাটী যাইতে বলিলেন? আমি তাঁহাদের বাড়ি গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আবার একদিন বলিলেন, 'তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা "বঙ্গদর্শনে" ছাপাইয়া দিতে পারি।' আমি বলিলাম, "আর্যদর্শনে" যাহা লয় নাই "বঙ্গদর্শনে" তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।' তিনি বলিলেন, 'সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটী স্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে পৌছিব।' যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ির দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে, তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়িতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তারের বেড়া ডিঙাইলেই শ্যামাচরণবাবুর

বাড়ির দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ি ঢুকিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোনটি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কে ?' তিনি বলিলেন, 'এটির বাড়ি নৈহাটী, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি. এ. পাস করিয়াছে।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, 'ব্রাহ্মণ ?' রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ।' তখন বঙ্কিমবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নৈহাটী বাড়ি, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি. এ. পাস করিয়াছ, আমাদের এখানে আসনা কেন ?' আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, 'সঞ্জীববাবুর ভয়ে।' তাঁহারা সকলেই তো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন 'আমার ভয় ? কেন ?' 'শুনিয়াছি, কামিনীগাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন ?' হাসির মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নৈহাটী ? তোমার বাবার নাম কি ? আমি বলিলাম, '৺ রামকমল ন্যায়রত্ন মহাশয়।' তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, 'তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকটে আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল। তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক আর দেখা যায় না।'—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, 'হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।' অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'কি কাজ ?' রাজকৃষ্ণ-বাবু বলিলেন, 'ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা "বঙ্গদর্শনে" ছাপাইয়া দিতে হইবে।' বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিয়ানা চালে বলিলেন 'বাঙ্গালা' লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা তো নিশ্চয়ই "নদনদী পর্বত কন্দর" লিখিয়া বসিবে।' আমি বলিলাম, 'আমার রচনার প্রথম পাতেই "নদনদী পর্বত কন্দর" আছে। বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম, এবং বলিলাম, 'প্রথম চারটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষক কে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা। কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ'।

তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'নন্দের ভাই বাঙ্গালা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।' আমি তিনটি পরিচ্ছেদ মাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ি গেলাম। রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে কাঁটালপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বৃদ্ধ ছিলেন। লোকে তাঁহার কথা-বার্তায় ও আচার-ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহার নাম দিয়াছিলেন "রামফক্কড"। নৈহাটী ও কাঁটালপাড়া গ্রামে সকল বাড়িতেই তাঁহার অবারিত দ্বার ছিল। তিনি সব বাড়িতেই যাইতেন, সকলের সঙ্গেই ফক্কুড়ি করিতেন ও ফক্কুড়িই তাঁহার জীবিকা ছিল। বঙ্কিমবাবুর নিকট অনেক আদর যত্ন পাইয়াও আমি মাসাবধি তাঁহার বাড়ি যাই নাই, যাইবার ভরসাও করি নাই। একদিন রামফক্কড় আমায় আসিয়া বলিলেন, 'তুমি বঙ্কিমকে কি দিয়া আসিয়াছ?' আমি বলিলাম, 'একটা লেখা।' তিনি বলিলেন, 'তাই বটে। বঙ্কিম একটা প্রুফ দেখিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'নন্দর ভাইটি বেশ বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছে।' তুমি সেখানে যাও না কেন? বোধহয় গেলে সে খুশি হবে।' রাম বাঁড়ুয্যের কথায় ভরসা পাইয়া আমি আর একদিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমায় দেখিয়াই বলিলেন, 'তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। তুমি এমন বাঙ্গালা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?' আমি বলিলাম, 'আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের চেলা' তিনি বলিলেন, 'ওঃ! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গালা বাহির হইবে না।' সেই মুহূর্ত হইতে বুঝিলাম যে, বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিয়ানা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মতো গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি? তিনি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই।' আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া। কিন্তু বাক্যীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া, এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রী-চরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্‌টাইয়া উল্‌টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এগুলি চলিবে কি?' তাহাতে তিনি উত্তর

করিলেন, 'যাহা ছাপাইয়াছি, সে রূপা, এসব কাঁচা সোনা।' বলিতে কি, সেদিন আমি ভারি খুসি হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈহাটী হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনি-রবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।

কাব্যের উপর বঙ্কিমবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। তিনি কলেজ হইতে বাহির হইয়া ভাটপাড়ার শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ের নিকট রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা পড়িয়াছিলেন। ভাল শাব্দিক হইলেও শিরোমণি মহাশয়ের কাব্য বুঝিবার ক্ষমতা খুব ছিল। আমি তাঁহার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেস অংশ ও জয়কৃষ্ণের সারমঞ্জরী পড়িয়াছিলাম। তাহার পর তিনি আমাকে নৈসধ পড়াইতে আরম্ভ করেন। নৈষধ পড়িতে গিয়া কাব্যাংশই তিনি বুঝাইতে চান, ব্যাকরণ বা দর্শনের দিকে তিনি ফিরিয়াও চান না। সেকালের টোলের পণ্ডিতেরা অলঙ্কার খুব কমই পড়িতেন। যদি বা দুই-একজন পড়িতেন, তাহারা কাব্যপ্রকাশের জগদীশ তর্কালঙ্কারের টীকা পড়িতেন, এবং ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি লইয়াই থাকিতেন। সেকালে লোকে যে সকল ইংরাজি কাব্য পড়িত, সে সকলই বঙ্কিমবাবুর পড়া ছিল। বাঙ্গালায় তিনি কীর্তনের বড় অনুরাগী ছিলেন। একবার শুনিয়াছি, কীর্তনওয়ালাকে পেলা দিতে দিতে তিনি "বঙ্গদর্শনে"র তহবিল খালি করিয়া দিয়াছিলেন। গানের উপর তাঁহার বেশ ঝোঁক ছিল। তিনি কয়েক বৎসর ধরিয়া যদুভট্টের নিকট গান শিখিতেন, একটি হারমোনিয়মও কিনিয়াছিলেন। বসিয়া বসিয়া তিনি তাহা বাজাইতেন, ইহাও দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে দলনী বেগমের ন্যায় গুন্‌গুন্ করিয়া গলা ছাড়িয়া গাহিতে কখনো শুনি নাই। তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখিতেন। বাল্যকালের কবিতাগুলি তিনি একত্র করিয়া ছাপাইয়াও ছিলেন। কিন্তু বয়স হইলে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশি শখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। 'রিনাইসেন্স' (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গালারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গালার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান।

সেই উদ্দেশ্যেই তিনি "বাঙ্গালীর উৎপত্তি" বলিয়া "বঙ্গদর্শনে" সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইতিহাস লিখিতে বসিয়া তাঁহার কিছু জানিবার দরকার হইলে আমায় বলিতেন, আমিও যথাসাধ্য প্রাচীন পুথি ঘাঁটিয়া তাঁহাকে খবর যোগাইয়া দিতাম। এই তিরিশ বছরের মধ্যে বাঙ্গালায় ইতিহাস অনেক পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানেরা বাঙ্গালা দখল করিবার পূর্বে, বাঙ্গালায় যে অনেক বড বড় রাজত্ব ছিল, এখন তাহার অনেক আভাস পাওয়া গিয়াছে। তখন সব অন্ধকার ছিল তথাপি বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশে আর্য ও অনার্যগণের বাস সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তার চেয়ে এখনো কেহ বেশি কিছুই লিখিতে পারেন নাই।

আমার সহিত বঙ্কিমবাবুর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও রজনী ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কমলাকান্তের দপ্তর তখনও শেষ হয় নাই। "বঙ্গদর্শন" তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার "ভারতমহিলা" লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি "বঙ্গদর্শনে"র সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। কেন ছাড়িয়া দেন, অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কোনো খোলসা জবাব পাই নাই। টাকার অভাবে যে উহা ছাড়েন নাই, তা নিশ্চয়; কেন না, "বঙ্গদর্শনে"র গ্রাহকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল, গ্রাহকেরাও "বঙ্গদর্শনে"র টাকা দিতে নারাজ ছিল না। তিনি ছাপাখানার কাজ বেশ বুঝিতেন। তবে সম্পাদকতা ছাড়িলেন কেন, ঠিক বুঝা যায় না। বোধহয় তিনি ঝঞ্ঝাট ভালবাসিতেন না, এবং সঞ্জীববাবুর একটা উপায় হয়, সেটাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। সঞ্জীববাবু খুব রসিক লোক ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেবের সহিত রসিকতা করিতে গিয়া তাঁহার ডেপুটিগিরি যায়।*

* সঞ্জীববাবু তখন প্রোবেশনারি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েকটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তিনি পাকা হইতে পারেন। ১৮৮৪ সালে "ডিষ্ট্রিক্ট টাউন্‌স অ্যাক্ট" পাস হইল। ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ারম্যান এবং জজসাহেব ও অন্যান্য ইংরাজ ও বাঙ্গালী হাকিমেরা কমিশনার হইলেন। সঞ্জীববাবুও একজন কমিশনার হইলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠিল—রাস্তার নাম দিতে হইবে, টিনের উপর নাম লিখিয়া রাস্তায় রাস্তায় দিতে হইবে। সঙ্কল্প হইল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিতে হইবে। জজসাহেব বলিলেন, 'আর ৭৫ টাকা চাই, কারণ, বাংলা নামগুলা কে বুঝিবে? ওগুলা ইংরাজিতে তর্জমা

তখন দিনকতক তিনি সব-রেজিস্ট্রার থাকিলেন, কিন্তু এখানেও তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাই "বঙ্গদর্শন" এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদনায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্যতঃ "বঙ্গদর্শনে"র সর্বময় কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে তো লিখতেনই, অন্যলোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে "বঙ্গদর্শনে" লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, "বঙ্গদর্শন" এখনো তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন "বঙ্গদর্শনে," নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনো নাম সহি করি নাই। সেইজন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন "বঙ্গদর্শন" বাহির হইবার প্রায় বছর খানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি। আমি যেদিন যাই, সেইদিন সকালে করিয়া দিতে হইবে। বৌমার গলি বলিলে কেহই চিনিবে না। D ughter-in-laws L ne বলিতে হইবে।' জজসাহেবের কথায় কেহই আস্থা করিতেছে না, অথচ তিনি বার বার সেই কথাই বলিতেছেন। তখন সঞ্জীববাবু বলিয়া উঠিলেন, '৭৫৲ টাকায় হইবে না। আমি প্রস্তাব করি আরো ৩০০ টাকা দেওয়া দরকার।' জজসাহেব উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কেন?' সঞ্জীববাবু বলিলেন, 'আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই ইংরাজিতে তর্জমা করিতে হইবে। মনে করুন, কালীপদ মিত্র বলিয়া একজন হাকিম আছেন। কালীপদ মিত্র বলিলে কে বুঝিবে? উহাকে Black footed friend বলিয়া তর্জমা করিতে হইবে; সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। জজসাহেবের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি টুপি লইয়া কমিটি হইতে উঠিয়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, 'সঞ্জীব ভাল কাজ করিলে না। বাড়ি গিয়া উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া আইস।' সঞ্জীববাবু তিনদিন গেলেন, জজসাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইলেন, সাহেব দেখা করিলেন না। সপ্তাহখানেক পরে খবর আসিল, জজসাহেব সেক্রেটারি হইয়া গেলেন। সঞ্জীববাবু তিন-চারিবার পরীক্ষা দিলেন, কিছুতেই পাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার নাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হইল। জজসাহেবের সেক্রেটারি হওয়ার সঙ্গে সঞ্জীববাবুর পাস করিতে না পারিবার কার্যকারণ ভাব সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু সঞ্জীববাবু মনে করিতেন আছে।

বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি ভিজ্ঞা বাঁধান একখানি "কৃষ্ণকান্তের উইল" আনিয়া আমাকে দিলেন, 'রেলগাড়িতে এইখানি পড়িও, ছাপাখানা হইতে এইখানি প্রথম বাহির হইল।' আমি অনেক বৎসর ধরিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই আমার বাড়িতে নাই। বৌঠাকুরানীরা অনেকগুলি সখীদের দিয়াছেন, এখন পুত্রেরা বড় লইয়া কতকগুলি আপন বন্ধুদের দিয়াছেন। আমার এত যত্নের জিনিস একখানিও বাড়িতে নাই।

লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি, বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই। শুনিলাম, তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন। শিবের মন্দিরের পাশে সে ঘরগুলিতে চাবি বন্ধ। বাগানটি গতপ্রায়। সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়া গেলাম, দেখিলাম চুঁচুড়ায় ঘোড়াঘাটের উপর দুইটি বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন, একটিতে তাঁহার অন্দরমহল, আর-একটিতে তিনি নিজে বসেন। যেটিতে তিনি বসেন, সেটি একতালা। বাড়িটির একটি গেট আছে। যে ঘরটিতে তিনি বসেন, তাহা একটি বড় হল, গঙ্গার দিকে চারিটি জানালা। সে ঘরের পূর্বের দেওয়ালটি গুটিকতক বড় বড় মোটা গোল থামের উপর, বর্ষাকালে তার নীচেও জল আসে। বঙ্কিমবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেদিন তার নীচে খুবই জল ছিল। এক বৎসরের পর হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি তো চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতর কি কিছু "কৃষ্ণকান্তী" ?' তিনি বলিলেন, 'তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমি বড় খুশি হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশি কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লক্ষ্ণৌ হইতে আমি "বঙ্গদর্শনে"র জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি ?' তিনি বলিলেন, 'তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোনো জার্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।' আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি"- অর্থাৎ তিনজন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে। এবং এই তিনজন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের "চরিত্র গঠন করে"—সেই তিনজন কবি—বাইরন, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্র

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

আমার বাড়ি নৈহাটী। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি হতে পোরাটেক পথ তফাতে। তাঁহার পিতার কি নাম ছিল, লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে রায় বাহাদুর বলিয়াই জানিত। রায় বাহাদুর দেশের একজন বড় লোক ছিলেন। তাঁহার বাড়িতে রাধাবল্লভ বিগ্রহ ছিলেন। রাধাবল্লভের রথ হইত, দোল হইত, বারমাসে তের পর্ব হইত। রাধাবল্লভের মন্দির ছিল, গুণ্ডিচা-ঘর ছিল, একখানি বড় আটচালা ছিল, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা ছিল, সেখানে রথ-দোলে মেলা বসিত। রায় বাহাদুরের বাড়িতে মাঝে মাঝে কথকতা হইত। এগার বৎসর বয়সে, যখন আমি কাঁটালপাড়ায় টোলে পড়ি, তখন একবার ধরণী কথকের কথা হয়। তখন আমি ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত প্রায়ই কথা শুনিতে আসিতাম। কথকতার আসরে বঙ্কিমবাবুরা চারি ভায়েই থাকিতেন। আর-কিছু বুঝিতে পারি আর না-পারি, কথাটা যে বেশ জমিত, তা বেশ মনে হয়। কথক মহাশয় গান করিবার জন্য "হাঁ" করিলেই সমস্ত আসর নিস্তব্ধ হইয়া যাইত। মাঝে মাঝে লোকে "বাহবা বাহবা" "বেশ বেশ" বলিতে থাকিত। সুতরাং এই সময় হইতেই আমি বঙ্কিমবাবুদের চারি ভাইকেই চিনিতাম; এবং তাঁহাদের বাড়ির খবরও অনেক শুনিতে পাইতাম। আমাকে কিন্তু তাঁহারা চিনিতেন না।

১৮৭৬ সালে, যখন আমি এম. এ. পড়ি, তখন তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপ হয়। সেই সময় হইতেই ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে, যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দেহত্যাগ হয়, তখন পর্যন্ত সর্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতে চেষ্টা করিতাম। ১৮৭৬ সালে একটি বড় প্রবন্ধ লইয়া তাঁহার নিকটে যাই। তখন তাঁহার চতুর্থ সালের "বঙ্গদর্শন" নয় মাস বাহির হয় নাই। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র,—তিন মাসের প্রবন্ধের অভাব। আমার প্রবন্ধ সে অভাব পূরণ করিয়া দিল। এবং বঙ্কিমবাবু আমার প্রবন্ধ পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এক বৎসর "বঙ্গদর্শন" আর বাহির হইল না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিকটে যাতায়াত বন্ধ রহিল না। আমি শনিবারে বাড়ি আসিলেই, এইখানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। তিনি তখন হুগলির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়ি হইতেই যাতায়াত করিতেন। আমরা রাত্রি সাড়ে-নয়টা পর্যন্ত ইতিহাস, সাহিত্য,

পদ্য, গদ্য, নাটক, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি—এই সকল লইয়া আলোচনা করিতাম। কয়েকটি লোক ছিলেন, আমি আসিলেই তাঁহারা উঠিয়া যাইতেন, বলিতেন, 'এইবার কেতাবী-কথা আরম্ভ হইবে, আমরা আর বসিয়া কি করিব ?' সাড়ে-নয়টার সময় বঙ্কিমবাবু তাঁর চাকরকে ডাকিয়া আমায় বাড়ি রাখিয়া আসিতে হুকুম দিয়া অন্দরে যাইতেন। অন্দরের খুব কড়া শাসন ছিল, সাড়ে-নয়টার পর তিনি এক মিনিটও বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। দুই পাঁচ মিনিট যদি কখনো তাঁহার দেরি হইত, অমনি চাকরানী আসিত।

বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে কায়া বদল করিয়া "বঙ্গদর্শন" আবার বাহির হইলেন। এবার সম্পাদক হইলেন তাঁহার মেজদাদা, সঞ্জীববাবু। কিন্তু লেখার ভার, অনেকটা তাঁহার উপরেই রহিল। তিনি আমাকে লিখিতে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক-একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্য কখনো প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল হাত-পাকাইব, আর এক ইচ্ছা—বঙ্কিমবাবুকে খুশি করিব। তিনি যদি কখনো কোনো প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম। অপ্রশংসা করা বা গালি দেওয়া, কখনো তিনি করেন নাই। যেবার কিছু বলিতেন না, বুঝিতাম, লেখাটা ভাল হয় নাই। সেবার চেষ্টা করিয়া জেরা করিয়া প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিতাম।

দুই বৎসর এরূপ গেলে, আমায় এক বৎসরের জন্য লক্ষ্ণৌ যাইতে হইল। সেখান হইতেও আমি লেখা পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর মতামত কিছুই শুনিতে পাইতাম না। তিনি আমাকে চিঠিপত্র দিতেন না, আমিও তাঁহাকে বড়-একটা চিঠিপত্র দিতাম না। এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বঙ্কিমবাবু চুঁচুড়ার যোড়াঘাটের উপর বাসা করিয়াছেন। "বঙ্গদর্শন" বাহির হইতেছে, কিন্তু মাসে মাসে বাহির হয় না, অনেক বাকী পড়িতে লাগিল। আবার এক বৎসর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহার পর-বৎসর হইতে আবার বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্কিমবাবু চুঁচুড়া ছাড়িলেন; বৌ-বাজারে "বিড়ালের বিয়ের বাড়ি" ভাড়া লইয়া মাস দুই রহিলেন। তাঁহার দৌহিত্র দিব্যেন্দুর অসুখই তাঁহার চুঁচুড়া ছাড়ার প্রধান কারণ। এই বাড়িতে ডক্টর চন্দ্রার চিকিৎসায় তাঁহার দৌহিত্রটি আরাম হইল। ডাক্তার চন্দ্রা কেবল বলিয়া গেলেন, বালকটির যে পরিমাণ আহারের দরকার, তাহা সে পায় না।

তিনি তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন, ঔষধপত্র বড একটা কিছু দিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রাব চিকিৎসাব ও চন্দ্রাব স্বভাবেব বডই সুখ্যাতি করিতেন। এখান হইতে তিনি ফকিবচাঁদ মিত্রের লেনে যান। তথা হইতে ৯২ নং বৌ-বাজার স্ট্রীটে আসেন। এই সময় "বঙ্গদর্শন" প্রেসও কাঁটালপাড়া হইতে কলিকাতায় উঠিযা আসে। ৯২ নং বৌ বাজাব হইতে তিনি ভবানীচবণ দত্তের লেনে যান, সেখানে থাকিতে থাকিতেই প্রতাপ চাটুর্য্যেব লেনে এক বাডি খবিদ কবিয়া কলিকাতায় কায়েম-মোকাম হন। এই দীর্ঘকাল আমি সর্বদাই তাঁহাব কাছে যাইতাম, বৈকালে অথবা সন্ধ্যাব পব তাঁহাব কাছে উপস্থিত হইতাম, এবং বাত্রি সাডেনয়টা পর্যন্ত থাকিযা বাডি চলিয়া আসিতাম। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যত দিন জীবিত ছিলেন, প্রাযই ঐখানে আসিতেন, চন্দ্রনাথ বসু আসিতেন, সব্‌জজ বলবাম মল্লিক আসিতেন, বৌ-বাজাবের বলাই দে আসিতেন। সময়ে সময়ে কবি হেমবাবু আসিতেন। মফঃস্বল হইতে অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে আসিতেন— তাঁহাদেব মধ্যে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয একজন। কেহ দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপ আপ্যায়িত কবিতে চেষ্টা কবিতেন। তাহাতে অনেকেই তাঁহার উপব আকৃষ্ট হইয়া পডিত।

বঙ্কিমবাবুব নিকট কেহ আসিলে, সাহিত্য ভিন্ন অন্য কোনো কথাবার্তা বড একটা হইত না। লেখাপডা জানা লোকের তিনি খুব সম্মান করিতেন। এবং তাঁহাকে আত্মীয কবিয়া লইবার চেষ্টা কবিতেন। তিনি বেশ সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহাব চক্ষুতে এক অসাধারণ দীপ্তি ছিল। নাকটি শ্যেন পক্ষীর মতো না হইলেও বেশ দীর্ঘ ও সুদৃশ্য ছিল, গাল দুটি ভারি ভারি ছিল, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্যের কোনো হানি হইত না। চেহারাটা মানুষের একটা আকর্ষণ বটে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু নিজেই বলিয়াছেন, সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। সে জয় যে তাঁহার হয় নাই, একথা কেহ বলিতে পারিবে না। কিন্তু সে জয় তো যত দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, যত দিন সে সৌন্দর্য লোকে দেখিতে পায়। জয়েব সে কারণ, মরিলেই ফুরাইয়াযায়। বঙ্কিমচন্দ্রেব জয়লাভের কারণ আরও আছে, সে অন্যরূপ। তিনি সুন্দরজিনিস বাছিয়া লইতে পারিতেন, তাহাদিগকে সাজাইয়া আরও সুন্দর করিতেন। যেখানে লোকে সৌন্দর্য দেখে না, তাহার মধ্যেও তিনি সৌন্দর্য দেখিতে ও দেখাইতে পারিতেন। অসুন্দরকে তিনি একেবারে বর্জন করিতেন। এই মনে কর, কপালকুণ্ডলায় ঐ যে সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়ি আছে—কেবল বালির ঢিবি—বালিতে চারিদিক ধু ধু কবিতেছে—রোদে সেই বালি তাতিয়া

পথিককে ঝলসাইয়া দিতেছে—এই ভীষণ বালিয়াড়ি যে সুন্দর হইতে পারে, কে বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতেই কত সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, চোখ যেন সেখান হইতে ফিরিতে চাহে না।

বঙ্কিমের একজন ভক্ত ১২৮৫ সালে বলিয়াছেন, 'বঙ্কিমবাবুর স্বভাব-শোভার কেন্দ্র মনুষ্য। নগেন্দ্রনাথই হউন, অমরনাথই হউন, আর গোবিন্দলালই হউন, বা স্বয়ং বঙ্কিমবাবুই হউন, তাঁহারও নির্লিপ্ত দেখা—যেন সাংখ্যমতে পুরুষ নির্লিপ্তভাবে বসিয়া প্রকৃতির রঙ্গ দেখিতেছেন। বঙ্কিমবাবু স্বভাবের শোভার মধ্যে বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতেছেন, আর কাছে যে থাকে, তাহাকে দেখাইতেছেন।—'দেখ কেমন সুন্দর, দেখ কেমন গম্ভীর। স্বভাবের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরের প্রেমে তোমার শরীর পুলকিত হউক।'

এইরূপ সুন্দর মানুষ লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সুন্দর সমাজ গড়িয়াছেন, সে বিষয় ভক্তটি বলিয়াছেন—

'বঙ্কিমবাবুর সমাজ শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকদিগের সমাজ। তিনি দেখাইছেন, সমাজের বিরোধী কোনো কাজ করিয়া কেহ কখনো সুখী হইতে পারে না এবং করিলেই আত্মদুষ্কৃতের জন্য সকলকে অনুতাপ করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথের অবৈধ প্রণয় জনিত বিধবা-বিবাহের ফল তাহার ঘোর আধ্যাত্মিক বিকার। শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগের ফল পর্বতগুহায় প্রায়শ্চিত্ত। গোবিন্দলাল ও রোহিণীর যেরূপ অন্ত হইল, তাহাও ঐ কথা দৃঢ়তররূপে প্রতিপন্ন করিতেছে।'

আর এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

'বঙ্কিমবাবুর লোক সব সমাজের লোক—শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবক, শিক্ষিত যুবকের জীবন অনন্ত-বিবাদ-সঙ্কুল। তিনি দুই প্রকার শিক্ষা পান। এক প্রকার বাড়িতে, এক প্রকার স্কুলে। উভয় প্রকার শিক্ষা সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিরোধী। এই জন্য শিক্ষিত যুবকের চরিত্রে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর পাত্রগুলিতেও এই বিরোধিভাব কতক কতক প্রকটিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে। যেখানে আছে, সেখানে অতি মনোহর। বঙ্কিমবাবুর মানুষগুলি দেশি বাঙ্গালী নিরীহ ভাল মানুষ। বাঙ্গালীরা যে স্বভাব ভালবাসে, তাহারা সকলেই সেই স্বভাবের লোক—বুদ্ধিমান, চতুর, দয়ালু, সামাজিক ও গুণগ্রাহী। তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব গভীর। ঐরূপ লোকের হৃদয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সন্ধান অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। তাহা হইতে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হয়। বঙ্কিমবাবু ইহাদের সেইভাবেই দেখাইয়াছেন।'

বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি হইতে আমরা এখনকার সমাজে কোথায় কি জিনিস সুন্দর আছে, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছি। হীরার ঘরে আলপোনাটি হতে আরম্ভ করিয়া নগেন্দ্রনাথের বৈঠকখানার পেটিং পর্যন্ত সব জায়গায়ই তাঁহার চক্ষু গিয়াছিল, এবং আমাদেরও চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। আচ্ছা, সুন্দর—সুন্দর—সব সুন্দর। বঙ্কিমবাবু সব সুন্দর দেখিয়াছেন, আমরা সব সুন্দর দেখিয়াছি। কোন্ জিনিসটি সুন্দর—তাহা বিচার করিতে শিখিয়াছি, কোন্ জিনিসটির কতটুকু সুন্দর—তাহারও বিচার করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু ইহার ফল কি? ইহার ফল এই যে, সুন্দর দেখিলেই তাহাতে লোক আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার দিকে একটা প্রবল টান হয়, তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। তাহাকে আপনার করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। যদি এই ফল না হয়, তাহা হইলে সৌন্দর্য অনুভব করিযা আর কি হইল? বঙ্কিমবাবু আমাদের দেশের সৌন্দর্য সব ফুটাইয়া দিয়া আমাদিগকে দেশ ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর পূর্বে ইংরাজিওয়ালারা পড়িতেন সেক্সপীয়র, পড়িতেন মিল্টন, পড়িতেন বায়রন, পড়িতেন শেলি, দেখিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য, ভালবাসিতেন ইংলণ্ডের সৌন্দর্য—সে সৌন্দর্য চোখে দেখিতে পাইতেন না, কল্পনায় তাহাকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিত। দেশে যে কবিরা তাঁহাদিগকে সৌন্দর্য দেখাইতে চেষ্টা করিতেন, সে কবিদের তাঁহাদের পছন্দই হইত না। কবিবেচারারা মাঠে মারা যাইত। বঙ্কিমবাবু ইংরাজি-ওয়ালাদের চোখ ফিরাইয়া দিলেন। সারথি যেমন লাগাম টানিয়া ঘোড়ার চোখ ফিরাইয়া তাহাকে অন্যপথে লইয়া যায়, তেমনই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি-ওয়ালাদের চোখ ফিরাইয়া দিয়া অন্য পথে চালাইয়া দিলেন। সে পথ আর কিছু নয়, দেশপ্রীতি।

বঙ্কিমবাবু কি প্রথম হইতেই এই মতলবে বই লিখিতে আরম্ভ করেন? না, ইহা তাঁহার বহু বর্ষব্যাপী চিন্তার ফল? আমার বোধহয়, অনেক বৎসর পরিশ্রম করিয়া তবে তিনি স্বদেশতত্ত্ব পাইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি সৌন্দর্যই সৃষ্টি করিতেন। কিসে পাত্রগুলির চরিত্র ফুটিয়া উঠে, অনেকগুলি পাত্রকে কি ভাবে সাজাইলে নভেলখানি জমে, কিরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে তাহা লোকের প্রিয় হয়, কোন্ রীতিতে লিখিলে লোকের পড়িতে ভাল লাগে, কোন্, কোন্, জিনিস বর্ণনা করিলে নভেলখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়—প্রথম প্রথম এইগুলিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সুন্দর—সুন্দর—সুন্দর—কিসে সুন্দর হয়? জমাট—জমাট—জমাট—কিসে জমাট বাঁধে? এই তাঁহার ধ্যান

ছিল, এই তাঁহার জ্ঞান ছিল, এই তাঁহার তন্ত্র ছিল, এই তাঁহার মন্ত্র ছিল। ক্রমে যত বয়স বাড়িতে লাগিল, বুদ্ধি পাকিতে লাগিল, দৃষ্টি দূর হইতে দূরান্তরে যাইতে লাগিল, বিজ্ঞতা ঘোরাল হইয়া আসিতে লাগিল, লোককে শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা তত বাড়িতে লাগিল। তখন তিনি "বঙ্গদর্শন" বাহির করিলেন। "বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য কি? "Knowledge filtered down" করিতে হইবে—অর্থাৎ জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। "বঙ্গদর্শন" জ্ঞানবিস্তার সম্বন্ধে বাঙ্গালায় যে কি করিয়াছে, তাহা এখানকার লোকে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তখনকার লোকের কাছে "বঙ্গদর্শন" একটি অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া মনে হইত। জ্ঞান-প্রচারের জন্য "বঙ্গদর্শনে"র পূর্বে অনেক মাসিকপত্র, অনেক সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছিল। কিন্তু কেহই "Knowledge filtered down" করিতে পারেন নাই। সরল ভাষায়, সরল রীতিতে দর্শন-বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সকল সাধারণের সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম ধরিয়াছিলেন। "বঙ্গদর্শনে"র উপকারিতা সম্বন্ধে আমার বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই। বঙ্কিমবাবু সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন, এখন আবার লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার সৌন্দর্য-সৃষ্টি লোকশিক্ষার দাসী হইল, প্রথম পক্ষের স্ত্রী, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দাসী হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুও দাস হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না,—অথচ তাঁহার একটি ঘোর পরিবর্তন হইয়া গেল। কিন্তু তিনি শিক্ষা দিবেন কি? তাঁহার ভক্ত বলিয়াছেন—

'রমানন্দ স্বামী যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার নাম পরহিত ব্রত। পীড়িত যে ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, তিনি তাহার উপকার করিবার জন্য সর্বদাই উদ্যুক্ত। তিনি নিজ জীবন পরের উপকারের জন্য তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে কাতর হন না। নৈতিক উন্নতির রমানন্দ স্বামীই বোধহয় পরাকাষ্ঠা। এই যে পরহিতব্রত—প্রথম প্রথম "বঙ্গদর্শনে"র নভেলে বঙ্কিমবাবু ইহারই প্রচার করিয়াছিলেন—যথা বিষবৃক্ষে, চন্দ্রশেখরে।'

কিন্তু ইহাতে তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন-পরহিত বা ভূতদয়া বড় ফিকা, জমে না। বুদ্ধদেব ভূতদয়া প্রচার করিয়াছিলেন, বেশি দিন টিকে নাই। ইউরোপে অনেকে পরহিত প্রচার করিয়াছিলেন। ফল ভাল হয় নাই; তাই তিনি "বঙ্গদর্শন" ছাড়িয়া, যথেষ্ট বহুদর্শিতা লাভ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টি কিছু সঙ্কোচ করিয়া লইলেন—পরহিতের বদলে দেশহিত আশ্রয় করিলেন। এতদিন তিনি দেশের সৌন্দর্যমাত্র দেখাইতেছিলেন, এখন সেই পুঞ্জীকৃত, রাশিকৃত সৌন্দর্যের এক মাত্রের

আধার বঙ্গদেশকে ভালবাসিতে শিখাইতে লাগিলেন, ভালবাসিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন, জন্মভূমিকে মা বলিতে শিখাইলেন, হিন্দুর যত দেব-দেবী আছেন, সবই এক মায়েব প্রতিমূর্তি—এই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সকলকে বলিতে লাগিলেন, একবার প্রাণভরে বল—'বন্দে মা•বম্।'

ইহার পর বঙ্কিমবাবু যতগুলি নভেল লিখিয়াছেন, দেশভক্তিই তাহাদেব মূলমন্ত্র। আব সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্মেব প্রচারও ছিল। কিন্তু যে হিন্দুধর্ম তাঁহাব নিজেব মনেব মতো তিনি নিজে ভগবদ্গীতার টীকা কবিয়া সেইমতো হিন্দুধর্ম চালাইতে গেলেন। এই সময়ে শশধব তর্কচূড়ামণিব সঙ্গে তাঁহাব বিবাদ বাধিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, খাওয়ার বাঁধাবাধি বা ছোঁয়াব বাঁধাবাধি লইয়া ধর্ম নয়। ধর্ম আব এক জিনিস। তাঁহার ধর্ম যে কি ছিল, তাহাব কতক আভাস তাঁহাব কৃষ্ণচবিত্রে ও অনুশীলনে পাওয়া যায়। একটা পূর্ণ ধর্মেব পথ তিনি দেখাইবেন বলিয়া আশা কবিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না, মৃত্যু অকালে তাঁহাকে গ্রাস কবিল। বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু কবিয়াছেন, ইচ্ছায় করুন বা অনিচ্ছায় করুন, জানিয়া করুন বা না জানিয়া করুন—সব গিয়া একপথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমিব উপাসনা—জন্মভূমিকে মা-বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য কবিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষেব আর কেহ কবে নাই। সুতবাং তিনি আমাদেব পূজ্য, তিনি আমাদের নমস্য, তিনি আমাদেব আচার্য তিনি আমাদেব ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'।

যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে বাজী হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য, পরম সৌন্দর্য, অথবা সৌন্দর্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম তাহাই পরম ধর্ম। সুতবাং সৌন্দর্যসৃষ্টিব সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটো জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতো হিন্দুধর্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে over rule করিলেন। আমিও দেখিলাম, হয় তো দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিলে বঙ্কিমবাবুর কথাই সত্য হইতে পারে। তিনি আপনার মতেই তিন-চারখানি নভেল লিখিয়া ফেলিলেন। শুদ্ধ সৌন্দর্যবাদীরা

তাহাতে এক একবার নাক সিটকাইলেও দেশসুদ্ধ লোকেই তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ও করিবে। তিনি এ বিষয়ে লইয়া কাহারও সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। আরও অনেক বিষয়ে তিনি বিচার করিতে রাজী হইতেন না। যে দিন তাঁহার দরবারে বসিয়া সর্বপ্রথম 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিলাম, গানটি কাহারও মনে ধরিল না। একজন বলিলেন, 'অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে'— 'শস্যশ্যামলাং শ্রুতিকটু নয় তো কি?' 'দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে' 'ইহাকে কেহই শ্রুতিমধুর বলিবেন না।' একজন বলিলেন, 'কে বলে মা তুমি অবলে' 'অবলের একার ব্যাকরণ, না কিছু।' বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাগুলি একঘণ্টা ধরিয়া ধীরভাবে শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, 'আমার ভাল লেগেছে, তাই লিখেছি। তোমাদের ইচ্ছা হয় পড না হয় ফেলে দাও, না হয় পড়ো না।' শ্রুতিকটু দোষ, ব্যাকরণ দোষ থাকিলেও 'বন্দেমাতরম্' সমস্ত ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্কিমেরই জয় হইয়াছে। আমরাও এস, প্রাণ ভরিয়া বলি, 'বন্দেমাতরম্'।

যাঁহারা সর্বদা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে কিভাবে দেখিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। তাঁহাকে গুরু বলা যায় না, কারণ তিনি উপদেশ দিতেন না। তাঁহাকে সখা বলিবেন, সে স্পর্ধা কেহ রাখিতেন না, অথচ সকলেই তাঁহাকে ভক্তি কবিত, ভালবাসিত, তাঁহার মুখে একটি ভাল কথা শুনিলে কৃতার্থ হইয়া যাইত। কেহ কিছু লিখিলে যতক্ষণ বঙ্কিম না ভাল বলেন, ততক্ষণ সে লেখা লেখাই নয়। সে একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ। যে সে আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়াছে, সেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, অন্যের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই। সাহিত্য ভিন্ন অন্য চর্চা তাঁহার বাটীতে, অন্ততঃ দরবারে হইতে পারিত না। আর সে চর্চার মধ্যে তিনিই সর্বময় কর্তা। যাহা তিনি বলিতেন মানিয়া লইতে হইত, অথচ তাহাতে মান-অপমানের কিছু ছিল না। চব্বিশ বৎসর হইল তিনি স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তিনি যে দেশকে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন, সে দেশ এখন স্বদেশ প্রীতিতে মাতিয়া উঠিয়াছে, এবং তাঁহার স্মৃতিতে ভরিয়া গিয়াছে। আর এই যে গৃহ, যেখানে বসিয়া তাঁহার "বঙ্গদর্শনে"র অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, যেখান হইতে বিষবৃক্ষ তাহার অমৃতময় ফল সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে, যেখান হইতে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দেশকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, যেখান হইতে কোকিলের কুহুস্বর রোহিণীকে উন্মাদিনী করিয়া দেশসুদ্ধ উন্মাদ করিয়াছে, সেই সুরম্য স্মরণীয় গৃহে বঙ্কিমবাবুর স্মৃতির

কোনো চিহ্নই নাই। আমাদের পরম কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় পবিত্র দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটী আসিয়া বঙ্গবাসীর প্রধান তীর্থ বঙ্কিমে বৈঠকখানায় উপস্থিত হন, এবং নিজব্যয়ে এই সুন্দর মারবেল টেব-লেটখানি লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমরা সকলেই তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি এই কার্য করিয়া যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু যে শুদ্ধ যাহাবা তাঁহার কাছে থাকিত, তাহাদের আকর্ষণ করিতে পারিতেন, এমন নয়, যাহারা দেশতঃ ও কালতঃ তাঁহা হইতে অনেক দূরে, তাহাদিগকেও তিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাইলাম। আসুন, আমরা মণ্ডলী হইতে বলি 'পদ্মনাথবাবুর জয় হউক।'

আর যিনি দেবতার তুল্য স্বামী পাইয়াও তাহাতে বঞ্চিত হইয়া এই চব্বিশ বৎসর ধরিয়া পরলোকে স্বামীর মঙ্গলের জন্য নানাব্রত অনুষ্ঠান করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন, তিনি এই বৈঠকখানাটি উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিয়া স্বামীর এই চিহ্নটি বজায় রাখিলেন, এবং যিনি এইস্থানে উপস্থিত থাকিয়া আপন সন্তানমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করিতেছেন, আইস, আমরা সকলে তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

বঙ্কিমবাবুর স্মৃতি চিরকাল জাগরুক থাকুক, এবং তাঁহাব গ্রন্থগুলি বঙ্গবাসীব হৃদয় ও মন পবিত্র করিতে থাকুক।

বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ

প্রথম প্রস্তাব

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

১৮৭৯।৮০ খৃস্টাব্দের বর্ষাকালে চুঁচুড়ায় প্রথম বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মনে পড়িতেছে, সে দিন রথযাত্রা এবং আমার সহযাত্রী অতুলবাবুতে আর আমাতে ট্রেন ফেইল করিয়া অনেকক্ষণ হাওড়ার স্টেশনে বসিয়াছিলাম। মিস্টার অতুলচন্দ্র রায় তারপর যুরোপ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন—নানা দেশ দর্শন এবং বিস্তর প্রতিভাশালী ব্যক্তির সাহচর্য করিয়া সম্ভবতঃ তিনি সেদিনকার বর্ষাধৌত প্রভাতটিকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমার জীবনে সে একটা নবযুগ। সাহিত্যচর্চার সেই নবীন উৎসাহের সময় আপনা হইতে বঙ্কিমবাবু আমায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্য-গর্বের একটা আনন্দহিন্দোল আমার শরীর মন অভিষিক্ত করিতেছিল।

চুঁচুড়ার যোড়াঘাটে আমাদের গাড়ি যখন পৌঁছিল, বঙ্কিমবাবু তখন অফিসের পোশাক আঁটিয়া বাহির হইয়াছেন—এগারটা বাজিতে বেশি দেরি নাই। বলিলেন, চিঠি পাইয়া প্রাতঃকালে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যা হোক অফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে কথাবার্তা হইবে। সেই প্রথম দর্শনে তাঁহার সৌম্যমূর্তিতে প্রতিভার যে জ্যোতিঃ দেখিয়াছিলাম, আর কখনো সেরূপ দেখিয়াছি, মনে হয় না।

প্রায় তিনটার সময় আবার দেখা হইল। ইজিচেয়ারে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ধূমপান করিতেছিলেন—আলবোলার সাজসজ্জা এবং কুণ্ডলীকৃত দীর্ঘনল দেখিয়া আমার "বিষবৃক্ষে"র হুঁকার স্তব মনে পড়িতেছিল। তখন ডায়েরি লিখিতাম না—কথাবার্তা যাহা হইয়াছিল, তাহার সারাংশ মাত্র মনে আছে। কথায় কথায় বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এখন আর ইংরেজিতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি না—ইংরেজি ভাষাটা ভারি insincere বলিয়া আমার মনে হয়।' আমায় বিশেষ করিয়া বলিলেন, "মাসিক সমালোচকে" আপনার একটা প্রবন্ধ পড়িয়া এর আগে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথা বেশি করিয়া বলায়, লিখিতে পারি নাই।' প্রবন্ধটিতে আমি বলিয়াছিলাম, 'ইদানীন্তন কালে বঙ্কিমবাবু দেশের সর্বপ্রধান সংস্কারক, তাঁহার সৃষ্ট সৌন্দর্যে এবং তৎকৃত সমালোচনায় বঙ্গসমাজের যে মানসিক

এবং নৈতিক উন্নতি হইয়াছে, আর কিছুতে ততটা নহে।' কথা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, এখনকার ছেলেরা দেখিতে পাই, গুরুজনদিগকে আগেকার মতো প্রণাম করে না। নিজের বাড়ির রথ দেখিবার জন্য তাঁহার অপরাহ্ণে কাঁটালপাড়ায় যাওয়ার কথা, অতএব আমরা বিদায় হইলাম। প্রথমে আসিয়া আমি বঙ্কিমবাবুকে নমস্কার করিয়াছিলাম, নব্য যুবকদের প্রতি তাঁহার মন্তব্য শুনিয়া উঠিবার সময় সলজ্জভাবে প্রণাম করিলাম। তিনি হাসিলেন। জামাতা রাখালবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শ্রীশবাবুকে আর বেহাইকে জল খাওয়াও।' এই সময়ে বাবু চন্দ্রশেখর কর আসিয়া পৌঁছিলেন—বঙ্কিমবাবুর কাঁটালপাড়ায় যাওয়া হইল না।

ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতায় প্রায় দুই বৎসর পরে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁর বাসা বৌ-বাজারে। আমি প্রিয় সুহৃৎ বাবু নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যাইতাম। "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন গিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু কথায় কথায় বলিলেন, 'কই চন্দ্র তুমি বাঙ্গালা লেখা ছাড়িলে, বাঙ্গালা যে আর পড়িতে ইচ্ছা করে না।' "রাজসিংহ" তাহার কিছুদিন আগে "বঙ্গদর্শনে" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রশেখরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ করা হইতেছে না কেন? বঙ্কিমবাবু তাঁর কোনো বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন, 'এঁরা বলেন আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মানিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।' বলিলেন, 'কুন্দনন্দিনীর' বিষ খাওয়াটা যে নীতিবিরুদ্ধ, তাহা আমি স্বীকার করি।' চন্দ্রশেখরবাবুতে এবং আমাতে একযোগে বলিলাম, 'মানিকলালের মতো দুই-একটা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।' এই কথায় বঙ্কিমবাবু কি ভাবিয়াছিলেন, বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার অল্পদিন পরে "রাজসিংহে"র প্রথম সংস্করণ বাহির হইল। আর একদিন চন্দ্রশেখরবাবুর সঙ্গে আমিও উপস্থিত ছিলাম। শ্রদ্ধেয় বাবু চন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে চন্দ্রশেখরবাবুর তখনও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। বঙ্কিমবাবু চন্দ্রনাথবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওঁকে চেন না? "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম।" মনে হইতেছে, এইদিন সন্ধ্যার পর বহরমপুর হইতে বঙ্কিমবাবুর একটি প্রাচীন বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সে মিলনের আনন্দ এবং হাস্য এখনো আমার মনে জাগিতেছে। বন্ধুর সঙ্গে তাঁর পুত্রকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় পড়?'

উঃ—Fourth year, Presidency College.

বঙ্কিমবাবু—রাখালের সঙ্গে আলাপ নেই ?

উঃ—না।

বঙ্কিমবাবু—সে কি হে—এক ক্লাশে পড়, আলাপ নেই ?

সঞ্জীববাবু বলিলেন, 'তা জান না বুঝি ? এখনকার ছেলেদের ভেতর নাম জিজ্ঞাসা যে একটা ঘোর বেয়াদবী। ওর একটা গল্প আছে। এক নব্য শিক্ষিতের সঙ্গে একজন সেকেলে লোকের এক কুস্থানে দেখা হয়। বৃদ্ধ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন যে, তাঁর নামটি কি ? নব্যবাবু কষ্টে নাম বলিলেন। বৃদ্ধের কুবুদ্ধি, আবার প্রশ্ন, 'মহাশয়ের পিতার নাম ?' বাবুটি চটে লাল, বুড়োকে মারেন আর কি। ব্যাপার গুরুতর দাঁড়ায় দেখিয়া বাড়ির অধিকারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া নব্যবাবুটিতে সুধাইল, 'বাবু, বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ছেলেরাই চটিবে, আপনাদের রাগ কেন ?' ভারি হাসি পড়িয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি, অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, নবীনবাবু প্রভৃতি। নবীনবাবু কথায় কথায় "আনন্দমঠে"র সুপরিচিত "বন্দে মাতম্" সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, এমন ভাল জিনিসটিকে আধ সংস্কৃত আধ বাঙ্গালায় লিখিয়া মাটি করা হইয়াছে, এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মতো। লোকের ভাল লাগে না। বঙ্কিমবাবু ঈষৎ কুপিতস্বরে বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, ভাল না লাগে, পড়ো না। আমার ভাল লেগেছে তাই ওই রকম লিখেছি। লোকের ভাল লাগবে কিনা ভেবে আমি লিখব।'

কিছুদিন আমি রীতিমতো ডায়েরি রাখিতাম। ১৮৮২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাস হইতে প্রায় দুই বৎসর সে ব্রত পালন করিয়াছিলাম। এই কালের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেকবার আমার দেখাশুনা হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পারি না। গুরু শিষ্যের যে সম্বন্ধ, একদিকে গাঢ় স্নেহ এবং প্রীতি। অন্যত্র গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা—প্রেমের সেই সম্বন্ধকেই আমি যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। অতএব বিস্তর কথা আমি স্মৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বলিতে পারিব।

রাজসাহী কলেজের শিক্ষক বাবু লোকনাথ চক্রবর্তী "আর্যদর্শন" পত্রে "শৈবলিনী" চরিত্রের সমালোচনা করেন। সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার চিঠিপত্র চলিয়াছিল। লোকনাথবাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন যে

"দুর্গেশনন্দিনী"র অভিনব সংস্করণে দিগ্‌গজকে নূতন রূপ দেওয়া হইল কেন? বঙ্কিমবাবু উত্তর দেন যে, একশ্রেণীর অনুকরণ প্রিয় লেখক বিদ্যাদিগ্‌গজ চরিত্রের নামে বঙ্গসাহিত্যে অশ্লীলতা আনিতেছে। তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে সে চরিত্রের কোনো কোনো স্থল নূতন করিতে হইয়াছে। প্রতাপ যেখানে বলিতেছেন যে, 'তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম? সেই স্থল উল্লেখ করিয়া লোকনাথবাবু বলিয়াছিলেন যে, প্রতাপের অসাধারণ বলবান চরিত্রে সেরূপ ভাব কেন? বঙ্কিমবাবু দেখাইয়াছিলেন যে প্রতাপ বস্তুতঃ অসাধারণ হইলেও নিজের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস তেমন দৃঢ় ছিল না। সেই তাঁহার মহত্ত্ব, এবং তাহাই প্রকৃতি-সঙ্গত।

সঞ্জীববাবুর সঙ্গে একদিন আমার গ্রীক্ লাওকোয়েনের কথা হইতেছিল। তিনি বুঝাইতেছিলেন, গ্রীকশিল্পী সেই প্রস্তর মূর্তিতে কি সুন্দর কাব্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলদৃপ্ত লাওকোয়েন সর্পবেষ্টিত এবং আসন্নমৃত্যু হইয়াও বামে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র দুটিকে যত্নে রক্ষা করিতেছেন, সেই অবস্থায় দৃঢ় ওষ্ঠে অধর চাপিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তাঁহার দুর্ভাগ্য বিধাতা দেবতাদের জানাইতেছেন, অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয় জানিয়াও তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সঞ্জীববাবু বলিলেন, এইখানে শারীরিক বলে ধর্মবল মিশিয়াছে, এবং মাঝে একদিন "কুমারসম্ভব" হইতে হিমালয়-বর্ণনা পড়িতে পড়িতে প্রতিশ্লোকে তাহাই দেখাইয়াছিলেন। তিনি 'দেখাইয়াছিলেন' কোনো কবিতাতেই কেবল প্রকৃতি বর্ণিত হয় নাই—সর্বত্র অন্তঃ-সৌন্দর্য নিহিত আছে। শুনিলাম সেদিন প্রায় রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে কাব্যালোচনা করিয়াছিলেন। আমার সমক্ষে সেই রাত্রের কথা তুলিয়া বঙ্কিমবাবুর একজন বন্ধু বলিলেন, 'তোমার সেদিনকার কথামতো বোধহয়—কিছু লিখিবে, কিন্তু তাহার ভাষা তত ভাল নহে।' আমি বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম, 'আপনিই কেন লিখুন না?' বঙ্কিমবাবু উত্তর দিলেন, 'আমি বুড়া হলাম, আর পারিনে; এখন তোমরা লেখ।'

১৮৮৩-৮৪ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়া আমি কলিকাতায় আসি। আমার গৃহিণী এক অদ্ভুত রকমের হিস্টিরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন, উহা Clairvoyance। এই রোগ ডাক্তার সরকার অতি আশ্চর্যরূপে আরোগ্য করেন। আমার ডায়েরিগুলি যদি কখনো ছাপা হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ হইবে। এখানে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, বঙ্কিমবাবু এতদুপলক্ষে নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কথা আমায় বলিয়াছিলেন।

২১শে ফাল্গুন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। আমার সহধর্মিণীর অসুখের কথা এবং তাঁহাতে কতকগুলি শক্তি বিকশিত হইয়াছে শুনিয়া তিনি আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন, 'রোগ মারাত্মক নয়। একটা কথা যেন মনে রাখা হয়, রোগিণীকে বেশ পুষ্টিকর খাদ্য দিবে, হিস্টিরিয়া দৌর্বল্যেই হয়।' কথায় কথায় আমি তাঁহার নভেল সমূহে সন্ন্যাসী চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। হাসিয়া বলিলেন, 'সব নভেলেই আছে বটে, কিন্তু কেন থাকে জানি না।' আমি বলিলাম, 'আপনার পিতার সম্বন্ধীয় সন্ন্যাসীর গল্প সঞ্জীববাবুর কাছে শুনিয়াছি। হইতে পারে, শৈশবাবধি তার দরুণ মনে একটা Impression আছে।' বঙ্কিমবাবু— 'সে গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু সেজন্য কিছু হইয়াছে, আমার বোধ হয় না। তবে অনেক স্থানে অনেক সন্ন্যাসী দেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বই-এর অনুরূপ কোনো সন্ন্যাসীর আশ্চর্য কীর্তিকলাপ কখনো দেখেছেন কি না?' একটু ভাবিয়া উত্তর করিলেন, 'না।' তারপর সিনেট সাহেবের পুস্তকের কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'সিনেট দেখাইয়াছেন বটে যে, মানুষের শক্তি কত বিকশিত হইতে পারে। Theosophy এ দেশে আসিবার পূর্বে আমি তা লিখেছি।' পৌষ সংখ্যা "বঙ্গদর্শনে" "দেবী চৌধুরানী" কার লেখা জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'উহার Mysterious author-ship।" আমি বলিলাম, 'তাঁর লেখা বলিয়াই আমার বোধ হয়েছে।' উত্তর—'অনেকে তা বলেন না।'

একদিন বঙ্কিমবাবুর বাড়ি গিয়া দেখি, তাঁহার নিকট হেমবাবু, চন্দ্রনাথ-বাবু এবং সঞ্জীববাবু বসিয়া আছেন। আমি আসিবার আগে ইঁহাদের ভারি একটা তর্ক চলিতেছিল। তর্কের বিষয়—University-তে মেয়েদের বি.এ. উপাধি লাভ উপলক্ষে হেমবাবুর অভিনন্দন কবিতাটি। হেমবাবু ইংরেজিতে বলিতেছিলেন, 'তোমাদের কোনো উৎসাহ নাই, জীবন নাই' সঞ্জীববাবু বলিলেন, 'ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তুমি সকলের ছোট।' তখন হেমবাবু সঞ্জীববাবুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন, দুজনে একটু রহস্য চলিল। পরে হেমবাবু বঙ্কিমবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'Sentiment governs the world, not logic.' বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তা তো বটেই।' পরে অন্য কথা আসিয়া পড়িল।

২৬শে চৈত্র সন্ধ্যার পর সাক্ষাৎকালে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'রবীন্দ্র কাল

এসেছিলেন, তাঁর কাছে তোমার পরিবারের সংবাদ পাই। নূতন বাসায় বাতাসের সুবিধা কেমন? আমি নিজে গিয়া দেখিয়া আসিব। ছাদে রোগিণীকে শয়ন করানোর ব্যবস্থা করা যায় কি না? আমার মধ্যমা কন্যাটি সেবার হিস্টিরিয়াতে দুই মাস কষ্ট পায়। যে ঘরে তাহাকে রাখা হয়, দিনরাত্রি তা খোলা থাকত, এত বাতাস যে, সহজ লোকের সেখানে থাকা অসম্ভব। মাঠের ভিতর ঘর। যা তা খাওয়াইতাম, দুমাসেই সারিয়া গেল।' সঞ্জীববাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অলকট্ সাহেব আসিয়া কি করিল?' আমি তাঁহার ও মিসেস গর্ডনের কার্য বর্ণনা করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় mesmerize করিতে জানেন। সে দিন তিনি (বঙ্কিমবাবু) ডাক্তারি কোনো পুস্তকে পড়িতেছিলেন, ফোড়ার উপর mesmerize করার মতো অঙ্গুলিচালনা করিলে সোয়াস্তি বোধ হয়, তবে আঙুলে কর্পূর মাখাইতে হয়।' সঞ্জীববাবু বলিলেন, 'তাঁর নিজেরও কিছু কিছু mesmeric power আছে। তিনি উহার দ্বারা নিজের স্ত্রীর ফোড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ফোড়া স্পর্শ করিতে হয় নাই। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'শ্রীশবাবু, সকলই তো দেখিলে। আমার একটা কথা শুনে কাজ করে দেখ দেখি। কাল প্রাতে স্নান করে ফলমূল খাইও, আর কিছু খেও না। সমস্ত দিন একমনে চিন্তা করো, কিসে তোমার পরিবারের পীড়া ভাল হবে। মন ও শরীর পবিত্র রেখো, মনে পাপ চিন্তামাত্র স্পর্শ না হয়। সন্ধ্যার সময় একবার তাঁর শয্যাপার্শ্বে বসে তাঁকে স্পর্শ করিও। ইহাতে বেশ বিশ্বাস করে, কাজ করো, নহিলে করো না।' আমি সম্মত হইয়া আসিলাম।

২রা বৈশাখ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তখন তিনি বৈঠকখানার বাহিরে অনাবৃত শরীরে ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনবাবু এবং একটি দৌহিত্রের সঙ্গে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর রং যে কত ফরশা, মুখ দেখিলে তাহা বুঝা যায় না। আমার পরিবারের পীড়া উত্তোরত্তর বাড়িছে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, 'সোমবারে মেজদাদা (সঞ্জীববাবু) ফিরিলে একত্রে দেখিয়া আসিব।' সঞ্জীববাবু মিসমারাইজ করিতে জানেন। বঙ্কিমবাবু নিজের তৃতীয়া কন্যার পীড়ার গল্প করিলেন। পনের দিন তাঁর দাঁত খোলে নাই। ডাক্তার কেজি নাসিকা দ্বারা আহার করাইতেন। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতা হইতে হাওড়ার বাসায় লইয়া যাওয়া ভারি কষ্টকর হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ভৌতিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারো হিস্টিরিয়া বলিয়াছিল। বলিলেন, 'তাহাদের ঝাড়া-ঝোড়াও mesmerism, জলপড়া

mesmerized water, এই সকল উপায়ে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা করাও। আমার কন্যাকেও mesmerize করার উদ্যোগ হইয়াছিল। যদি কাহাকেও না বল, একটি পরামর্শ দিই। তারকেশ্বরের মানত করিও, তাহাতেও উপকার হয়। আর কার কথা বলিব। জজ্ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ঐ রকমে সারিয়া গিয়াছেন। অনেকেই sceptic, তাই এসব কথা সকলকে বলি না। কিন্তু অনেক সত্য এতে আছে। তোমার বিশ্বাসের জন্য আরো দু-একটা গল্প বলি। আমার জ্যেষ্ঠ ভাই শ্যামাচরণবাবুর কন্যাটির বয়স যখন ছয়-বৎসর তখন তার শ্বাস-কাস ও জ্বর হয়। কিছুতে ভাল হয় না দেখিয়া শ্যামাচরণবাবুব স্ত্রী মেয়েটিকে লইয়া কলিকাতায় আসেন। আমি তখন এখানে সপরিবারে থাকি। মহেন্দ্রবাবু তখন এলোপেথি হোমিওপেথি দুই মতেই চিকিৎসা করেন। এত নাম হয় নাই। তিনি ও আর আর ডাক্তারেরা বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করেন, ঘরে বাতাস মাত্র আসিতে দিতেন না। একটু সাগু মাত্র খাইতে দিতেন, তাও হজম হইত না। প্রাতে আসিয়া মল পরীক্ষা করিয়া প্রত্যহ মহেন্দ্রবাবু সন্দেহ করিতেন যে সাগুর চেয়ে আরো কিছু বেশি খেতে দেওয়া হয়েছিল। কিছুতে কিছু হলো না—মেয়েটি বাঁচে না। নিজে গিয়া আমি তাকে বাড়ি রাখিয়া আসি—রেলের কষ্ট তার সহে কি না মহেন্দ্রবাবু সন্দেহ করিয়াছিলেন। তারপর বাড়ি গেলে এক মাগী কর্তাভজা আসিয়া মেয়েটিকে দেখে বলিয়াছিল যে, সেটি কেন তাকে দেওয়া হোক না। তাঁরা তো তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। সে যদি কোনো উপায়ে মেয়েটিকে বাঁচাতে পারে, তবে মেয়ে তাহারই হবে। শেষে মেয়েটির চিকিৎসা করিতে সম্মত হয়ে বলে যে, সে যা বলিবে তাহাই করিতে হবে। প্রথমে মেয়েটির গলায় একটা কিসেব পুঁটুলি বাঁধিয়া দিয়া তাকে পুকুরে স্নান করাইতে বলে। তাতেও সন্তুষ্ট নয়। বর্ষাকাল, বৃষ্টি পড়িতেছিল, আবার সেই জলে মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিল। পরদিন থেকে উপকার বোধ হতে লাগল। মেয়েটি ক্রমে বেঁচে উঠল। এখন সে বেঁচে আছে। বয়স বিশ বৎসর।' আমি বলিলাম, 'এ সকল ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু তাঁর "রজনী"র সন্ন্যাসী চরিত্র এবং লর্ড লিটনের একখানি নভেল পড়িয়া বোধ হইয়াছে যে, তাহা অসম্ভব নহে। বঙ্কিমবাবু হাসিলেন, বলিলেন, 'অনেক দেখিয়া তবে তিনি লিখিয়াছেন।' "বঙ্গদর্শনে"র কথা একটু হইল। "আনন্দমঠ" সম্বন্ধে ডাক্তার সরকারের মত ও প্রশংসার কথা বলিলাম। উহার অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'গিয়াছিলাম,

কিন্তু অভিনয় ভাল হয়নি। তাই, ডাক্তার সরকারকে লইয়া যাইনি, নইলে সরকার যাইবেন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু দেশীয় থিয়েটারের উপর বড় চটিয়াছিলেন, বলিলেন, 'এখন উহা ভদ্রলোকের যাইবার স্থান নহে। কতকগুলো অসভ্য ছোঁড়া আর বেশ্যা হ্যা হ্যা করিয়া হাসে'—বড় ত্যক্ত হইয়া আসিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'থিয়েটারের উন্নতির জন্য তিনি ম্যানেজারদিগকে উপদেশ পরামর্শ দেন কি না?' বলিলেন, 'বেশি নহে, তা বুঝিবে কে?'

এই সময়ে বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করিতে আসেন। তিনি উঠিয়া গেলে রাখালকে বলেন, 'ইনি নিশিকান্ত, বড় বিদ্বান।' একটু পরে হাসিয়া বলেন, 'আমি তো মন্দ বলতে পারবই না, তিনি য়ুরোপে বসিয়া আমার বই পড়িয়াছেন।'

ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একটু অবনিবনাও হওয়ায় এই সময়ে বঙ্কিমবাবুকে হাওড়ায় পৃথক বাসা করিতে হইয়াছিল—মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। ৯ই বৈশাখ সন্ধ্যার একটু পূর্বে ফিরিয়া আসেন। আমি আসিয়া দেখি, ইজিচেয়ারে বসিয়া তিনি তন্ময়চিত্তে আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছেন। তাঁহার মত এই যে, মস্তিষ্কের পোষণ জন্য প্রচুর পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন। বলিলেন 'তাঁর শরীরে এমন বল নাই যে দশসের জিনিস তুলিতে পারেন।' অথচ অতিশয় অধিক আহার করিয়া থাকেন। হুগলীতে অবস্থানকালে বাবু জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির সঙ্গে দুইদিন কিরূপ ভয়ানক আহার করিয়াছিলেন, সে গল্প করিলেন। আপাতত তত বেশি খাইতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু যাজপুরে তিনি দুইবেলায় চারটে মুরগী, আটটা ডিম ও আর আর জিনিস প্রত্যহ খাইতেন। চারটে মুরগীর কথা শুনিয়া আমি একটু আশ্চর্য হইলে বলিলেন, 'তাহা এখনো পারি।' বলিলেন, 'মানসিক শ্রমটা বড় করিতে হয়, এত না খেলে চলে না।' জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যৌবনাবস্থায় কি এমন আহার করিতে পারিতেন?' উঃ—'না। এখনো পারি?' কথায় কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁর কোন্ পুস্তক তাঁর মতে বেশি দিন টেঁকিবে? উত্তর—'বলা শক্ত, বোধহয় "কৃষ্ণকান্তের উইল"।' প্রশ্ন—'বিষবৃক্ষ কতদিনের লেখা? উত্তর—'১৮৭২ সালের। যাজপুরে "দেবী চৌধুরানী" লিখেছি।' প্রশ্ন—'তা কি শেষ হয়েছে?' উত্তর—'না এখনো হয় নাই।' প্রশ্ন—'আচ্ছা আপনি তো অনেক চরিত্র লিখেছেন, দীনবন্ধুবাবুর নিজের চিত্রিত চরিত্রগুলির অধিকাংশ জীবিত বা মৃত। —আপনিই লিখেছিলেন, আপনার চরিত্রগুলি কি তেমন?' উত্তর—'সেই রকম বটে, কিন্তু তার উপর অবশ্য রং ফলান।'

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি একদিনের কথা। শনিবার, প্রায় পাঁচটার সময় বঙ্কিমবাবুর কলুটোলার বাসায় গেলাম। রাখালের কাছে শুনিলাম, "মৃণালিনী" সপ্তম সংস্করণে অনেকটা বদল হইয়াছে। দুইজনে পুরানো ও নূতন পুস্তক লইয়া মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, পুরানো পুস্তকের দুই অধ্যায় একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কয়টিমাত্র কথায় দুই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দমাত্র পরিহারের চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি রাখালকে বলিলাম, 'বইটে নাটকে ও ভাষাংশে আগেকার চেয়ে ভাল হইয়াছে বটে। কিন্তু একাংশে সাধারণের বোধহয় কিছু ক্ষতি হইয়াছে। সেক্সপীয়র প্রভৃতির নাটক লেখার সাময়িক পর্যায় ঠিক করিয়া আধুনিক সমালোচকগণ তাঁহাদের মানসিক ক্রমোন্নতির পরিচয় দিতেছেন। বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে পরবর্তী লেখকদের সে সুবিধা ঘটিবে না। এতটু পরে বঙ্কিমবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। আমাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হচ্ছে?' এবং আমার প্রশ্নমতো বলিলেন, 'মৃণালিনীব অনেক বদলাইয়া দিয়াছেন।' তখন আমরা উভয়ে "স্টেটসম্যান" হইতে বারাকপুরে সুরেন্দ্রবাবুব অভ্যর্থনা উপলক্ষে সাহেবদের কাপুরুষোচিত ব্যবহারের বৃত্তান্ত পড়িতেছিলাম। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া সুধাইলেন, 'ব্যারাকপুরের লডাই পড়ছো না কি?'

আজ নিতান্তই সামান্য কারণে তাঁহাকে রাগিতে দেখিলাম। শুনিলাম, আগে এমন ছিল না। মালদহে থাকিতে মাথার ব্যাবাম হয়, সেই হইতে রাগ হইয়াছে, ইহা আর সুধরাইল না। মালদহে মাথার পীডার ইতিহাস এইরূপ:—যে বাডিতে ছিলেন, সেখানে নাকি পূর্বে নরবলি হইত। পরিবাব সঙ্গে ছিল না। একদিন এক কুঠরীতে বসিয়া আছেন, কে আসিয়া ভয়নক বেগে দ্বার ঠেলিতে লাগিল। 'কেরে? কেরে?' করিয়া বঙ্কিমবাবু চীৎকাব করিলেন। উত্তর নাই। চাকরেরা আসিয়া খুঁজিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সেই হইতে মস্তিষ্কের পীডার সূত্র। পরদিন কাছারিতে লিখিতে লিখিতে মূর্ছিত হইয়া পড়েন।

"প্রতিনিধি" নামক সংবাদপত্রে আমি "কুন্দনন্দিনী" চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবু পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সামান্য চরিত্র, তার অত বিশ্লেষণের দরকার ছিল না। আমি বলিলাম, 'এক বিষয়ে চরিত্রটি আমার কাছে অসামান্য বলিয়া বোধহয়। উহার নিশ্চেষ্ট সরলতা। কোথাও আর অমন চিত্র দেখি নাই।' বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আমি তিলোত্তমার চরিত্রেও একটু তাহা দেখাইয়াছি।' আমি বলিলাম,

'কুন্দে তাহার বিকাশ অনেক বেশি।' আমি বলিলাম, 'আমার বোধহয় যেন আপনার নাট্যসৃষ্টির শক্তি এখন বাড়িতেছে।' বঙ্কিমবাবু—'হ্যাঁ, দেখিয়াছি, সে কথা সেদিন তুমি কুন্দ-চরিত্রের শেষে লিখিয়াছ। চন্দ্রবাবুও তাই বলেন, আমার নিজেরও তাই বোধহয়। মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ আগাগোড়া প্রায় নাটক। থিয়েটারে আমার বইয়ের যে দুর্দশা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ওরূপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।' আমি বলিলাম, 'এইবার কেন একবার নাটক লিখিতে চেষ্টা করুন না।' উত্তর—'লিখিব কার জন্য? তেমন শ্রোতা নাই, অভিনেতা নাই, তারপর নাটকের ভাষা এখনো হয় নাই।—বলিলাম, 'আপনার কাজ আপনি করিয়া যান, পরে লোকে বুঝিবে।' সম্মত হইলেন, নাটক লিখিতে চেষ্টা করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার ইতিহাস লেখার কি হইল?' উত্তর—'এখন ওসব হয় না, যদি কখনো চাকরি ছাড়িয়া কোনো লাইব্রেরিতে বসিয়া পড়িতে পাই, তবে লিখিব। এখন কিছু হয় না। তোমরা তো পাঠক বাড়াইতেছ, তখন একবার দেখা যাবে।' কথা উঠিল, আজকাল লোকের হিন্দুধর্মের উপর আস্থা বাড়িতেছে, সে সম্বন্ধে একটা প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। আমি বলিলাম, 'সেবারে আপনি মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু কাজ হইয়া থাকিবে।' বঙ্কিমবাবু উত্তর দিলেন, তাঁর আনন্দমঠ এবং হেস্টির সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের পত্রগুলি কতক কাজ করিয়া থাকিবে। তার পর তাঁর ইংরেজি লেখার কথা হইল। বলিলেন, 'বরাবর বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজি লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য।'

আমার "বঙ্গদর্শন" গ্রহণ স্থির হইয়া গেলে বঙ্কিমবাবু একদিন বলিলেন, 'শ্রীশবাবু, তোমার সঙ্গে একটি কথা আছে। তুমি যে আমায় লেখার জন্য ঘন ঘন পীড়াপীড়ি করিবে, তা হবে না।' আমি বলিলাম, 'বঙ্গদর্শন আপনার নামের সঙ্গে অভিন্ন, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে? নভেল বরাবর তো চলিবেই, প্রবন্ধও মাঝে মাঝে দিতে হবে।' উত্তর—'নভেল লেখা থাকে, চলিবে। কিন্তু প্রবন্ধ দিব—ন-মাসে ছ-মাসে। ইদানিং প্রবন্ধ বড় একটা লিখি নাই, কেবল মাঝে মাঝে ভাঁড়ামি করেছি। তোমরা যুবা পুরুষ, অনেক লিখিতে পারিবে, আর আমার কাছে "বঙ্গদর্শনে"র জন্য মাঝে মাঝে গালি খাবে। মেজদাদাও খান।--- সেবারে দুই মাস বঙ্গদর্শনের টোন বড় নীচু করা হয়েছিল। বিরক্ত হয়ে ৬।৭ মাস লিখি নাই।—' আমি বলিলাম, 'আপনি কেন সম্পাদক হোন না?' উত্তর—'আর সে উৎসাহ নাই।—

আর একদিন চন্দ্রনাথবাবু "বঙ্গদর্শনে"র কথা তুলিলেন। বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন, 'শ্রীশের ইচ্ছা, আমারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও' বঙ্কিমবাবু অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, 'তাহলে "বঙ্গদর্শন" ছাড়িব কেন? তা হলে আর কাহারো সহায়তা লইতাম না। শ্রীশবাবুকে সন্ধ্যার পর এসে গণেশ হইতে হইত।' একটু পরে খিদিরপুর হইতে বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও উকিল উমাকালীবাবু আসিলেন। খাজনার আইন বিলের আন্দোলনের জন্য লর্ড লিটনকে মুরুব্বী খাড়া করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিমবাবু যোগেন্দ্রবাবুকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। চন্দ্রবাবুকে পান লইয়া খাইতে দেখিয়া বঙ্কিমবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'এখন পানে দিলে মন!' খুব হাসি চলিতেছিল। রাজকৃষ্ণবাবু আমারই মতো শ্রোতা—বড় কিছু বলিতেছিলেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি একস্থানে লিখিয়াছেন, 'সুন্দর অর্থে ভাল নহে।' ইহা কি ঠিক?' চন্দ্রবাবু স্বীকার করেন না। উত্তর—'কোথায় লিখিয়াছি।' আমি—'বৃত্রসংহারের সমালোচনায়।' উত্তর—'ভুল লিখিয়াছি।' আমি কার্লাইলের কথা বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তাঁরও সেই মত— 'Beautiful includes good.'

আমি বলিলাম, 'আমার ইচ্ছা, আপনার জীবনী সম্বন্ধে কতক নোট এখন হইতে সংগ্রহ করি। আপনি কিছু কিছু নোট দিতে পারেন কি?' বঙ্কিমবাবু হাসিলেন, বলিলেন, 'আমার জীবন অসার, তা লিখিয়া কি হইবে? আমার জীবনের কথা মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তোমায় শুনাইব, সকল কথা বলা তো সহজ নয়। জীবনে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, তা বলা বড় কঠিন, কাজেই জীবনী হইল না। সে সব বলিতে পারিলে অনেক কাজ হয়। আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশি রকমের—আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না। আমার যত ভ্রম প্রমাদ তিনি জানেন, আর আমি জানি। আমার জীবনের কতক বড় শিক্ষাপ্রদ, সকল বলিলে লোকে ভাবিবে কি যে, কি এক রকমের অদ্ভুত লোক ছিল। আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতি-গতি অতি আশ্চর্য রকমের। কেমন করিয়া তাহা হইল, জানিলে লোকে আশ্চর্য হইবে। আমি আপন চেষ্টায় যা-কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোনো শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক-আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে ই। ক্লাসে কখনো থাকিতাম না।

ক্লাশের পড়াশুনা কখনো ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কু-সংসর্গটা ছেলেবেলায় বড বেশি হয়েছিল। বাপ থাকতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর-একটু বেশি, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয়নি, নীতিশিক্ষা কখনো হয়নি। আমি যে লোকের ঘরে সিঁদ দিতে কেন শিখিনি, বলা যায় না।' বঙ্কিমবাবু হাসিলেন। আমি বলিলাম, 'শুনেছি, বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?' উত্তর—'কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাতে হয়েছে।' একটু পরে বলিলেন, 'চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ, আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণ স্বরূপা।' আমি তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলির কথা তুলিলাম। বলিলাম, 'স্ত্রী-চরিত্রগুলির উৎকর্ষ আপনার বেশি। পুরুষও কয়টি অতি সুন্দর আছে।' অন্যান্য নামের সঙ্গে বঙ্কিমবাবু অমরনাথের নামও করিলেন। আমি বলিলাম, 'অমরনাথ আর প্রতাপ একই চরিত্রের দুইরূপ বিকাশ।' বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'প্রতাপ বরাবর ঐশ্বর্যশালী, তথাপি ইন্দ্রিয় জয়ী; কিন্তু অমরনাথ অবস্থার পরিবর্তনে মনঃসংযম কবিতে পারিয়াছিলেন।' বলিলেন, 'পূর্ণচন্দ্র বসু এইরূপ বুঝাইয়াছেন।' স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিজেব মতে সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমর। "কৃষ্ণকান্তের উইল" তাঁহাব সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। আমি বলিলাম, 'অনেকে "কপালকুণ্ডলা"কে সর্বোৎকৃষ্ট বলে।' উত্তর—'হ্যাঁ কাব্যাংশে খুব উঁচু বটে।' তারপর নিজেই বলিলেন, 'প্রথম তিনখানি বইএর জন্য আমি ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী, তবে "দুর্গেশনন্দিনী" লেখার আগে "আইভ্যান হো" পড়ি নাই। "কপালকুণ্ডলা" লেখার সময় সেক্সপীয়র বড় বেশি পড়িতাম। "মৃণালিনী"র পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িয়াছি।' "চন্দ্রশেখরে"র কথা উঠিল। আমি বলিলাম, 'ভাষার লীলা, দৃশ্যের এমন্ উৎকর্য আপনার আর কোনো কাব্যে দেখা যায় না। সেই "অগাধজলে সাঁতারে"র মতো সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য বড় দুর্লভ।' আমার কথা স্বীকার করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'অগাধজলে সাঁতারের মতো দৃশ্য আমি আর কই লিখি নাই।' নিজের জীবনী সম্বন্ধে বলিলেন, 'অন্যায় কাজের মধ্যে মদ খাই, কিন্তু ইহা বলিতে পারি সেজন্য কখনো কোনো দুর্নীতির কাজ করি নাই। খাইতে বসিলে একটু অপব্যবহার না হয় এমন নহে।' প্রশ্ন—'মদে আপনার শারীরিক কোনো অসুখ হয় না।' উত্তর—'না বরং মদ ধরিয়া শরীর ভাল আছে। সে যেমনই হোক, আমাদের মতোন লোকের নিকট হইতে এটা বড় কু-দৃষ্টান্তের কাজ করে। সেবার ডাক্তার গুরুদাস যখন বহরমপুরে ছিলেন, কতকগুলি

কলেজের ছাত্রকে মদ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া উত্তর পাইয়াছিলেন, 'দোষ কি মহাশয় ? অন্যায় কাজ হলে বঙ্কিমবাবু করিবেন কেন ?' গুরুদাসবাবু আমার কাছে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, 'আমি যেন ওটা ত্যাগ করি। দুখ-একবার ত্যাগও করিয়াছিলাম।'

রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন ?' উত্তর—'পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে। কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সেকথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধহয় রবি বেশি "গিফটেড"। কিন্তু "প্রিকোসাস", এখনি তার বয়েস ২২।২৩, সেকথা সেদিন রবিকে বলেছি। রবি বলেন, আপনিও তো অল্প বয়সে "দুর্গেশনন্দিনী" লেখেন। আমি যখন "দুর্গেশনন্দিনী" লিখি, তখন আমার বয়স ২৪ বৎসর।' - - - আমি বলিলাম, 'এই বয়সে দুইবার ইউরোপ-ভ্রমণে যাওয়াও আমার বোধহয় রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ সুবিধা' উত্তর—'তাতে উপকার হয়েছে কিনা, জানি না। আমার ইচ্ছা আছে, পেনসন লইয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া একবার ইউরোপ যাব।' - - - নিজের সৃষ্ট স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে আবার বলিলেন, 'এদেশে স্ত্রীরাই মানুষ, সেকথা আমি একবার বুঝাইবার চেষ্টা পেয়েছি। ইউরোপের যত মনস্বিনী স্ত্রীর কথাই বল, ঝান্সীর রানীর চেয়ে কেহ উচ্চ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে অমন নায়িকা আর নাই। ইংরেজ সেনাপতি রানীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখিয়া বলিয়াছিল, 'প্রাচ্যদিগের মধ্যে এই একমাত্র স্ত্রীলোক-পুরুষ।' আমার ইচ্ছা হয়, একবার সে চরিত্র চিত্র করি, কিন্তু এক "আনন্দমঠে"ই সাহেবেরা চটিয়াছে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।' ইডেন সাহেবের কথা উঠিল। বলিলেন 'লোকটা যেমনই হোক, খুব বুদ্ধিমান। আমায় একদিন বলিয়াছিল, "আপনার বই খুব পপুলার, অনেক বোধহয় বিক্রয় হয়।" আমি উত্তর করি, 'আমাদের দেশ বড় গরিব, বেশি বিক্রি হয় না।' ইডেন সাহেব, '২।৩ টাকায় এক কপি বিক্রয় করিতে পারেন না।' তখন আমার কাছে শুনিলেন যে, একটাকা দামেও লোকে কিনিয়া উঠিতে পারে না। ইডেন সাহেব আর কিছুদিন এখানে থাকিলে আমার কাজকর্ম সম্বন্ধে ভাল হত।' অন্যান্য সাহেবদের কথা হইল। অনেকে বঙ্কিমবাবুকে বলে, এ দেশে এই লোকটাই অদ্ভুত শক্তিশালী। কথা-প্রসঙ্গে শুনিলাম, রিয়াক সাহেব হোমিওপ্যাথ লোকনাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, সত্যই কি হেস্টির বিরুদ্ধে পত্রগুলা বঙ্কিমবাবুর নিজের লেখা ?

জন স্টুয়ার্ট মিলের কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে।' নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, "সাম্য"টা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না। প্রবন্ধ পুস্তকেও অনেক ভুল, সেটাও ছাপাব না। তবে ভিন্ন পুস্তকাকারে উহার কয়টা প্রবন্ধ দিব।'

পূজার সময় নবমীর দিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, চন্দ্রনাথবাবু প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা আহার করিতে বসলে বঙ্কিমবাবু লেবু পরিবেশন করিলেন। নীচে কাঙ্গালীভোজন হইতেছিল, হাসিয়া বলিলেন, 'দেখ চন্দ্র, নানারকম রূপ? দেখিলে আর খেতে পারবে না।' বঙ্কিমবাবুর প্রথম যৌবনকালের একখানি ছোটো ফোটোগ্রাফ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতীশচন্দ্র আমায় দেখাইলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'এখানি "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিবার আগের ছবি।' বঙ্কিমবাবুদের বংশ বৈষ্ণব, পূজায় আমিষের সম্বন্ধ নাই। এক মেছুনী মাছ লইয়া দরওজায় ঢুকিল, বঙ্কিমবাবু সেদিকে আসিতেছিলেন, একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'মাছ নাবাসনে, আজ মাছ আনতে নেই।' যতীশ বলিল, 'যা কখনো হয়নি, তাই করলি?'

বাহিরের বৈঠকখানার টেবিলের উপর বঙ্কিমবাবুর আর-একখানি বড় ফোটো দেখিলাম। খুব অল্প বয়সের ছবি, রবিবাবুর প্রথম বয়সের দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশের মতো চুল, মুখের চেহারাও অনেকটা সেইরূপ, এখন কিছু মেলে না। চন্দ্রবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখনকার চেহারার সঙ্গে কিছু কি মেলে? আচ্ছা বলতো, এখনকার চেহারা ভাল, কি তখনকার?' আমি তখনকারটাকেই পছন্দ করিলাম। চন্দ্রনাথবাবু হাসিয়া আমার মতে মত দিলেন। বঙ্কিমবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, 'ও কথা সেজবাবু স্বীকার করেন না, বলিলে মারিতে আসেন!'

বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ

দ্বিতীয় প্রস্তাব

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, "সাধনা"য় "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ" লিখিয়াছিলাম। তখন ইচ্ছা ছিল, আরো কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা-কিছু আমার সংগ্রহ এবং জানা আছে, সাধারণে প্রকাশ করিয়া তদীয় ভবিষ্যৎ জীবনী-লেখকেব পথ কিঞ্চিৎ সুগম করিয়া দিব। নানা কারণে এতদিন সে মহৎ সঙ্কল্পের অনুসরণ করিতে পারি নাই, আজও পারিলাম না। বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়টি মাত্র কথা বলিবার অবসর পাইব। ১৮৮৫ অব্দের পূজার পূর্বে "প্রচার" পত্রে "কৃষ্ণচরিত্রে"র যে অংশ প্রকাশিত হয়, তাহাতে বিশেষভাবে তাঁহার রণকুশলতার সমর্থন করা হইয়াছিল; পড়িয়া রবিবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, যিনি মনুষ্য জাতির চিরদিনের আদর্শ বলিয়া বঙ্কিমবাবুর ব্যাখ্যায় প্রতিভাত, যুদ্ধে প্রবৃত্তি তাঁহার পক্ষে ভারি অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ঠিক সেই কথা আমারও মনে হইরাছিল, এবং বঙ্কিমবাবুকে আমি লিখিয়াছিলাম যে, হিংসাবৃত্তি যুদ্ধের উত্তেজক, অথচ হিংসার মতো সমাজবিরোধী (Anti-social) বৃত্তি আর নাই। শ্রীকৃষ্ণ আদর্শচরিত্র হইয়া তাহাতে প্রবৃত্ত ছিলেন ইহা তাহার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক নহে। সে সময়ে রবীন্দ্রবাবু ও আমার সম্পাদিত "পদরত্নাবলী" মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং আমি উহার একখণ্ড বঙ্কিমবাবুর কাছে পাঠাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসু হইয়াছিলাম। কিছুদিন পরে নদীয়া জেলায় প্রথম রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া যাই। পলাশীর অদূরে কালীগ্রামে অবস্থানকালে বঙ্কিবাবুর পত্রোত্তর আমার হস্তগত হইয়াছিল। সে আজ চতুর্দশ বৎসরের কথা—কিন্তু যেন কাল বলিয়া মনে হইতেছে। পত্রখানি উদ্ধৃত করিতেছি—

প্রিয়তমেষু—

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি, শীঘ্রই চাকরি চিরস্থায়ী হইবে।

"পদরত্নাবলী" পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের, না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা

করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহ-কার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না, এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুই তত্ত্বটি প্রমাণিত হইবে।—

১. শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২. ধর্ম্মযুদ্ধ আছে। ধর্ম্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। (যথা— William the Silent.) ধর্ম্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত নহেন।

৩. অন্যে যাহাতে ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন কোনো যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশি পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইতি ৩ং ২৬শে আশ্বিন।

(স্বাক্ষর) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এইখানে একটি কথা মনে পড়িতেছে "পদরত্নাবলী"র ভূমিকা লেখা শেষ হইলে একদিন প্রাতে বঙ্কিমবাবুকে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। তাহার শেষ দিকে একস্থানে আছে, 'যশোদার সেই গোপালময় প্রাণ, সেই অতুল বাৎসল্য ভাব, ব্রজ রাখালের সেই ঢল-ঢল বালসুলভ সখ্য, যমুনার কূলে কূলে ব্রজের বনে বনে মধুর সে গোচারণ, সে মোহ, যার বলে—

'দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে,
স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে।'

সৌন্দর্য্যের এইসব উপকরণ, ভালবাসার পঞ্চম যে মধুর রস, তাহার নীচের এই সব পরদা তাঁহারা একেবারেই ছাড়িয়া গিয়াছেন। 'ঢল-ঢল বালসুলভ সখ্যে'র স্থলে আমি লিখিয়াছিলাম 'ঢল-ঢল ছেলেমি সখ্য।' শুনিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'দেখতে পাই, রবীন্দ্রের ও তোমার লক্ষ্য বাঙ্গালায় সংস্কৃতমাত্র বর্জন করে কেবল চল্‌তি কথা চালানো।' তাঁহার সঙ্গে কখনো তর্ক করিতে পারিতাম না, অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে বলিলাম, 'কি করতে হবে?' বঙ্কিমবাবু— 'ছেলেমির জায়গায় "বালসুলভ" কর।' বঙ্কিমবাবুর মন্তব্য

কতটা ঠিক, তাহা তখনকার "বালক" পত্রের প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এই চৌদ্দ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ প্রতিভাবলে নূতন পথ খনন করিয়া পদ্য ও গদ্যের ভাষায় অভূতপূর্ব ঝঙ্কার ও ওজস্বিতার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। আমি কিন্তু আজিও সোজা সরল মোহ সম্পূর্ণ ভুলিতে পারি নাই। সরস্বতী পূজার দিন কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া সন্ধ্যার পর বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তখন কলুটোলায় সেন মহাশয়দের বাড়ির কাছে তাঁহার বাসা। উপরের বৈঠকখানায় পীড়িত শ্যামাচরণবাবু শয্যাগত। নীচে রাখালের ঘরে একপার্শে সঞ্জীববাবু ও রুগ্ন শয্যার কাছে বঙ্কিমবাবু।

রাজকুমারবাবু এবং ঔপন্যাসিক দামোদরবাবু বসিয়াছিলেন। শেষোক্ত কিছুদিন পূর্বে শ্যামাচরণবাবুব বৈবাহিক হইয়াছিলেন; অতএব উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া নূতন বৈবাহিকের সঙ্গে রহস্যে রহস্যে আমাদিগকেও আমোদিত করিতেছিলেন। সঞ্জীববাবুব তামাশার মাত্রা কিছু বেশি, বঙ্কিমবাবুর ততটা নহে, তিনি বরঞ্চ বার বার বলিতে লাগিলেন, 'ছেলেমানুষের সঙ্গে ওসব কেন? রাখালের বয়সী বা কিছু বড় বই তো নয়।' কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র তবু ছাড়েন না। বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'বিধাতা কেন যে আমায় দুজনার ছোট করেছিলেন, জানিনে।'

দামোদরবাবু উঠিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু আমায় সুধাইলেন, 'তুমি পলাশীতে কি কি পেয়েছিলে, আমায় লিখেছিলে?' আমি যুদ্ধক্ষেত্র ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে গোলা ও গুলি কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম—লাক্ষা-বাগের অবশিষ্ট একমাত্র আমগাছের ছোট একখণ্ড কাষ্ঠও পাইয়াছিলাম। তাহার পরিচয় দিয়া বলিলাম, 'দেখবেন?' বঙ্কিমবাবু—'দেখে আর করব কি? কেবল কাঁদা বই তো নয়।' কথায় কথায় আমি বলিলাম, 'কীর্তন সম্বন্ধে এবার কতক অনুসন্ধান করে এসেছি।' বঙ্কিমবাবু—'ওসবে কিছু হবে না। এখন ভবিষ্যতের একটা ভিত্তি করতে হবে।' আমি—'সে আপনি করুন, আমাদের সাধ্য কি?' বঙ্কিমবাবু— 'সেই চেষ্টাই তো করছি। কেমন, শ্রীকৃষ্ণের উপর ভক্তি কিছু হ'ল।' আমি স্বীকার করিলাম, এবং বৈষ্ণব কবিদের শ্রীকৃষ্ণ যে কাব্যের সৃষ্টি বলিয়া আমার ধারণা হইতেছিল, তাহা বলিলাম। তিনি এ কথার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, 'গীতার এক জায়গায় মাত্র দেখি রাসাধ্যায়ে গোপীরমণ। রাসের অর্থ আমি এই রকম বুঝি, তখন স্ত্রীজাতির বেদাদিতে অধিকার ছিল না। অথচ তাহাদের শিক্ষা চাই;

শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন, কলাবিদ্যার দ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। ইহার বেশি কিছু নয়।' ঠিক মনে পড়িতেছে না, কিন্তু বোধহয় কৃষ্ণ চরিত্রের পরবর্তী সংস্করণে এ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছিল

ইহার কিছুদিন পূর্বে স্বসম্পর্কীয় জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এরূপ সৌহার্দ্য যে, বঙ্কিমের মাতৃবিয়োগের পর তিনিও তাঁহাদের বাড়ি গিয়া কাছা পরিয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবু আমায় একবার বলিয়াছিলেন, জগদীশবাবু [জগদীশনাথ রায়] তাঁর চেয়ে অন্ততঃ পনর বছরের বড়। অথচ সমবয়স্কের মতো তাঁহাদের বন্ধুতা ছিল। সাহিত্যানুরাগী পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না, বঙ্কিমবাবু ইহারই নামে "বিষবৃক্ষ" উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

১৮৯১ অব্দের শরৎকালে সীতামাঢ়ি হইতে কাঁথি বদলি হইবার সময় বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার কলিকাতার বাড়িতে দেখিতে যাই। অল্পদিন মাত্র তখন তিনি পেনসন লইয়াছিলেন, শরীর ভাল ছিল না। পূর্ণবাবু কাছে বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'আগে বলতেন পেনসন লইয়া খুব লিখিব—এখন?' মৃদু হাসিয়া তিনি উত্তর করিলেন, 'এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়। তোমরা লেখ।' বলিলেন, 'রমেশকে (শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, তখন মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট) বলেছি, দিনকতক রঘুনাথপুরে বাঙ্গালায় বাস করব, সমুদ্রের হাওয়ায় শরীর সারতে পারে। কিন্তু সেখানে খাবার জলের কষ্ট। বেশ হল, কাঁথি হতে তুমি ভাল ভাল জল পাঠাতে পারবে।' কিন্তু সেখানে তাঁহার যাওয়া হয় নাই। স্থানটি আমার দেখা হয় নাই, কিন্তু শুনিয়াছি ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি চমৎকার। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের সময় বাঙ্গালার চারিধার জলে পূর্ণ হইয়া যায়—অদূরে জমিদার ভুঁইয়া মহাশয়ের বাসভবনের চারিদিকে দূর বিস্তৃত ঘন বাঁশ বনের প্রাচীর, তাহাতে নির্ভয়ে হরিণযূথ ও ময়ূর ময়ূরীগণ বিচরণ করিতেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, অপরাহ্ণে এই জীবগুলিকে স্বহস্তে আহার দান করা ভুঁইয়া মহাশয়ের দৈনিক কার্য, এবং সেই সমুদ্র-বেলাভূমে তাহাদের যথেচ্ছ বিচরণের বিঘ্ন না হইতে পারে, এই উদ্দেশে তিনি সে অঞ্চলে শিকার বন্ধ করাইয়া দিয়াছেন।

কাঁথি মহকুমার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তদীয় পুত্রগণের নাম এখনো লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে; কেন না, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মাজনামুঠা পরগণার বন্দোবস্তের

অবসরে সাধারণ লোকের বিস্তর হিত করিয়াছিলেন; তাঁহার মেদিনীপুরে অবস্থিতি সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানকার জেলাস্কুলে পড়িতেন। তাঁহার হেড মুহুরী সেদিনও বাঁচিয়াছিলেন। বছর কতক হইল, প্রায় শত বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যচপলতার অনেক গল্প করিতেন। ফলতঃ কপালকুণ্ডলার অনেক দৃশ্যের জন্য যে বঙ্কিমবাবু কাঁথির সুন্দর বালুকাশৈল-শ্রেণী এবং সাগরোপকূলের কাছে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাঁথি হইতে ছয়মাস পরে বীরভূম বদলি হইবার সময় আবার কলিকাতায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। পিতার হেড মুহুরীর ও তাঁহার সন্তান-সন্ততির কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, সাধারণতঃ মাজন-মুঠার সকল লোকেই এখনো তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করে। তাহাতে সলজ্জে ও স্মিতমুখে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'কর্তাদের দয়ার জন্য লোকে ভালবাসিত। আমরা বিচার করিয়া কড়া শাস্তি দিতাম, তাহাতে লোকে কর্তার সঙ্গে তুলনা করে আমাদের নিন্দা করিত।'

মনে পড়িতেছে, নবীনবাবু একবার পুরী অঞ্চল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিতেছিলেন যে তিনি গোটাকতক উড়িয়া কবিতা লিখিয়াছেন, পড়িয়া শুনাইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন কি না? বঙ্কিমবাবু উত্তর করিলেন, 'উড়েভাষা আমি বুঝিতে পারিব না? ছেলেবেলায় দশ-বার বছর পর্যন্ত উড়ের হাতে লালিত-পালিত, আমি আর উড়ে বুঝতে পারব না?' মেদিনীপুরের, বিশেষতঃ কাঁথির উপর বাস্তবিক বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক টান ছিল।

কিন্তু সাধারণ উড়িষ্যাবাসীদের প্রতি তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। আমার কাঁথি যাওয়ার সময় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্মার্থ এইরূপ—'সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দেখিয়া ভুলিও না।'

আমার কৃষ্ণনগর যাওয়ার কিছুদিন আগে রাখালের হঠাৎ কঠিন পীড়া হয়। বঙ্কিমবাবু নিজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় পদ্ধতি মতেই চিকিৎসা করিতে পারিতেন। স্বয়ং সচরাচর ব্যবস্থাপত্র পাঠাইয়া ঔষধ আনাইয়া লইতেন। সে যাহা হউক, অন্যান্য চিকিৎসায় কোনো ফল না হওয়ায় উৎকণ্ঠিত হইয়া একদিন রাত্রে আমায় চিঠি লিখিলেন, যেন প্রাতে আমার আত্মীয় স্বর্গীয় সুবিখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্র কুমার সেন খুড়া মহাশয়কে লইয়া যাই। তিনি হোমিও-প্যাথির মতো ছোট শিশিতে ঔষধ রাখিতেন। দেখিয়া বঙ্কিমবাবু

ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, 'দেখি দেখি, এ যে ঠিক হোমিওপ্যাথির মতো।' আমি বলিলাম, 'উনি দুই-তিনটা ঔষধের গুঁড়া মিশাইয়া চিকিৎসা করেন— তাহাতে বেশ উপকার হয়। এটা বেশ উন্নত পদ্ধতি।' বঙ্কিমবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'হোমিওপ্যাথি মতে প্রত্যেক ঔষধ পৃথক ব্যবহার করা উচিত, তাহাতে উপকার হইতেছে। সে পরীক্ষার পর ইহাকে উন্নতি বলিতে পারি না।' যাহা হউক, প্রশংসিত কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার উপর তাঁর যথেষ্ট ভক্তি ছিল।

একবার সুলেখিকা শ্রীমতী সরলা দেবীর সংস্কৃত নাটক সমালোচনার কথা তুলিয়া বঙ্কিমবাবু আমার অনুজ শ্রীমান শৈলেশচন্দ্রের সম্মুখে আমায় বলিয়াছিলেন, 'লেখিকার বয়স বিবেচনা করিলে বলিতে হয় ও বয়সে আমাদেরও অমন লেখা সহজ হইত না, তাঁহার সমালোচনা পড়িয়া নাটক-গুলি আবার নূতন করিয়া পড়িতেছি।' শৈলেশ বলিলেন, 'আপনি আর তো কিছু লিখিতেছেন না?' বঙ্কিমবাবুর বাটীর তখন সংস্কার হইতেছিল, হাসিয়া বাড়ি দেখাইয়া বলিলেন, 'এখন আমারো লেখা ঐ রকম, কেবল পুরাতনের মেরামত ও চুনকাম।'

১৮৯২-৯৩ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার বহুল প্রচলন সম্বন্ধে রবিবাবুর কয়েকটি প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হয়। আনন্দমোহনবাবু ও বঙ্কিমবাবু উহার অনুমোদন করিয়া রবিবাবুকে চিঠি লিখিয়াছিলেন, চিঠি দুখানি পরে সাধনায় বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু সিণ্ডিকেটের উপর যথেষ্ট ভক্তিমান ছিলেন না এবং তিনিও একটিমাত্র বিশেষণে না রাখিয়া-ঢাকিয়া সে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রবিবাবু কথাটাকে তেমন উন্মুক্তভাবে সাধারণের সমক্ষে বাহির করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'ইচ্ছা করিলে ওটাও ছাপিতে পারেন, তাহাতে আমার কোনোআপত্তি নাই।' সে কণ্ঠে যে মনুষ্যো-চিত দৃঢ়তা ধ্বনিত হইয়াছিল, আজো তাহা ভুলিতে পারি নাই। বলিলেন, 'আনন্দমোহনবাবু তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার বিপক্ষতা করেন মুসলমান সভ্যেরা আর মহামহোপাধ্যায়ের দল।' এইখানে বলা আবশ্যক যে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও নীলমণিবাবু তখনো মহামহোপাধ্যায় হন নাই।

তাঁহার স্বর্গারোহণের বৎসর সরস্বতী পূজার বিসর্জন দিনে বীরভূম হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। শৈলেশচন্দ্র আমার সঙ্গে ছিলেন। তখন জানিতাম না যে, ইহজীবনে সেই শেষ সাক্ষাৎ। রাজসিংহের নূতন সংস্করণের

কথা তুলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন তাঁহার মতে তাহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাকে তাহাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণে বোধহয় তাহা বুঝিতেছে না। স্নেহের শেষ চিহ্নস্বরূপ একখণ্ড পুস্তক উপহার দিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, যেন একটা সমালোচনা করি। আমারো সে বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সময়াভাবে নিজে আমি তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, সেই উপহৃত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াই যোগ্যতর সমালোচক "সাধনা"য় তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু তখন অন্তিম শয্যায়, সম্ভবতঃ পড়িতে পারেন নাই। এইখানে বলা ভাল যে মতবিরোধী সমালোচনা তাঁহার প্রীতিপ্রদ ছিল না, এ বিষয়ে তাঁহার কাছে অতি বড় পাণ্ডিত্য অথবা বন্ধুবাৎসল্যের কোনো মূল্য ছিল না। তাঁহার বন্ধুগণ সকলেই তাহা জানিতেন।

আমি বিদায় হইবার কিছু পূর্বে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আবার কিছু লিখব লিখব ভাবচি—কি লিখি বলতো?' আমি একটু হাসিয়া উপন্যাস লিখিতে বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বুঝিলেন যে, তাঁর ধর্মালোচনায় চেয়ে কাব্যালোচনার, আমি তখনো পক্ষপাতী। হাসিয়া উত্তর দিলেন, 'আমিও তাই স্থির করেছি, এবার একটা বৈদিককালের স্ত্রী-চরিত্র আঁকিব ঐ দেখ খাতা বেঁধেছি।' জানি না সে পাতায় তাঁহার অমর লেখনী-স্পর্শ হইয়াছিল কিনা।

বঙ্কিমচন্দ্র

কালীনাথ দত্ত

এক

বঙ্কিমচন্দ্র যখন বারুইপুর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়। তখন ইংরেজি ১৮৬৪ সাল। সে বৎসর ৫ই অক্টোবরের সাইক্লোনে (Cyclone) ঝড়ে ও জলপ্লাবনে ডায়মণ্ড হারবার, কুলপী, মুড়াগাছা, টেঙ্গরাবিচি, করঞ্জলী, গঙ্গাধরপুর, বাইশ-হাটা, মণিরটাট প্রভৃতি গ্রাম নষ্ট হইয়া যায়। প্রথমে ঝড়ে এ দেশের অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ভূমিসাৎ হইয়া যায়। পরে, কয়েকটি সমুদ্র-তরঙ্গ বঙ্গোপসাগর হইতে বাত্যাতাড়িত হইয়া আসিয়া সাগর-কূলবর্তী দক্ষিণ প্রান্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই দৈবদুর্ঘটনায় এ প্রদেশের বহু সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুঃসংবাদে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া কয়েকজন ধনশালী পারসী ও কতিপয় গবর্নমেণ্টের ইংরেজ কর্মচারী ও এ প্রদেশের জমিদারবর্গের কেহ কেহ যথোচিত সাহায্যদান করিয়া সত্বরই একটি প্রচুর ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করেন। বঙ্কিমবাবু তখন এই অর্থের কিয়দংশ লইয়া সাইক্লোন-পীড়িত লোকের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য আমাদের বাসগ্রাম মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি কয়েক ডোঙ্গা চাউল, ডাইল, চিঁড়া, লবণ, কয়েক পিপা সর্ষপ তৈল ও কয়েক থান পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যজাত সঙ্গে আমাকে লোকের অন্নাভাব ও পরিধেয়-কষ্ট দূর করিবার জন্য মন্ত্রেশ্বর নদের (হুগলী নদীর) পার্শ্ব-বর্তী টেঙ্গরাবিচি গ্রামের সন্নিহিত গঙ্গাধরপুরে পাঠান। দ্রব্যজাত রক্ষার জন্য, আমার সঙ্গে একজন বন্দুকধারী পুলিস কনস্টেবলও প্রেরিত হয়। গঙ্গাধরপুরে যাইবার সময় পথে দেখিলাম, বহু সংখ্যক শবদেহ খালে, বিলে, ধান্যক্ষেত্রে ভাসিতেছে, এবং পথের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মধ্যে ও বনে-জঙ্গলে, বৃক্ষোপরি ও ভূমিতলে ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, এবং চতুর্দিকে নরকের দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে। আমি যৎপরোনাস্তি কষ্টে সেই শবরাশি ও তৎতন্নিঃসৃত পূতি-গন্ধ-দূষিত বায়ুরাশি ভেদ করিয়া সমস্ত দিবারাত্রির পর গন্তব্যস্থান গঙ্গাধরপুরে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা সাতটা-আটটা। আমি সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র দুই-তিনশত অন্নবস্ত্রক্লিষ্ট লোক আমার দ্রব্যজাত আক্রমণ ও লুণ্ঠন

করিতে আসিল। এই সমস্ত দ্রব্যাদি আমি তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য আসিয়াছি। বণ্টনান্তেই চলিয়া যাইব, এই কথায় তাহারা প্রবোধিত ও স্থির হইতে পারিল না, আমি তখন পুলিসের বন্দুকটি লইয়া একটি ডোঙ্গার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এবং বলিলাম, 'যে-কেহ আমার ডোঙ্গা স্পর্শ করিতে সাহস করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ লইব।' ইহাতে তাহারা কিছু ভীত হইয়া অগত্যা আমার বণ্টন-প্রস্তাবে সম্মত হইল। আমি তিন-চারি দিন সেখানে থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি সপ্তাহের ব্যয়ের মতো প্রত্যেক পরিবারকে বণ্টন কবিয়া দিয়া মজিলপুবে ফিরিয়া আসিলাম। বঙ্কিমবাবুকে সমস্ত বিবরণ বলিলাম, এবং তাঁহাকে দ্রব্যাদিব হিসাব দিলাম। আমার কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই বঙ্কিমবাবু দুর্ভিক্ষ-কার্যের আধিক্য-প্রযুক্ত অল্পদিনের জন্য ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার ভার গ্রহণ করিলেন। ডায়মণ্ড হারবার হইতে আসিয়া বাবু হেমচন্দ্র কর বারুইপুরের ভার লইলেন, এবং দুর্ভিক্ষ-কার্যের জন্য মজিলপুরে আসিয়া অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। আমি দুর্ভিক্ষ কার্যে বঙ্কিমবাবুকে যেরূপ সাহায্য করিতেছিলাম, হেমবাবুকেও সেইরূপ সাহায্য করিতে লাগিলাম। সাইক্লোনের ফলে কেবল দুই মহকুমাই দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল।

এ সময় ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের নূতন রেজিস্টারি আইন অনুসারে মহকুমায় মহকুমায় নূতন রেজিস্টারি আফিস খোলা হইল। হেমবাবু আমাকে তাঁহার নূতন রেজিস্ট্রেশন আফিসের হেড-ক্লার্কের পদে নিযুক্ত করলেন। ইহার কিছু-দিন পরে বঙ্কিমবাবু বারুইপুরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং আমাকে কর্মে নিযুক্ত দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এই সময় হইতে আমি বঙ্কিমবাবুকে ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ ও অবসর পাইলাম। তিনি যে সকল ফৌজদারী মকদ্দমা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, ন্যায়পরতা ও স্বাভাবিক দয়ার্দ্র-চিত্ততা প্রকাশ পাইত। এই সমস্ত মকদ্দমার রায় তিনি অতি সুন্দর ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহার লিখিত রায়গুলি পড়িতে বড়ই ভালবাসিতাম, এবং সমস্তগুলিই পড়িতাম।

এই সময়ের পূর্ব হইতে তিনি "দুর্গেশনন্দিনী" লিখিতেছিলেন। এই সময় তাঁহাকে সর্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে তাঁহার Study ro m-এ প্রস্থান করিতেন। চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন না। "দুর্গেশনন্দিনী"র লেখা সমাপ্তপ্রায় হইলে, কিংবা মুদ্রিত হইবার প্রাক্কালে,

আমি তাঁহার পাঠকক্ষের টেবিলে কয়েক ভলুম স্কটের ওয়েবর্লি উপন্যাস সজ্জিত দেখি। তিনি হয় তো কোনো বন্ধুকে তাঁহাব "দুর্গেশনন্দিনী"র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিতে দেন, বন্ধু তাঁহাকে Ivanhoe' উপাখ্যান-ভাগেব সঙ্গে তাঁহাব পুস্তকেব উপাখ্যান-ভাগের অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে, বলিয়া থাকিবেন। তাহাতে তিনি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সম্ভবতঃ নূতন ওয়েবর্লি উপন্যাসাবলী বাজাব হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী বচিত হইবার পূর্বে তিনি "Ivanhoe" পডিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি ঠিক বলিবাব অধিকাবী নই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা সত্যেব অনুবোধে অবিকল প্রকাশ কবিলাম। আমি অগ্রে "দুর্গেশনন্দিনী" পাঠ কবি, তাহার অনেকদিন পরে Ivanhoe' অধ্যযন কবি। বলিতে কি, আমি উভয়েব সৌসাদৃশ্য দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। আমি ইহুদী বমণীব (Rebeca) চিত্র পাঠ কবিবাব সময় আয়েসাকে একটি মুহূর্তও ভুলিতে পাবি নাই। অন্যান্য পাঠকেবা দুর্গেশনন্দিনীব চিত্রাবলীকে "Ivanhoe" -ব ছায়া বলিয়া গ্রহণ কবিয়া থাকেন। Ivanhoe -ব ছাযা লইযা "দুর্গেশনন্দিনী" বচিত হয় নাই, ইহা বঙ্কিমবাবু নিজ মুখে শতবার ব্যক্ত কবিয়াছেন। আমাব নিজেব যাহাই ধাবণা হউক না, আমি বঙ্কিমবাবুব কথায় বিশ্বাস কবিযা সে ধাবণাকে অপসৃত কবিয়াছি। কেন না, আমি তাঁহার Honesty unimpeach ble বলিয়া বিশ্বাস কবি। বস্তুতঃ এ বিষযে তাঁহার কথায় বিশ্বাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যাহা হউক, দুর্গেশনন্দিনীব বিমলা যে সম্পূর্ণ একটি অভিনব সৃষ্টি, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বঙ্কিমবাবুব "দুর্গেশনন্দিনী" মুদ্রিত হইয়া আসিলে তিনি আমাকে একখণ্ড পডিতে দিলেন। পাঠান্তে পুস্তক সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাব পুস্তকের উপাখ্যানভাগের খুব প্রশংসা করিলাম এবং লেখাব সম্বন্ধে বলিলাম, পুস্তকের বাঙ্গালা ইংরেজির অনুবাদের ন্যায় বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু তখন আমার মন্তব্যে তাদৃশ তৃপ্তিলাভ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনের শেষ দশায় তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'আমার লেখা আজও রীতিমতো বাঙ্গালা হয় নাই। আজও দেখিতে পাই, স্থানে স্থানে যেন ইংরেজির অনুবাদ করিয়াছি।' তিনি আরও বলিলেন যে, 'এখনকার প্রায় সমস্ত ইংরেজি-শিক্ষিত লোকের বাঙ্গালার এই দোষ।'

তিনি এই দোষ কেবল শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় খুব কম দেখিতে পান। নগেন্দ্রবাবু কখনও কখনও "বঙ্গদর্শনে" লিখিতেন।

ইহাতে তাঁহার লেখার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর পরিচয় হয়। বঙ্কিমবাবু নগেন্দ্রবাবুর কোনো গ্রন্থ কখনো পাঠ করেন নাই। আমাদের বারুইপুরে অবস্থিতিকালে যখনই শারীরিক অস্বাস্থ্য নিবন্ধন বঙ্কিমবাবু মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নে অসমর্থ হইতেন, তখন আমাকে রাত্রিকালে ডাকিয়া পাঠাইতেন, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে আসিতে বলিয়াদিতেন। আমি উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে কোনো পুস্তক বিশেষ পড়িতে বলিতেন। আমি পড়িতাম, তিনি শ্রবণ করিতেন,এবং স্থল বিশেষে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। সন্ধ্যার পর ৭৷৷টা হইতে ১১৷৷টা পর্যন্ত তাঁহার পাঠের নিয়ম ছিল। আমি যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতাম, তাহা কখনই Light Reading ছিল না। তৎসমস্তই গভীর চিন্তাপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক। একখানি পুস্তকের বিষয়ে আমার স্মরণ আছে, তাহাতে Progressive Development of Species বিষয়ে লেখা ছিল। তিনি অধ্যয়নে অসমর্থ থাকিলে কদাপি আমার এরূপ সাহায্য গ্রহণ করিতেন না।

এ সময়ে বারুইপুরের সন্নিহিত রামনগর-নিবাসি ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষ সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং সেখানে থাকিয়া অল্পস্বল্প চিকিৎসা ব্যবসায়ও চালাইতেন। মহেশবাবু কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের একজন সুবিখ্যাত ছাত্র। তিনি ছাত্রাবস্থায় যেরূপ খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া তাদৃশ বিখ্যাত ডাক্তার হইতে পারেন নাই। তিনি কোনো একবৎসর কলেজের সাংবাৎসরিক পরীক্ষায় প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়া একটি সুন্দর অনুবীক্ষণ যন্ত্র পারিতোষিক-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন *। বঙ্কিমবাবুর সহিত মহেশবাবুর আলাপ হইবার পর মহেশবাবু সেই অনুবীক্ষণটি দিনকতকের জন্য বঙ্কিমবাবুর ব্যবহারার্থে প্রদান করেন। বঙ্কিমবাবু প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেই অণুবীক্ষণ সহযোগে কীটাণু, নানা পুষ্করিণীর দূষিত জল, উদ্ভিদের সূক্ষ্মভাগ, এবং জীবশোণিত প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থজাতীয় পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষার সময় আমিই তাঁহার একমাত্র নিত্যসঙ্গী থাকিতাম। পরীক্ষিত পদার্থনিচয়ের অপরূপশোভা-সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া তিনি আশ্চার্যান্বিত হইয়া বলিতেন, 'জগতের মধ্যে কেবল আমরাই কুৎ-সিৎ, আর আর সমস্তই সুন্দর।' এই সমস্ত পরীক্ষার সময় আমি কখনো তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির অপার উচ্ছ্বাস দেখি নাই; কখনো ঈশ্বরের নামগুণ শুনি নাই;

* বঙ্কিমবাবুর মুখে শুনিয়াছি, এই যন্ত্রটির মূল্য ৪০০/৫০০ টাকার নূন্যতম ছিল না।

বা ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনো পরিচয় কখনো পাই নাই। কিন্তু আমার অনুমান হয়, এই সকল অণুপ্রমাণ সৃষ্টির অপরূপ শোভা সৌন্দর্য প্রত্যক্ষগোচব করিবার সময় তাঁহার ভাবপ্রবণ অন্তরে বৈজ্ঞানিক-জাতীয় এক প্রকার ঈশ্বর-ভক্তির বীজ নিপতিত বা রোপিত হয়, যাহা তাঁহার প্রবীণ বয়সে অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া কথঞ্চিৎ সুন্দর বিকাশলাভ করিয়াছিল।

আমাদের বারুইপুবে অবস্থান সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাব সহিত তাঁহাব ঘনিষ্ঠতাব কতকটা পরিচয় পাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সময়ে সময়ে বারুইপুরে আসিয়া কনিষ্ঠের অতিথি হইতেন। উভয়ে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন। শ্যামাচরণবাবুতে জ্যেষ্ঠত্বের কোনো অভিমান দেখি নাই। বঙ্কিমবাবুতে কনিষ্ঠের কোনো সংস্কার অনুভব করি নাই। তাঁহারা ঠিক যেন পরস্পর পরস্পবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাদের আলাপেব মধ্যে কোনো লজ্জাসরম প্রকাশ পাইত না। সকল বিষয়ে পরস্পরে খোলাখুলি আলাপ ও আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। কোনো বিষয়ে গোপনেব প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন না।

ইহার অনেকদিন পূর্বে তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠ (মধ্যম) ভ্রাতা বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে "Rent Law" সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। লোকের মুখে শুনিতাম, এখানি বঙ্কিমবাবুরই রচিত। বঙ্কিমবাবু এই পুস্তিকার প্রশংসা শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। একবাব হাইকোর্টেব বিচারপতিদের "Rent Law" (১৮৫৯ খৃস্টাব্দের ১০ আইন) সম্বন্ধে প্রত্যেকের সুবিস্তীর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়া পুস্তিকাকারে বাহির হয়। সেই মন্তব্যের মধ্যে স্থানে স্থানে সঞ্জীববাবুর "Rent Law" সম্বন্ধীয় পুস্তিকা হইতে কোনো অংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু হাইকোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্য-পুস্তিকা প্রাপ্ত হইবামাত্র, তন্মধ্য হইতে সঞ্জীববাবুর পুস্তিকার উদ্‌ধৃত অংশগুলি খুঁজিয়া বাহির করিলেন, এবং আমাকে দেখাইলেন। এই যত্ন অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহ হইতেও বিকশিত হইতে পারে।

মধ্যে মধ্যে কবিবর বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও চব্বিশ পরগণার Assistant District Superintendent বাবু জগদীশনাথ রায় বঙ্কিমবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন, এবং সকলে কয়েকদিন অত্যন্ত আমোদ-আহ্লাদে থাকিতেন। ইহারা উভয়েই গবর্নমেন্ট কর্মচারী, এবং ছুটির সময় ভিন্ন প্রায়ই অপর সময়ে আসিতেন না। দীনবন্ধুবাবু বঙ্কিমবাবু অপেক্ষা দুই-চারি বৎসরের প্রবীণ হইবেন, এবং জগদীশবাবু তাঁহা অপেক্ষা আরো বার-চৌদ্দ বৎসর প্রবীণ

বয়স্ক। একবার বঙ্কিমবাবুর মজিলপুরে অবস্থিতিকালে একদিন এই বাবুদ্বয় রাত্রি আটটা সাড়ে-আটটার সময় গাড়ি করিয়া মজিলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু পূর্বাহ্নে তাঁহাদের আগমনের কোনো সংবাদ পাইয়াছিলেন কি না, জানি না। তিনি তখন তাঁহার প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অধ্যয়নে নিরত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্কিমবাবু যাহাতে তাঁহাদের গাড়ির শব্দ শুনিতে না পান এমন স্থানে গাড়ি হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বাসাবাটীর সম্মুখস্থ হইয়াই গান ধরিলেন, 'আমরা বাগবাজারের (মেথরানী)।' বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের ব্যঙ্গস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ ত্যাগ করিয়া বারান্দায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'কালুয়া! নিকাল দেও, কালুয়া নিকাল দেও!' এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া তাঁহার বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।

বঙ্কিমবাবুর এতগুলি সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত। আমি থিওডোর পার্কারের "Ten Sermons' নামক পুস্তকখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলাম। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, এবং সপ্তাহান্তে তাহা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, 'Such worst English I have never read.!' আমি পার্কারের লেখার ও ইংরেজির খুব ভক্ত ছিলাম। তাঁহাকে হেয়জ্ঞান-সূচক-মন্তব্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম।

এই সময়ে বঙ্কিমবাবু কি অপর হাকিমেরা যখন মজিলপুরে আসিতেন, তখন মজিলপুরস্থ বাবু হরমোহন দত্তের বৈঠকখানা বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। সে সময়ে হরমোহন দত্তের এস্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ছিল, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্রদ্বয় ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশনে বাস করিতেছিলেন।

এই সময়ের কিছুদিন পরে আমি বারুইপুর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। বঙ্কিমবাবু চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট বেনব্রিজ সাহেবের নিকট আমার অনেক প্রশংসা করেন, তাহাতে বেনব্রিজ সাহেব আমাকে বারাসতের সব ডিভিসন্যাল হেডক্লার্কের পদে মনোনীত করিয়া পাঠান। ইহার পর বঙ্কিমববুর সঙ্গে আমার অল্পই দেখা-সাক্ষাৎ হইত।

দুই

বঙ্কিমবাবুর বারুইপুরে অবস্থানকালে একটি দুর্ঘটনা হয়। তাহা অগ্রে লিপিবদ্ধ করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব। ইহাতে বঙ্কিমবাবুর কার্যতৎপরতা ও পরহিতৈষণার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

একদিন মধ্যাহ্নকালে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। বৃষ্টি অল্পক্ষণের মধ্যেই থামিয়া গেল। কিন্তু থামিতে-না-থামিতে ভয়ঙ্কর শব্দে একটি বজ্রপাত হইল। তাহার চারি-পাঁচ মিনিট পরে একটি লোক দৌড়িয়া আসিয়া কাছারিতে সংবাদ দিল, 'রাজকুমারবাবুর দ্বিতীয় পুত্র বজ্রাঘাতে গতায়ু হইয়াছে।' শুনিবামাত্র বঙ্কিমবাবু কাছারির সমস্ত কার্য ফেলিয়া রাজকুমারবাবুর বাটীর দিকে ধাবমান হইলেন। আমিও তাঁহার অনুগমন করিলাম। [এই রাজকুমারবাবু বারুইপুরের জমিদার রাজকুমার চৌধুরী। তাঁহার বাটী ফৌজদারী নূতন কাছারির পাঁচ-ছয় রশি তফাতে]। আমরা বজ্রাহত বাটীতে গিয়া দেখিলাম যে বজ্রটি গৃহসংস্কারে ব্যবহৃত একটি বাঁশের উপরেই নিপতিত হয়। বাঁশটি বজ্রাঘাতে শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে বিদ্যুদগ্নি আহত বাঁশটিকে পরিত্যাগ করিয়া সংলগ্ন দ্বিতল বাটীর উপরের ছাদের আলিশা আশ্রয় করিয়া, তাহা হইতে কিছুদূরে আসিয়া, ঘরের দেউল অবলম্বনে নীচের তলের একটি ঘরে নামিয়া আসে। নামিবার সময় দেউলের বালিকাম-চুনকাম অঙ্গুলিপ্রমাণ পরিসরে উপর হইতে বরাবর সোজা খসিয়া পড়িয়াছে। নীচের ঘরে তিনটি লোক দেওয়াল ঠেসান দিয়া একটি মাদুরে বসিয়া কি গল্প করিতেছিল। প্রধান বজ্রাহত মধ্যস্থলে ছিল। সেই বেচারাই তখনই মৃত্যুমুখে পড়ে। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান একুশ বৎসর হইবে। দ্বিতীয় বজ্রাহতটি সম্পর্কে রাজকুমারবাবুর ভাগিনেয়। এই যুবাটি তখন সেই মাদুরের উপরে ছটফট করিতেছিল।

তৃতীয় বজ্রাহতটি রাজকুমারবাবুর তৃতীয় পুত্র। ইনি তখন অনুমান ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক। ইনি সচেতন অবস্থায় এদিক ওদিক করিতেছিলেন। ইঁহার অঙ্গের উরুদেশে একটি ছড় দেখিলাম। ইনি তখনো তাহার জ্বালা অনুভব করিতেছিলেন। ছড়টি উরুদেশের ঊর্ধ্বস্থান হইতে পাদমূল পর্যন্ত নামিয়াছে। রাজকুমারবাবুর পরিবার মৃত পুত্রের মস্তক স্বকীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সেই ঘরের মধ্যস্থানে আবৃতা হইয়া মৃতের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। রাজকুমারবাবু সেই দিন প্রাতের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। মৃত পুত্রটির মাতা, পুত্রাঙ্গে কোনো বজ্রচিহ্ন না দেখিয়া হয় তো মনে করিতেছিলেন, পুত্রটি শুধু অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। মৃতের অঙ্গে সম্ভবতঃ কোনো চিহ্ন ছিল না। তাহার পরিধেয় বস্ত্রের কোনো স্থান দগ্ধ হয় নাই। কোমরের ঘুনসিটি যেমন, তেমনই রহিয়াছে। ঘুনসিতে চাবিটি যেমন ছিল, তেমনই আছে। বঙ্কিমবাবু চাবিটি গলিয়া পড়িবার আশঙ্কা করিতেছিলেন। বজ্রপাতকালে আহতের মস্তক পতন-চিহ্নিত স্থান হইতে এক বিঘতের কিছু

বেশি দূরত্ব ছিল। আমরা বজ্রাহত বাটীতে উপস্থিত হইবার পরক্ষণেই নিকটস্থ পাদরি সাহেব অশ্বারোহণে সেখানে উপস্থিত হইলেন। বঙ্কিমবাবু অবিলম্বে তাঁহাকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র ঘোষকে আনিবার জন্য রামনগরে প্রেরণ করিলেন, এবং কলিকাতা হইতে ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য, অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া রাজকুমারবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। এদিকে ডাক্তার মহেশচন্দ্র দণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুবাটির চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য নানা-বিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবুও ডাক্তারের সঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তার মহোদয়গণের কোনো চেষ্টা সফল হইল না। বজ্রটি বোধহয় আহতের মস্তিষ্কদেশের সন্নিধানে আসিয়া আন্দোলনেই তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত করিয়াছিল। ডাক্তারেরা অন্ততঃ তখন এই মন্তব্যে উপনীত হন।

আমি আমার নূতন কার্যে বারাসতে চলিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু কয়েক বৎসর পর্যন্ত বারুইপুরে অবস্থিত ছিলেন। তখন আমি যখনই বাটীতে আসিতাম, বারুইপুরে তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া আসিতাম না। তিনি সকল সময়ে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন--আদালতের কার্যের সময়েও তাঁহার সে ভাবের ব্যতিক্রম দেখি নাই।

দুর্ভিক্ষের অবস্থা পরিদর্শন উপলক্ষে বঙ্কিমবাবু একবার আলিপুর হইতে জয়নগর অঞ্চলে উপস্থিত হন, এবং বিষ্ণুপুরের ডাক-বাংলায় একরাত্রি অবস্থিতি করেন। পরদিন প্রাতে তিনি আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার সঙ্গে তদুপলক্ষে দেখা করেন। আমি তখন মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ার-ম্যান। মিউনিসিপালিটি হইতে দুটি দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুঘটনার বিবরণ আলি-পুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরিত হয়।

আমার সঙ্গে দেখা করিবার পরই বঙ্কিমবাবু বাইশহাটা গ্রামে দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যান। তাহার পূর্বদিন কয়েকজন পুলিস-কর্মচারী সেই গ্রামে গিয়া, যাহারা যথার্থই দুর্ভিক্ষগ্রস্থ, এবং অনা-হারে বা কদর্য দ্রব্যাদির আহারে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদিগকে অনুসন্ধান স্থল হইতে কৌশলে অনুপস্থিত করিয়াছিল; এবং যাহারা পুষ্টদেহ ও তৈলাক্ত-কলেবর, যাহাদের গায়ে দুর্ভিক্ষের বাতাস কিছুমাত্র লাগে নাই, পুলিস কেবল তাহাদিগকে অনুসন্ধান স্থলে উপস্থিত রাখিয়াছিল। ইহারাই পুলিস কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া বঙ্কিমবাবুর কাছে দুর্ভিক্ষের মায়া-কান্না

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, 'মশাই আমরা এবার খেতে না পেয়ে মরি, সরকার বাহাদুর এ সময় আমাদিগকে অন্ন দিয়া প্রাণে বাঁচান।' বঙ্কিমবাবু বাইশহাটা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার নিকট তাঁহার অনুসন্ধানের ফল আনুপূর্বিক বর্ণনা করেন। বঙ্কিমবাবু সত্য সত্যই পুলিশের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। যে-লোকটি তথায় দুর্ভিক্ষে মৃত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল, পুলিশের কৌশলে সে "রোগে ক্রমশঃ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে," অনুসন্ধানে এইরূপ প্রকাশ পাইল। বঙ্কিমবাবু তৎপরে বাইশহাটা হইতে ফিরিবার পথে জয়নগরের সন্নিহিত হাটপাড়া গ্রামে মৃত ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে আসিলেন। এ ব্যক্তি অবশ্যই দুর্ভিক্ষে "অনাহার-প্রযুক্ত মৃত" বলিয়া প্রমাণিত হইল। পুলিশের কোনো কৌশলজাল এখানে বিস্তারিত হয় নাই। যদি পুলিস-রিপোর্টে এই মৃত্যুবিবরণ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এখানে পুলিশের কোনো কৌশল-জাল বিস্তার করিবার কারণ ছিল না। অথবা, স্থানটি জয়নগর বাসীদের অত্যন্ত সন্নিহিত বলিয়া পুলিস এখানে কোনো চাতুরী করিবার অবসর পান নাই, বা সাহস করে নাই। বঙ্কিমবাবুর মুখে বাইশহাটার দুর্ভিক্ষ-বিবরণ শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। তাহা আমাদের সংগৃহীত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিমবাবু আলিপুরে ফিরিয়া গেলে আমি পুলিসের চাতুরী অবগত হইলাম। এরূপ চাতুরী-অবলম্বনে পুলিসের অন্য স্বার্থ ছিল না। উপরওয়ালা হাকিমদের ভয়েই তাহাদিগকে এই চাতুরী অগত্যা অবলম্বন করিতে হয়। অনেক সাহেব হাকিমদের কর্ণে দুর্ভিক্ষজনিত কষ্টের কথা বড়ই তিক্ত লাগে। থানার পুলিশ-রিপোর্ট একবার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা থাকিতে পুলিসের বড় সাহেব থানার দারোগার উপর বড়ই চটিয়া উঠেন। তাহাতে দারোগাটি মানসিক ও নৈতিক সাহসের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত খুব সতর্ক হইয়া যান। যখন চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্টেট সাহেব দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য বঙ্কিমবাবুকে এ অঞ্চলে পাঠাইলেন, তখন তাহাদের সহসা আশঙ্কা জন্মিল। যদি কোনো স্থানে দুর্ভিক্ষ প্রমাণিত হয়, আর যদি তাহারা পূর্বাহ্ণে উপরে সেই সংবাদ না দিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের উপর হাকিমদের সমস্ত তম্বী পড়িবারই কথা। দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিলেও পুলিসের দোষ, না দিলেও তাহাদের দোষ! সেই জন্য শেষে দুর্ভিক্ষ প্রতিপন্ন হইলে তাহাদের উপর পাছে কোনো দোষ পড়ে, তজ্জন্য পুলিশকে এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করিতে হয়। এরূপ স্থলে পুলিশের অবস্থা "ন যযৌ ন তস্থৌ", এগুলেও দোষ পেছুলেও দোষ।

বাইশহাটায় ও হাটপাড়ার দুর্ভিক্ষ ও তাহাতে অনাহাবে মৃতব্যক্তিদের অনুসন্ধানান্তে বঙ্কিমবাবু সেদিন মধ্যাহ্নে এখানকার সব-রেজিস্ট্রার রায় কমলা-পতি ঘোষাল বাহাদুরেব বাসায় স্নান আহাবাদি করেন। আমি বঙ্কিমবাবুব সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ করি। ঘোষাল মহাশয়েব নিবাস কাঁটালপাড়ায়। উভয়েব মধ্যে কুটুম্ব-সম্বন্ধ ছিল। উভয়ের কথাবার্তার মধ্যে জানিতে পারিলাম বঙ্কিমবাবু বাল্যকালে কমলাপতিবাবুব নিকট ইংরেজি পড়িতেন: আমার সঙ্গে বঙ্কিমবাবুব সেইখানেই তাঁহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। আমি পূর্বে "নবজীবন" পত্রে "বৈষ্ণব-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতাম। 'এখন আব কোনো প্রবন্ধ লিখি না কেন?' জিজ্ঞাসিলে আমি তদুত্তরে আমাব শারীরিক অস্বাস্থ্যের বিষয়ে—বলিলাম, 'লিখিতে গেলে আমার বহু-মূত্রেব পীড়া বাড়ে।' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'এরূপস্থলে না লেখাই ভাল।' 'শীঘ্র পেনসন লইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন'—এরূপ কথাও হইল। তিনি চিরকালই সাহেবদের গালাগালিব বড়ই ভয় করিতেন, এবং সর্বদাই বলিতেন, যে কোনো উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবাব উপযুক্ত আয় হইলে তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ কবেন। কথাটা এই, তিনি বহুদিন হইতে অনেক সাহেবকে কাজ শিখাইয়া এক প্রকার মানুষ করিয়া আসিতেছেন, তাহারা উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা স্থানে চলিয়া গেলেন। এখন যে সমস্ত তরুণবয়স্ক কার্যানভিজ্ঞ সাহেবেরা তাঁহার উপর হাকিম হইয়া আসিতেছে, তাহাবা আবার উল্টে তাঁহাকে কাজ শিখাইতে ও সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্যায়রূপে ধমক দিতে চায়, এবং তাহাতে শ্লাঘা জ্ঞান করে। এরূপ দুর্ব্যবহার এখন তাঁহার ক্রমে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রামাণিক সূত্রে অবগত হইয়াছি, একবার নাকি চব্বিশ পরগণার কোনো উদ্ধত ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমবাবুকে তাঁহার নিজ এজলাসেব মধ্যেই কর্কশ ভাষায় "বঙ্কিম!" বলিয়া ধমক দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। তাহাতে বঙ্কিমবাবু নাকি বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এবং বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,

'You should see, I am no longer "Bankim", now represent Her Majestiy's Law and Justice. You know, I can at once order your arrest and pass sufficient punishment for insulting Her Majesty's Court of Justice.'

ইহাতে সেই সাহেবটি অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া গেল। এইরূপে বঙ্কিমবাবু

পদের গৌরব রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবং শীঘ্র কার্য হইতে অবসৃত হইবেন, স্থির করিয়াছিলেন।

এই ঘোষাল মহাশয়ের বাসায় বঙ্কিমবাবু আমাকে আরও বলিয়াছিলেন যে, তিনি ইতিপূর্ব কয়েক বৎসর শুদ্ধ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন। দেহটা বড়ই অশুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাকে পবিত্র করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, আহার সম্বন্ধে এরূপ ব্রতাবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তিনি চিত্তশুদ্ধির জন্য দেহশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, এবং দেহশুদ্ধির জন্য সাত্ত্বিক আহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেন। অনেক ইংরেজি শিক্ষিতের নিকট হিন্দুর এই খাদ্যতত্ত্ব দুর্ভেদ্য সমস্যা হইয়া আছে। একদিন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও লেখকের সম্মুখে এবিষয়ে ঘোর প্রতিবাদ করেন, তাঁহারা এই মতকে ঘোর জড়বাদ (Materialism) বলিয়া মনে করিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বিখ্যাত বিবেকানন্দ স্বামীও এ মতের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রবল প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। খাদ্য-তত্ত্বের জ্ঞান না হইলে হিন্দুধর্মের প্রচার সত্য সত্যই বিড়ম্বনা।

পূর্বোক্ত ঘটনার সংঘটন-কালের দুই-এক বৎসর পূর্বে ইণ্টার ন্যাশন্যাল এগ্‌জিবিশন ক্ষেত্রে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার সহসা সাক্ষাৎ হয়। সে সময় তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে বলেন। আমি তখন কার্যগতিকে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ "নবজীবন" সম্পাদকবাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্কিমবাবু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বঙ্কিমবাবু কাহারও মুখে শুনিয়াছিলেন, আমি কোনো প্রকার যোগাভ্যাস করি। তৎসম্বন্ধে কথাবার্তা কহিবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই জন্যই অক্ষয়বাবু বঙ্কিমবাবু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তা কহিতে, আমার গুরুজনের বিশেষ নিষেধ-আজ্ঞা ছিল। আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে ও তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে অসমর্থ। ইহা আমি অক্ষয়বাবুর দ্বারা বঙ্কিমবাবুকে বলিয়া পাঠাইলাম। তার পর দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে রেজিস্টারি আফিসের বাটীতে আমাদের সেই দেখা। সেই দেখার সময় আমি বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার কলিকাতার বাটিতে গিয়া দেখা করিতে প্রতিশ্রুত হই। তদনুসারে যখন প্রথম দেখা করি। তখন বঙ্কিমবাবু পেন্‌সন লইয়া কলেজ স্ট্রীটে প্রতাপ চাটুর্যের গলির বাটীতে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় মধ্যে

মধ্যে কয়েকবার বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

প্রথম সাক্ষাতে তিনি আমাকে "কৃষ্ণ-চরিত্রে"র দ্বিতীয় সংস্করণ পড়িতে অনুরোধ করেন। আমি তাহা অধ্যয়ন করিবার সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বস্তুতঃ তাহা পাঠ করিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ-পরম্পরা অবলম্বন করিয়া মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত ও মৌলিক অংশ নির্দেশিত করেন, তাহাতে আমি তাঁহার বুদ্ধিসত্তা ও বিচারশক্তি দেখিয়া সত্য-সত্যই অবাক হই। কিন্তু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ-চরিত্র-স্থলে দাঁড় করাইবাব চেষ্টায় বঙ্কিমবাবু অতি অল্পই সিদ্ধকাম হইতে পারিয়াছেন। তবে এই পর্যন্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণের যে অনুচিত ধারণা ছিল, তাহার তিনি অনেকটা অপনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু লোকে যে এখন শ্রীকৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবুব আদর্শ-চরিত্র জ্ঞানে স্ব-স্ব গুরুপ্রণালী পরিত্যাগপূর্বক উপাসনা করিতে যাইবে, ইহা বঙ্কিমবাবুর ওরূপ চেষ্টা দ্বারা কোনো ক্রমেই সম্ভবপর নহে। সেরূপ চেষ্টাব দ্বারা শুদ্ধমাত্র কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক দোষ সাধারণের চিত্তবৃত্তি হইতে অপসারিত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা উপাসনার ভাব অভিনবভাবে লোকের অন্তরে উদ্দীপিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণোপাসোনাতে প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ হইয়া চৈতন্যপ্রভুর ন্যায় স্বয়ং বৈরাগ্যব্রত-গ্রহণানন্তর সাঙ্গোপাঙ্গে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া লোক মাতাইবার প্রয়োজন ছিল। এরূপ বৈরাগ্য ব্রতের অনুব্রতী হইয়া চেষ্টাপর হইতে পারিলে. এবং ভবিষ্যতে সেইরূপ বৈরাগ্য-ব্রতাবলম্বী উৎসাহী প্রচারক-দল স্বকীয় আদর্শে সংগঠিত করিয়া দেশবিদেশে ধর্মপ্রচার কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাঁহার অভিলাষ কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইবার আশা থাকিত। খৃস্ট-জগতে যেমন খৃস্টোপাসনা প্রচলিত হইয়াছে, এক্ষণে সেরূপ সর্বব্যাপী কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত হইবার আশা স্বভাবতঃই খুব অল্প। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এ পক্ষের চেষ্টাও এ পর্যন্ত এক প্রকার ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। অবশ্যই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কথা ঠিক করিয়া বলিবার কেহই আমরা অধিকারী নহি। ভগবানের সঙ্গে মানুষের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। শুদ্ধ নীতির আদর্শ সাধারণ মানুষের মনঃপূত হইবার নহে। এ সংসারে তা-বড় তা-বড় প্রচুর নীতির আদর্শ আছে। তাহারা কখনো কাহারো লক্ষ্য-স্থলে আইসে না। সাধারণ মানুষে একজন উপাসকের আদর্শ চান—একজন ভক্তের প্রতিচ্ছবি দেখিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রে ইহার কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাতে না ছিল বৈরাগ্য ও ভগবৎনির্ভর, না ছিল ভগবৎ-ভক্তি,

না ছিল ভগবৎ-প্রেম, না ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসের গভীরতা ও প্রশস্ততা। বঙ্কিম-বাবু তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রের এ অভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহারা "কৃষ্ণ-চরিত্র" পুস্তকের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমভক্তি করিবেন কাকে? এই প্রশ্ন উত্থাপন করায় তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি আরও দূরস্থিত ও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে যখন আমার এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়, তখন তিনি উপরি-উক্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন, এবং বলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসক বা ভক্ত-জীবনের সংবাদ-সংগ্রহের জন্য বিষ্ণু পুরাণাদি অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ উদঘাটন করিয়া কোনো কিছু পান নাই। আমি বলিলাম, 'বৈষ্ণব পূর্বাচার্যগণও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের এ অভাবটি বিলক্ষণ বুঝিতেন। এ জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জের টানিয়া শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে পরিণত করিয়া একটি সম্পূর্ণ আদর্শ-স্থানীয় করিতে কতকটা সফল হইয়াছেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বের, প্রতিভাব, বুদ্ধিমত্তার, তত্ত্বজ্ঞানের, নৈতিক অনুভূতির ও নিষ্ঠার অবতার, তাঁহাদের শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তির অবতার ও ভক্তের আদর্শস্থল। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি বৈরাগ্যের সম্পূর্ণ অভাব, এবং শ্রীগৌরাঙ্গে তাহার পূর্ণ বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তির, আস্থা বিশ্বাসের, নির্ভরের ও আনুগত্যের পূর্ণ অসদ্ভাব, শ্রীগৌরাঙ্গে তাহাদের পূর্ণ অভিব্যক্তি। বৈষ্ণব পূর্বাচার্যগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ, উভয়ের একীকরণে একটি পূর্ণ আদর্শ-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণে তাহা কুলায় নাই, শুদ্ধ গৌরাঙ্গেও তাহা কুলায় নাই। যেমন তাঁহাদের রাধা ও কৃষ্ণ লইয়া একটি সত্তাসৃষ্টি, তেমনই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ লইয়া একটি সত্তার স্ফূর্তি।

নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধাস্পদ বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার একদিন বঙ্কিমবাবুকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে বৈরাগ্যের অভাবের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্যহীন জীবন কিরূপে লোকের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবে? একথায় বঙ্কিমবাবু প্রায় নিরুত্তর হন। বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ ধর্মসংস্থাপক মাত্রই বিরাগী। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যপ্রভু বৈরাগ্যে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থল। ঈশা, মহম্মদ, নানকও বৈরাগ্যের বড় সামান্য দৃষ্টান্তস্থল নহেন। ভারতের সমস্ত ধর্ম-সংস্থাপকেরাই সন্ন্যাসী। এক বুদ্ধদেব ব্যতীত ইঁহারা সকলেই ভক্ত-বিশ্বাসী। বুদ্ধ-চরিত্রে ভক্তি বিশ্বাসের অভাব কেবলমাত্র এক বৈরাগ্য দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। এই সকল কথাবার্তার সময় বঙ্কিমবাবু কখনো অনর্থক বাগবিতণ্ডার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেন না। ইহা তাঁহার গভীর সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

একদিন আমি কথা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম যে, আপনি কৃষ্ণ-চরিত্রকে দুরপনেয় কলঙ্করাশির আবর্জনা হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য অবশ্যই আপনি বর্তমানের, বিশেষতঃ ভবিষ্যতের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনার চেষ্টা প্রথম ও সর্বাগ্রবর্তী নহে। আপনার পূর্বে স্বামীজী শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী ও বিষয়ে প্রথম চেষ্টাপর হন। তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের দল হইতে "ধর্মতত্ত্ব" পত্রিকায় একবার কৃষ্ণ-চরিত্র উদ্ধারের চেষ্টা হয়। বঙ্কিমবাবু এ বিষয়ের কোনো সংবাদ অবগত ছিলেন না। এ বিষয়ে আমিই তাঁহার প্রথম সংবাদদাতা।

এতদ্দ্বারা এবং আরো নানাবিষয়িণী কথা দ্বারা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা গিয়াছিল যে, বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্যের, বিশেষত, ধর্ম-সাহিত্যের কোনো ধারই ধারিতেন না, এবং কোনো সংবাদই লইতেন না। ইহা তাঁহার ন্যায় একজন ধর্মনেতা ও বঙ্গসাহিত্য-পোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব। তিনিই কেবল তাঁহার সময়ে বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বাস্তবিক স্যামুয়েল জন্‌সনের স্থানীয় ছিলেন। যদি তিনি বাঙ্গালার প্রচলিত সাহিত্যেব রীতিমতো তত্ত্ব লইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের পক্ষে বড়ই মঙ্গলের হইত।

বঙ্কিমবাবু পুত্র-সৌভাগ্য-লাভ করিতে পারেন নাই। কন্যা দৌহিত্র লইয়াই তাঁহার সংসার। দৌহিত্রদিগের সঙ্গে তিনি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রটিকে হারমোনিয়ম বাজাইতে ও তৎসঙ্গে গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, তাহাদের সঙ্গে খুব বন্ধুভাবে মেশামিশি না করিলে তাহারা অন্যত্র বন্ধু অন্বেষণ করিতে বাধ্য হইবে। অন্য সঙ্গে নষ্ট বা বিকৃত হইবার বাধা কি? একদিন তাঁহার যুবক দৌহিত্রটিকে ডাকিয়া আমাকে তাহার গান-বাদ্য শুনাইলেন।

তিন

একদিন বঙ্কিমবাবুর বাসায় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছি, পথিমধ্যে এক জন একখানি হ্যাণ্ডবিল আমার হস্তে অর্পণ করিল। তাহাতে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের শিকাগো মহামেলা হইতে প্রত্যাগমন উপলক্ষে হাবড়ায় রেলওয়ে স্টেশনে তাঁহাকে সম্মাননা ও অভ্যর্থনার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি সেখানি বঙ্কিমবাবুকে দেখিতে দিলাম। বঙ্কিমবাবু তাঁহার অভ্যর্থনার্থ যথাসময়ে তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইলেন, এবং আমাকে

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। অভ্যর্থনার দিন এক মাঘের একাদশ দিবস। আমি বলিলাম যে, আমার শরীরে কোনো প্রকার হিম সহ্য হয় না, আমি ইচ্ছাসত্ত্বেও অভ্যর্থনা স্থলে উপস্থিত থাকিতে পারিব না। তাহাতে বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে, 'আমার কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। আমার খুবই হিম সহ্য হয়, কিন্তু রৌদ্র আদবেই সহ্য হয় না। একটু রৌদ্র গায়ে লাগিলে আমার দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে।' একদিন দেখিলাম তাঁহার যুবক দৌহিত্র সে দিন বিকালে প্রথম শ্বশুরালয়ে গমন করিবে—তিনি দৌহিত্রটিকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন। গাড়িটি তাঁহার বাটীর বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল, এবং দৌহিত্রটিকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে দুই-চারি মিনিটের অধিক সময়ও লাগিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি বঙ্কিমবাবু ছত্রহস্তে তাহার অনুগমন করিলেন, এবং ছত্রটি খুলিয়া পশ্চিমাভিমুখে বহির্দ্বারে রৌদ্র হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন। বঙ্কিমবাবু রৌদ্র হইতে এত সতর্ক হইতেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্তা হয়। রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁহার উপযুক্ত শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব ছিল। আমি উক্ত মহাত্মার কোনো গুণ কীর্তন করিলে, তিনি তাহাতে বড় একটা অনুমোদন প্রকাশ করিতেন না। উক্ত মহানুভব পুরুষ নিজের লেখায় বা কথায় কখনো কোনো প্রচলিত উপাস্য দেবদেবীর প্রতি বা প্রচলিত শাস্ত্রসমূহের প্রতি কোনো প্রকার অবজ্ঞা বা অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই। একথা বলাতে বঙ্কিমবাবু তাহাতে সায় না দিয়া কতকগুলি খৃষ্টীয় পুস্তিকা বাহির করিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় "Quatations from the writings of Ram Mohan Roy" উদ্ধৃত ছিল। তাহার একস্থানে দেবদেবীর যথেষ্ট নিন্দাবাদ দেখিলাম। কালীমূর্তির বর্ণনায় উক্ত মহাত্মা যে কেবল শ্রদ্ধার অভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তা নয়, গভীর অশ্রদ্ধাও দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। সে সমস্ত পাঠ করিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলাম যে, 'হয় তো এই সমস্ত লেখা রাজার অপরিপক্ক বয়সের। রাজা যে সময়ে তাঁহার "Appeals to the Christian Public" প্রকাশ করেন, কিংবা আরো পরিপক্কতর বয়সে যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজের সুবিখ্যাত Trust Deed পত্র প্রকাশ করেন। সে সময়ে নিশ্চয়ই দেবদেবীগণকে এরূপ নিন্দাবাদ করিবার প্রবৃত্তি রাজার মন সম্পূর্ণ সংযত হইয়া আসিয়াছিল। সে সময়ে রাজার লেখাতে

দেশপ্রচলিত শাস্ত্রের ও লোকের উপাস্য দেবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি বক্তব্য প্রকাশ করিতেন।

নববিধান-প্রবর্তক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমবাবু একজন প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি (Genius) মনে করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নের সময় দুইজনে এক শ্রেণীতে পড়িতেন। কলেজ ছাড়িয়া কেশবচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রেই দেশবিখ্যাত হইয়া পড়েন। আমি তখন বারুইপুরে অল্পদিন মাত্র বঙ্কিমবাবুর অধীন আছি—যখন তাঁহার "দুর্গেশনন্দিনী" আলোকের মুখদর্শন পর্যন্ত করে নাই—তখন তাঁহার যশঃসূর্যের অরুণোদয়ের লেশমাত্রও পরিদৃশ্যমান হয় নাই, সেই সময় কলিকাতার কোনো স্থলে একদিন কেশববাবুর সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সাক্ষাৎ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, 'I wish to know how far you have out gone me'. একথা কেশববাবুর নিজ মুখেই শুনিয়াছি, সে সময় কেশববাবুর জিজ্ঞাসা মতে আমার সম্বন্ধেও বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্তা হয়। সে কথা যাউক, বঙ্কিমবাবু কোনো ক্রমেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে তাঁহার প্রবর্তক মহাশয়ের সঙ্গে তুলনীয় মনে করিতেন না। এই কথাবার্তার সময় প্রতাপবাবু শিকাগো মহামেলা উপলক্ষে আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে প্রতাপবাবুর বক্তৃতাদি সে দেশের, এ দেশের ও অন্যান্য সভ্য দেশের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিতেছিল। তিনি প্রতাপবাবুর লেখা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার কাছে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, 'প্রতাপবাবু গুছিয়ে-গাছিয়ে বেশ ইংরেজি বলিতে ও লিখিতে পারেন, এবং শেষে যাহা দাঁড় করান তাহাও মন্দ হয় না, বরং ভালই হয়। As a leading power failure, নেতৃত্বশক্তি বিষয়ে তিনি প্রতাপবাবুকে সম্পূর্ণ Failure ; বা অক্ষম বলিয়া বিবেচনা করেন। কেশববাবুরও Leading power তাঁহার মতে খুব বেশি ছিল না, তিনি বলিলেন যে, 'অনেক সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়া কেশববাবু যে অনুগামী দল তাঁহার ধর্মপ্রচারের জন্য সৃষ্টি করিয়া যান, তিনি মানবলীলা সংবরণ করিতে-না-করিতে সেই অসংসক্ত দলটি বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার গঠন-দৌর্বল্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।' আমি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলিলাম যে, 'কেশববাবুর অনুবর্তী প্রচারকদলে অনেকগুলি নিষ্ঠাবান, শ্রদ্ধাস্পদ ও সাধুচরিত্র লোক আছেন, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ ও ধর্মানুরাগ সমধিক প্রশংসনীয়। তাঁহাদের প্রচার-চেষ্টা সমস্তই যে ব্যর্থ হইবে,

তাহা মনে হয় না। তাঁহারা একদিন কেশববাবুর নাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারেন।' এ কথায় তিনি বলিলেন, 'কালীনাথ, তুমি কখনো মনে স্থান দিও না যে, ও দল আর কখনো মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। উহার যে অবসাদ-দশা এখন উপস্থিত হইয়াছে, সে দশার আর কখনো প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।'

শ্রদ্ধাস্পদ গৌরগোবিন্দ রায়ের "কৃষ্ণচরিত্র" সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, 'গৌরবাবু একজন সুপণ্ডিত লোক; শাস্ত্রাদিতে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। এ জন্য তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যেমন ঘটনাপূর্ণ হইয়াছে, তেমনই যুক্তি দ্বারা তিনি সেই সমস্ত ঘটনাবলীর বাস্তবিকতা ও শাস্ত্রোদ্‌ধৃত বাক্যের মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই।'

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু একদিন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, তিনি সাধু ভাষায় শব্দ বিন্যাস করিতে করিতে সহসা এক-আধটি প্রচলিত ইতর শব্দ স্বেচ্ছাপূর্বক তন্মধ্যে ব্যবহার করিয়া ভাষার লালিত্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। দাদার লিখন-প্রণালীর সমর্থন করিবার জন্য কবিবর বাবু রবীন্দ্রনাথ একদিন বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা করিয়াছিলেন।

সঞ্জীববাবু। "বঙ্কিমবাবুর মধ্যম ভ্রাতা" "জাল প্রতাপচাঁদ" অভিধেয় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচন্দ্রের "প্রতাপচাঁদ" নামক একটি পুত্র ছিলেন। তিনি কোনো কারণে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পিতার রাজত্বকালে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যান। তজ্জন্য তিলকচন্দ্র মহাতাপচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া রাজত্ব-রক্ষার ভার নাবালক মহাতাপচন্দ্রের জন্মদাতা গোপালবাবুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। কিছুকাল পরে "প্রতাপচাঁদ"-নামধারী কোনো ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বর্ধমান রাজসম্পত্তির (claimant) উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচয় দেন। এই পরিচয় দিবার পর নামধারীকে কোনো মকর্দমা উপস্থিত করিবার অবসর দেওয়া হইল না। নাবালক রাজের অভিভাবক গোপালবাবু বর্ধমান এস্টেটের বিপুল অর্থ-ভাণ্ডার অকাতরে ও মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া নামধারী দায়াদ ও তাহার পক্ষীয় লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত ও পর্যুদস্ত করিয়া উড়াইয়া দেন। নাম-ধারী কোথাও দাঁড়াইবার ভূমি পান নাই। সঞ্জীববাবু এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার পুস্তকখানি প্রচার করেন। এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, 'মেজদাদা জনপ্রবাদ বা জনশ্রুতির উপর অবিচারে

বিশ্বাস করিয়া তাঁহার পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। আখ্যায়িকায় বর্ণিত ঘটনা-পুঞ্জের ঐতিহাসিক মূল তিনি অতি অল্পই অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। আমার খুব বাল্যকালে এই নামধারীর আখ্যান জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তাঁহার মুখে শুনিতাম, এবং সহানুভূতিতে কাঁদিয়া গণ্ডস্থল ভাসাইতাম।' আমি বলিলাম যে, 'দায়াদের যখন বহুতর ভূম্যধিকারী সহায় থাকিতে এবং খ্যাত-নামা জনসাধারণ-হিতৈষী ডেভিড হেয়ার সাহেবের ন্যায় ব্যক্তিগত অভিন্নত্বের (Identity) সাক্ষী সকল থাকিতেও দেওয়ানী আদালতে তাঁহাকে মকদ্দমা রুজু করিতে ও রাজকীয় ও অন্যদীয় পক্ষ হইতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল, তখন নামধারীর প্রতি অত্যাচারের গুরুত্ব আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।'

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়োঁ বোনাপার্ট সম্বন্ধে আমি বঙ্কিমবাবুর মত জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে বিষয়ে ইংরাজি কুসংস্কার (English prejudice) পূর্ণমাত্রায় তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে আধিপত্য করিতেছে। তিনি উক্ত মহাত্মার প্রতি "নৃশংশ" ভিন্ন কোমলতর আখ্যা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বোধহয় সার ওয়াল্টার স্কট, বুরিন, আলিসন প্রভৃতি বিপক্ষ-বৃন্দের জীবনচরিত ও ইতিবৃত্ত সমূহ পাঠ করিয়া, মনোমধ্যে এই ঘোর অমূলক কু-সংস্কারকে বদ্ধমূল হইতে দিয়া থাকিবেন। লাকেশ, হাজলিট, আবট, কর্নেল নেপিয়ার, শ্লোন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থের প্রতি বেশি মনোযোগ দেন নাই।

বঙ্কিমবাবু ইয়ুরোপীয় ও অপর বিদেশীয় লোকের মুখে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ ও তাহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করা ভারতবাসীর পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনা মনে করিতেন। এ জন্য তিনি আনি বেসাণ্ট প্রভৃতির বক্তৃতাদির প্রতি কোনো অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই। বরং তিনি শ্রদ্ধাস্পদ শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি দেশীয় পণ্ডিত-গণের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও বক্তৃতাদির প্রতি আকর্ষণ দেখাইয়াছিলেন।

বঙ্কিমবাবু একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'এখন সিদ্ধযোগী পাওয়া যায় কি না?' আমি উত্তরে বলিলাম, 'সিদ্ধযোগী অবশ্যই পাওয়া যায় কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাঁহাদের দর্শনলাভ বা তাঁহাদের উপদেশলাভ ঘটিয়া উঠে না। তজ্জন্য পাত্রের সৌভাগ্য ও সুকৃতির অপেক্ষা করে।' "যোগ" সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার বাক্যালাপের নিষেধাজ্ঞা ছিল, তিনি তাহা জানিতেন। এ জন্য সে সম্বন্ধে কোনো কথা আমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করেন নাই। যদিও প্রথমে এই জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'কালীনাথ! তুমি কোনো

প্রকার মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস কর কি না ?' আমি বলিলাম, 'আমি খুব বিশ্বাস করি। আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন। তিনি ময়মনসিংহের অন্তর্বর্তী মুক্তাগাছার একজন জমিদার। কামাখ্যা হইতে একটি ব্রাহ্মণ তনয় অনেক মন্ত্রাদি শিখিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমার বন্ধুটি তাঁহার কাছে তৎ-শিক্ষিত কোনো মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-পরিচয় দেখিতে চান। তাহাতে ব্রাহ্মণ তনয় একটি উদ্ভিদ-লতার উপর তাঁহার শিক্ষিত মন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ করিলেন। মন্ত্র-শক্তি-বলে লতাটি যে দিকে ছিল, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আসিয়া স্থির হইল।' আমার কথা শেষ হইবামাত্র বঙ্কিমবাবু বলিয়া উঠিলেন যে, তিনি ঠিক ঐ মন্ত্রটি জানেন। সেই মন্ত্রটি কোনো মানুষের প্রতি প্রয়োগ করিলেও মানুষের মন মন্ত্র-প্রযোক্তার ইচ্ছার বশীভূত হয়। তিনি এই মন্ত্রটিব কোনো বিপবীত ফল ফলিবার আশঙ্কায় সকলকে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইতেন না। তবে হাকিম বা সাহেব বশীভূত করিবাব জন্য তিনি অনেক লোককে মন্ত্রের প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। একবার মাত্র তিনি কোনো হতভাগিনী রমণীকে তাঁহার অননুরক্ত স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য মন্ত্রটির প্রয়োগ শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই হতভাগিনী সেই মন্ত্রটি তদীয় স্বামীর প্রতি প্রয়োগ না করিয়া তাহাব অযথা অপব্যবহার করে। মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে আরো অনেক কথা হয। সন্দেহ ও অবিশ্বাসে মন্ত্র-শক্তির ফলোপদায়িতা যেরূপ নষ্ট হয়, আমি তাহার একটি ঘটনা বিবৃত করিলাম। ঘটনাটি আমি শ্রীমৎ অচলানন্দ তীর্থস্বামীর প্রমুখাত শ্রবণ করি। স্বামীজীর পূর্বাশ্রম উত্তবপাড়ার সন্নিহিত কোত্‌রং গ্রাম। সেই আশ্রম খ্যাত-নামা রামকুমার বাবাজীর। বাবাজী অবশ্য তাঁহার পদবী নহে। তবে "বাবাজী" শব্দ লোকে তাঁহার "পদবী"-রূপে প্রয়োগ করিত। স্বামীজী যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার পিতৃদেবের নিকট বৃশ্চিক-দংশন আরোগ্যের একটি মন্ত্র পান। সেই মন্ত্রটি পাইবার জন্য স্বামীজী পূর্ব হইতে বড়ই আগ্রহান্বিত ছিলেন। কিন্তু পিতৃদেবের নিকট সে আগ্রহ কখনো প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার পিতৃদেব মন্ত্রোচ্চারণান্তে দষ্টস্থানে থু থু করিয়া তিনবার থুৎকার করিতেন। সেই অব্যর্থ মন্ত্রশক্তির বলে, যাহারা আসিত, সকলেই সকল সময় আরোগ্য লাভ করিত। দৈবযোগে একদিন স্বামীজীর মাতামহী বৃশ্চিক-দষ্ট হন। সেই দংশনে বা হুলাঘাতে মাতামহীকে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। দংশন রোগিণীর জামাতা হওয়ায় স্বামীজীর পিতৃদেব

আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দষ্টস্থানে ফুৎকারের সহিত মন্ত্র প্রয়োগ করিতে না পারিয়া, অগত্যা স্বামীজীকে ডাকিয়া প্রয়োগের কৌশল সহিত মন্ত্র দীক্ষা দিলেন, এবং স্বামীজীকে তাহা তাহার মাতামহীর দষ্টস্থানে যথাবিধানে প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। প্রয়োগমাত্রই মাতামহীর অসহ্য যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া গেল। স্বামীজী তৎপরে শত শত লোককে সেই মন্ত্রবলে আরোগ্য করেন। একদিন মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পিতৃদত্ত বৃশ্চিক-দংশন আরোগ্যের মন্ত্রের সফলতার কথা বলেন। তাহাতে ছাত্রদের মধ্যে কেহ বলিল যে, হয় তো সুদ্ধ ফুৎকারে আরোগ্য হয়; মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই নহে। এই কথাতে স্বামীজী পরে তাঁহার মন্ত্র সম্বন্ধে নিজের মূঢ় বিশ্বাসটি পরীক্ষা করিবার জন্য কানো ব্যক্তির দষ্টস্থানে বিনা মন্ত্রোচ্চারণে কেবল শুদ্ধ ফুৎকার দিলেন। তাহাতে জ্বালা নিবারিত হইল না দেখিয়া সেবার তিনি যথারীতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফুৎকার দিলেন, তাহাতেও কোনো উপকার দর্শিল না। তারপর স্বামীজীর সে মন্ত্র চিরকালের তরে অসিদ্ধ হইয়া গেল। ইতিপূর্বে তাঁহার মন্ত্র-প্রয়োগ কদাপি বিফল হয় নাই। এই ঘটনাটি দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে মন্ত্রটির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানকৃত পরীক্ষাপেক্ষা মূঢ় বিশ্বাসের অধিকতর পক্ষপাতিনী।

এই কথার পর Magnetism will power ও গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আরো অনেক কথা হইল। নিম্নে তাহার স্থূল মন্তব্য অভিব্যক্ত হইতেছে। আমাদের উভয়ের মতেই মন্তব্যগুলি স্থিরীকৃত হয়।

(ক) সুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে রোগাদি আরোগ্য হয়; এবং হইতে পারে, কিন্তু সে শক্তি সকল সময়ে স্থায়ী নহে। প্রয়োগ কর্তারই (Magnetiser-এর) শরীর ও মনের বল ও স্বাস্থ্যের উপর তাহার সাফল্য নির্ভর করে। প্রয়োগ-কর্তার প্রয়োগাধীন ব্যক্তি (Subject) অপেক্ষা অধিকতর মহাজনভাবাপন্ন (more positive) হওয়া চাই। পক্ষান্তরে, এই ইচ্ছাশক্তি কোথাও কখনো (absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ নহে। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—তাঁহার নিজেরো যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি আছে। অতি অল্পস্থলেই তিনি তাহার প্রয়োগ করেন। এই ইচ্ছাশক্তির সমধিক প্রয়োগ ও ব্যবহারে তাহার উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেহগত স্বাস্থ্য ও বলক্ষয় প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

(খ) গুরুদত্ত মন্ত্রশক্তি, মন্ত্রদাতার উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি না থাকিলে

এবং তাঁহার আজ্ঞার উপর সমধিক নিষ্ঠা (Implicit obedience) না থাকিলে, কোথাও ফলদায়ী হয় না। মন্ত্র প্রয়োগকালে মন্ত্রদাতাকে স্মরণ করিতে হয়, এবং আপনার শক্তি-সাধ্যের অহঙ্কার বিস্মৃত হইয়া মন্ত্রদাতার শক্তি সাধ্যের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হয়। যথানিয়মে প্রযুক্ত মন্ত্রশক্তি স্থল স্থলেই (absolute) অব্যর্থ ও অমোঘ। ইহা কোথাও নিষ্ফল হয় না ইহার যথেষ্ট ব্যবহারে শরীরের বলক্ষয় হয় না, ইচ্ছাশক্তিরও সাহায্য লইতে হয় না, প্রয়োগকালে যে মনের বল উপস্থিত হয়, তাহা আপনা হইতে অতি সহজে শুদ্ধ মন্ত্রের বলে উপস্থিত হয়। এই মন্ত্রশক্তি শুদ্ধ ভক্তির বলে ফলোপদায়ী হইয়া থাকে। ইচ্ছা শক্তির স্থলে যেমন নিজের মনের বলই সহায়, গুরুদত্ত মন্ত্র শক্তির স্থলে তেমনই শুদ্ধ দৈব বলই সম্বল। ইচ্ছাশক্তি কাহাকেও কখনো প্রদান করা যায় না, কিন্তু মন্ত্রশক্তি গুরু-প্রণালী-ক্রমে অনায়াসে উপযুক্ত পাত্রে সর্বদাই প্রদত্ত হইতে পারে।

এইকথা শেষ হইতে-না-হইতে বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে তাঁহার দুইজন মন্ত্র-শিষ্য আছেন। তাঁহারা তাঁহার প্রণালীক্রমে ইষ্টোপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি শিষ্যদ্বয়ের ভক্তিবিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাঁহার পূর্বোক্ত আকর্ষণী মন্ত্রটি তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন। এই শিষ্যদ্বয় বঙ্কিম-বাবুরই উপাসনা-প্রণালীর অনুগত। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং-প্রচলিত গুরু-প্রণালী-ক্রমে ইষ্টোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের কৃত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয় যে উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া যান, তাহাই বর্তমান সময়ের ব্রাহ্মণদিগের অবলম্বন হইয়াছে। ভট্টাচার্য মহোদয় যে সমস্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে স্তোত্র, শ্লোক ও মন্ত্র-ভাগ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত করেন, বঙ্কিমবাবু সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্তোত্র ও শ্লোকাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিজের উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করিয়া নিজে তাহা অবলম্বন করেন, এবং শিষ্যদ্বয়ে তাহা প্রবর্তিত করেন। সঙ্কল্পিত পরীক্ষান্তে এই শিষ্যদ্বয়কে তাঁহার আকর্ষণী মন্ত্র শিক্ষা দিতে পারিয়াছিলেন কি না, এবং আমার সঙ্গে এই আলাপের পরে আরও অধিক মন্ত্রশিষ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু এ কথাবার্তার পাঁচ-ছয় মাস পরে তাঁহার জীবনলীলা সম্বরণ করেন।

তিনি একদা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের উপাসনার সময় সম্যকরূপে মনঃস্থির করিতে পারেন না। কোনো বিশেষ শব্দ, বা লোকের

কথাবার্তা, বা বালকদিগের অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, তাঁহার চিত্তবৃত্তি অস্থির হইয়া উঠে। এমন কি, উপাসনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাকে উপাসনায় ভঙ্গ দিয়া, ব্যাপারটা কি, তাহা উঠিয়া দেখিয়া সাময়িক কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হয়। আমি বলিলাম যে, পরিবারস্থ সকলেব প্রতি আত্যন্তিক ভালবাসা বা মায়া থাকাতে সর্বদাই তাঁহাকে চঞ্চল করে, এবং তাঁহাব উপাসনায় বাধা জন্মায়। কে কোথায় পড়িয়া গেল, কে কোথা হইতে কোনো ব্যথা পাইল, কোন্ দিক হইতে কোন্ আপদ আসিয়া উপস্থিত হইল, এই সমস্ত মায়িক আশঙ্কা মনোমধ্যে সর্বদা উদিত হইয়া তাঁহাকে চতুর্দিকে আকর্ষন কবিতে থাকে, এবং বিক্ষেপ জন্মায়। তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে স্নেহার্দ্রতা হইতে একটু কঠিন কবিয়া না তুলিলে স্থিরচিত্তে তাঁহার উপাসনা হওয়া এক প্রকাব অসম্ভব। তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা যে তাঁহার উপাসনার বাধা, এ কথা তিনি অস্বীকার করিলেন না। মনের বশীকরণ-শক্তির অসদ্ভাবই যে অধিকাংশ উপাসকেব বাধা হইয়া আছে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই চাঞ্চল্য নিবাবণার্থ বহুতব সাধককে অষ্টাঙ্গ যোগাদি অভ্যাস কবিতে হয়। অবশ্যই কোনো প্রকার যোগের কথা আমি তাঁহাকে বলি নাই, এবং নিষেধ ছিল বলিয়া আমি তাঁহাকে বলিতে পারি নাই। তাঁহার চিত্তবৃত্তির অস্থিবতার আব একটি কারণ তখন আমার মনে হইয়াছিল। কিন্তু পাছে সে কথা বলিলে তাঁহার মনে ব্যথা লাগে, তজ্জন্য তখন তাহা তাঁহাকে বলিতে বিবত ছিলাম। সে কাবণটি উপাসনা সম্বন্ধ গুরুপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নিজের উপাসনাব জন্য নিজকৃত প্রণালীব অবলম্বন। বঙ্কিমবাবু যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজে উপাসনা করিতেন, সেই উপাসনার মূলে গুরুদীক্ষা বা গুরুভক্তির সাহায্য ছিল না তাঁহাব আজ্ঞা-জনিত নিষ্ঠার সম্ভাব ছিল না। এইজন্য কাহারো আপনাকে আপনার গুরু-স্থানীয়-রূপে-বরণ কবা বিধেয় হয় না। যে দৈব বা অদৃশ্য শক্তি (Providence) গুরু-প্রণালীর মূলে বর্তমান থাকিয়া তাঁহাব প্রাণও সহায় হইয়া আছেন, আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিলে, সে সাহায্য-প্রস্রবণ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্কিমবাবু সেই সাহায্য-স্রোত হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বাহা—যে শক্তি শুদ্ধ Rationalism-এর—বৌদ্ধভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহাই কেবল তাঁহার সহায় ছিল। এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তির পূর্ব-বর্ণিত-রূপ বিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য।

বঙ্কিমবাবু যেরূপ স্বকীয় বা স্বকৃত উপাসনা-প্রণালীর অধীন হইয়াছিলেন, পূর্বাচার্যগণের কেহই নিশ্চয়ই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান নাই। স্বার্থ মহোদয়

যখন ব্রাহ্মণগণের জন্য উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করেন, তখন তিনি নিশ্চয় নিজের গুরু-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত-প্রণালীর অধীন হন নাই। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব যখন অনুবর্তীদিগের জন্য কৃষ্ণ-মন্ত্র প্রণয়ন করেন, তখন পুরী গোস্বামীর প্রদত্ত দশাক্ষর মন্ত্র "ওঁ ভগবতে বাসুদেবায়" ও তাঁহার প্রদর্শিত উপাসনা-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত কৃষ্ণ-মন্ত্র বা স্বকৃতপূজা-প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার পার্শ্বদগণের মধ্যেও কাহাকেও তাঁহাদের গুরুমন্ত্র ও গুরু-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া স্বকৃত কৃষ্ণ-মন্ত্র ও স্বকৃত উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিতে অনুরোধ ও বাধ্য করেন নাই। কেবল বিশ্বাস ও ভক্তির পরীক্ষার জন্য দক্ষিণাঞ্চলের জনৈক রামাৎ বৈষ্ণবকে কৃষ্ণনাম করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাকেও তাহা করিতে বাধ্য করেন নাই। কোনো প্রণালী-প্রবর্তক স্বকীয় গুরু-প্রণালী বিসর্জন করিয়া স্বকৃত প্রণালীর অধীন হন নাই। যিনি তাহা করেন, তিনি তাঁহার ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। আমরা বঙ্কিমবাবুকে বৌদ্ধভাবাপন্ন ভিন্ন কখনো অন্য কিছু ভাবি নাই। তাঁহার লেখায় কৃষ্ণাবতার-স্বীকার ও ভক্তিতত্ত্বের কথা থাকিলেও, তিনি পূর্ণমাত্রায় বৌদ্ধভাবাপন্ন (Rationaliste)। ব্রাহ্ম-চূড়ামণি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বে হিন্দুধর্মের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া যখন ব্রাহ্ম উপাসনা-পদ্ধতি প্রস্তুত করেন, তখন তাঁহারা এতদপেক্ষা কি আর অধিক বৌদ্ধভাব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

মধ্যে বঙ্গীয়-যুবক সমাজে সাহেবিয়ানার ঘোর প্রাদুর্ভাব হয়। অনেকেই আহারের সময় কাঁটা-চামচ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করেন; গৃহ মধ্যেও বস্ত্র-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া পেণ্টুলেন শার্ট ব্যবহার করেন; এবং ভূমিতলে আসন পাতিয়া বসিবার পরিবর্তে আহারের জন্য টেবল ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। অনেক যুবক এইরূপে বিলাতী সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া হাবু-ডুবু খান। বঙ্কিমবাবুও এই স্রোতের মধ্যে পড়িয়া তৃণের ন্যায় নীয়মান হইয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। এ সম্বন্ধে একদা তিনি আমাকে বলেন যে, তিনি এক সময় কাঁটা-চামচ ব্যবহার না করিয়া হাতে তুলিয়া খাওয়া বড়ই ঘৃণার বিষয় ও ঘোর অসভ্যতা মনে করিতেন। এরূপ অসভ্য ব্যবহার তাঁহার চক্ষে পড়িলে তাঁহার অন্তরে বড়ই ঘৃণার উদয় হইত। একদিন তিনি কাঁটা চামচ হস্তে একটি কই মাছ ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিফল প্রযত্ন হইতেছিলেন; তাঁহার সহধর্মিণী তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, 'কি বিড়ম্বনা! উপায় থাকিতে কি কর্মভোগ!'

এই কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। এই সময়ের কিছু পূর্ব হইতে সময়ের স্রোত বিপরীত দিকে ফিরিবার উপক্রম হইতেছিল। এই স্রোতের বশবর্তী হইয়া তাঁহারও সাহেবিয়ানা তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রস্থান করিল। এ দেশে যে এ স্রোত এমন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে তিনি যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বঙ্কিমবাবুর পিতৃদেব পূজনীয় যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন সন্ন্যাসী গুরু বা উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি একবার তাঁহার পিতার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার মৃত্যু-ঘটনার ঠিক সাতদিন পূর্বে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার অঙ্গীকার করিয়া যান। এই অঙ্গীকার মতো যাদববাবুর মৃত্যুর সাতদিন পূর্বে সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া যাদববাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। যাদববাবুর কোনো পীড়ার সময় এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। এই সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু আরো অনেক কথা বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা ভুলিয়া গিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান 'পাঠক'

যতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৮৮৫ খৃস্টাব্দের কথা লেখা যাইতেছে। তখন পিতৃব্যদেব বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বহুবাজারের চৌমাথার নিকট ৯২ নম্বর কি এমনি একটা নম্বরের বাড়িতে থাকিতেন। "বঙ্গদর্শন" প্রেস তখন কাঁটালপাড়া হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে পিতাঠাকুর সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদকতায় তখন "বঙ্গদর্শন" বাহির হয়।

আমি তখন চাকুরির উমেদার। কাঁটালপাড়া হইতে প্রায়ই কলিকাতায় যাতায়াত করি। সেখানে আফিস অঞ্চলে ঘুরি। আমাকে বাপ, খুড়া, জ্যেঠা, সকলেই স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন, 'আমাদের দ্বারা বাপু, কিছু হইবে না। , নিজে চেষ্টা করিয়া যাহা পার, কর।'

কাজেই কলিকাতায় সমস্ত দিন টো-টো করিয়া সন্ধ্যার সময় পিতৃব্য-নিকেতনে ফিরিয়া আসিতাম। কিছুতে মন বসিত না। তবে সেখানে একটা মূর্ত হাস্যরস ছিল। তাহাতেই কোনো রকমে—কোনো রকমে কেন, এক প্রকার আনন্দেই কাটাইতে পারিতাম।

সে হাস্যরস পিতৃব্য মহাশয়ের জামাতা, কনিষ্ঠা ভগিনীপতি রাখালচন্দ্র। আমরা উভয়ে সমবয়স্ক ছিলাম। দৈব-দুর্বিপাকে রাখাল আজি অনেক বৎসর হইতে পরলোকে।

আমাদের চট্টোপাধ্যায়গোষ্ঠীকে "Royal Family" বলিত! এই "লবজে"র উপযোগিতা সে অনেকবার, অনেক প্রকারে, নানা অবান্তর কথার অবতারণা করিয়া আমাকে বুঝাইয়াছিল। আমি সান্ধ্য-মুহূর্তে, উমেদারীতে বিফল-প্রয়াস হইয়া প্রত্যাগত হইলে, সে আমাকে হাসিয়া বলিত, 'দেখিলে তো, আমি বলি নাই? "Royal Family" র ছেলে চাকুরি করিবে, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? আর যাইও না। Don't make a fool of yourself any more."

কথায় রাখাল কাহাকেও ছাড়িত না। কারণ পাইলে সকলেরই সহিত লাগিত, কিন্তু উহারই মধ্যে একটু যথাযোগ্যভাবে রাগাইয়া দিয়া পরে সকলকেই হাসাইত। শ্বশুরও যে তাহার নিকট একেবারেই বাদ যাইতেন তাহা নহে। তবে শ্বশুর জামাতার উপর রাগ করিবার বড় কিছু

প্রকাশ্য অজুহাত পাইতেন না। এই প্রবন্ধেই তাহা বুঝা যাইবে।

কাকা মহাশয়ের একজন দরওয়ান ছিল। নাম কি-একটা "পাঠক"। এখন তাহা আমার মনে নাই। পাঠক বাটীর ভৃত্যাদির এবং রাখাল ও আমার নিকট "মহারাজ" খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সকলে তাহাকে "পাঠক মহারাজ" বলিত। তাহার কারণও ছিল। সে সকলেরই প্রিয়—নিরীহ, ধর্ম-ভীরু, কোমল-হৃদয়, পঞ্চাশবর্ষবয়স্ক ব্রাহ্মণ। পূজা-পাঠে রত, কিন্তু বেজায় বোকা। তাহার বোকামীও অনেক সময় আনন্দদায়ক হইত। তাহাকে শিশুরাও ভালবাসিত।

পাঠক-মহারাজ নামমাত্র দরওয়ান ছিলেন; অর্থাৎ, নিজেই সর্বদা দরওয়ান সাজিয়া থাকিতেন। আসল দরওয়ানের কাজ অপরের দ্বারা হইত। তিনি নাগরা জুতায়, অর্ধমলিন সাদা থান কাপড়ে, অপেক্ষাকৃত সিতপ্রভা-বিশিষ্ট ফতুয়ায় ঊর্ধ্বপুন্ড্রে ও উষ্ণীষস্পর্ধী হাতে-বাঁধা শ্বেত পাগড়িতে সজ্জিত হইয়া গেটের নিকট একটা টুলের উপর ছেলেদের লইয়া নিয়ত বসিয়া থাকিতেন। সেখানে তাঁহার অপর কাজ ছিল—নিত্যকার সংবাদ-পত্র ও অন্যান্য ডাক লওয়া। ডাক লইয়া তিনি কাকা মহাশয়ের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিতেন। ইহা ভিন্ন বাহিরের ডাকা লইয়া যাইতেন। কাহাকেও ডাকিতে হইলে ডাকিতে যাইতেন। এই সকল শ্রম-সাধ্য কাজ ছাড়া তাঁহাকে আর বড়-একটা-কিছু করিতে দেখি নাই। তিনি যে এককড়া বুদ্ধি লইয়া ঘর করিতেন না, ইহা পিতৃব্য মহাশয় বিলক্ষণ জানিতেন। সেই জন্য পাঠক মহারাজের পক্ষে দ্বাররানের ন্যায় উচ্চ পদলাভ আশ্চর্যের কথা হইয়াছিল। যে কারণেই হউক, কাকা মহাশয় লোকটিকে পছন্দ করিয়া-ছিলেন। বুঝি তাহার ভিতরটা ভাল ছিল জানিয়া তাহাকে কোনোরূপে একটা যোড়াতাড়া কাজ দিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুষ্ট রাখাল, এ হেন পাঠক-মহারাজের নিয়োগের দুরূহ কারণতত্ত্ব ভেদ করিবার জন্য অনেক মাথা ঘামাইয়াছিল। শেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে একদিন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া আমাকে সাধু ভাষায় বলিয়াছিল, 'বুঝিয়াছি, ইহা শ্বশুর মহাশয়ের তাঁহার শ্বশ্রূর প্রতি প্রীতির ফল।' কথাটার তখন টীকা ভাষ্যাদির প্রয়োজন হওয়ায় আমি প্রশ্নের-উপর-প্রশ্ন করিলাম। রাখাল বলিল, 'আরে জান না, তোমার কাকার শ্বশ্রূঠাকুরানী বলেন, "আহা! পাঠক যথার্থই ভক্তিমান ব্রাহ্মণ।" কাজেই পাঠক আর যান কোথা?'

পাঠক-মহারাজ একদিন পূজায় বসিয়া গীতার একাদশ-অধ্যায়োক্ত

অমৃত নিঃস্যন্দিনী স্তোত্রমালা ভক্তিগদগদকণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃত বুঝিতেন মাথামুণ্ড, এমন কি, দেবনাগরও বুঝি ভাল চিনিতেন না। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস বশতঃ তাঁহার আবৃত্তি মন্দ হইত না। তাহাতে আবার ভক্তির উচ্ছ্বাস সে শ্লোকগুলিকে মধুময় করিয়া তুলিতেছিল। আমি তাহা শুনিতে শুনিতে "আনন্দমঠে"র পাণ্ডুলিপি লুকাইয়া পড়িব বলিয়া কাকার বৈঠকখানায় যাইতেছিলাম। সে দিন বোধহয় রবিবার ছিল। সে সময় কাকা ভিতরে থাকেন বলিয়া আমি বৈঠকখানায় যাইতেছিলাম। তখন পাঠক-মহারাজের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল :—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥

এমন সময় আমি বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিলাম। ঢুকিয়াই দেখি, আর কেহ নাই, কেবল কাকা একখানি কৌচে শুইয়া আছেন, তাঁহার উভয় চক্ষু মুদ্রিত। মুখ-সংলগ্ন সটকার নল নিঃশব্দ, তিনি যুক্তকর বক্ষের উপর ন্যস্ত করিয়া অনন্যচিত্তে সেই ব্রাহ্মণোচ্চারিত স্তব শুনিতেছেন। মুখে অদ্ভুতভাব,—কি সুন্দর, কি পবিত্র! আমি সভয়ে, সসম্ভ্রমে পিছাইয়া বাহিরে আসিলাম। সেই দৃশ্যে—সেই দৃশ্যে কেন, তাহার পূর্ব্বের ও পরের ঐরূপ কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনাতেও আমি অল্প বয়সেও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, কাকার ভিতরে একটা প্রবল ভক্তিস্রোত গিরিনিরুদ্ধকল্লোলিনীবৎ প্রচ্ছন্ন আছে। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, সময়ে বেগরোধকারী শিলা স্থানচ্যুত হইলে ঐ পূত-স্রোত কি তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া সমস্ত বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিবে। পরে সে স্রোত পথ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু হায়! নিক্রান্ত হইতে-না-

হইতেই সহসা কালের অনন্ত-সাগর-সঙ্গম দেখিতে পাইয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মিলাইয়া গিয়াছিল। বুঝি তেমন করিয়া তাহার সকল তরঙ্গগুলি তটপ্রহত করিয়া খেলিবার অবসর পায় নাই। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে প্রেমধর্ম-প্লাবিত সমগ্র বঙ্গভূমিতে আজি আবার ভগবদ্ভক্তির বান ডাকিত।

রাত্রি ১০টা পর্যন্ত নীচের বৈঠকখানার হলঘরে কাকা মহাশয়ের বন্ধুবর্গ সমবেত থাকিতেন। তাঁহারা চলিয়া যাইলে, কাকাও উপরে যাইতেন। তখন রাখালচন্দ্র ও আমি নির্ভয়ে গল্প-গুজব করিতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মহারাজেরও স্ফূর্তি আসিত। কারণ তিনি কাকাকে ব্যাঘ্রবৎ ভয় করিতেন। কাকা উপরে যাইলে তিনি ফটকের কাছে একখানি খাটিয়া পাড়িতেন। তাঁহার একটি জীর্ণ দপ্তর ছিল। তাহার ভিতরে অনেক অমূল্য-রত্ন—তুলসীদাসের রামায়ণ, গীতা প্রভৃতি—তিনি শুধু গুছাইয়া রাখিতেন। খাটিয়া পাড়িয়া সেই দপ্তরটি লইয়া তিনি প্রত্যহ পাঠে বসিতেন। পাঠ অবশ্য সুর করিয়াই হইত। শ্রোতা ছিল মেঘা সহিস (কোচম্যান মুসলমান ছিল বলিয়া আসিত না) এবং জনৈক পশ্চিমা ফুলুরি-বিক্রেতা। সে ঐ সময়ে ঠিক আসিয়া জুটিত; কখনো কখনো তাহার সঙ্গে এক বিপুল মেহাভারাক্রান্তা ঘনঘোর কৃষ্ণাঙ্গিনী আসিয়া হরিগাথা শ্রবণ করিতেন। এই কৃষ্ণাঙ্গিনীকে দেখিলেই রাখালের হাসির উৎস খুলিয়া যাইত, তাঁহার সম্বন্ধে তখন অদ্ভুত অদ্ভুত মন্তব্যে হাসিতে হাসিতে আমার পেট ব্যথা হইয়া উঠিত। একদিন পাঠ হইতেছে। পাঠক মহারাজ পুস্তক-লিখিত কোনো কথাই পাঠকালীন একেবারে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে প্রায় প্রত্যেক কথাই কষ্টে বানান করিয়া পড়িতে হইত; তাহাতে শ্রোতাদিগের অর্থবোধ হওয়া দূরে থাকুক, ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত। কিন্তু "মহারাজে"র ভয়ে কেহ উঠিয়া যাইতে পারিত না। "মহারাজ" বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, রামায়ণ পাঠ শুনিতে শুনিতে উঠিয়া যাইলে মহাবীর কুপিত হন, আর তাঁহার ক্রোধ হইলে কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্রের কৃপালাভ হয় না; পরন্তু রামায়ণ পাঠ শুনিলে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়। এখন, বেচারা মেঘার বড়ই অর্থকষ্ট ছিল, পঞ্চাশৎ-পরায়ণ ফুলুরিওয়ালারও তখন পর্যন্ত পুত্রমুখদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। কাজেই তাহারা প্রাণপাত করিয়া পাঠ শুনিত। কিন্তু এ দিন বড়ই দুর্দৈব ঘটিয়াছিল। পাঠক মহারাজ বহুবিলম্বে এক একটি শব্দের বানান নিষ্পন্ন করিতেছিলেন; সম্ভবতঃ তাহা শ্রোতাদিগের একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই অল্পবয়স্ক যুবক মেঘা সহিসের ঢুলুনি আসিতেছিল; তাহার অন্তরাত্মা তাহাকে ঘুমাইবার জন্য গালি পাড়িতেছিল;

কিন্তু ব্রহ্মবাক্যে তাহার অটল আস্থাবশতঃ সে তখনো কোনোরূপে বসিয়াছিল। পাঠক-মহারাজ পড়িবার অগ্রে বানান করিতেছিলেন,—

'প-প-প ; র-র ; পর-ম, ম ; পরম ইত্যাদি।'

"মহারাজ" এইরূপ বানান করিতেছিলেন, এবং এক একবার "আরে মেঘুয়া!" বলিয়া নিদ্রালু মেঘাকে শাসাইতেছিলেন। তদুত্তরে মেঘা প্রতি-বারেই চমকিয়া উঠিয়া "শুনতেহেঁ মহারাজ" কথাটি উচ্চারণ করিতে-না-করিতেই নিদ্রা-প্রভাবে আবার নতশির হইতেছিল।

উক্ত প্রকারে বানান করিয়া পাঠক যখন সম্পূর্ণ একটি ছত্র বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি উহা হাঁকিয়া পড়িলেন। সেটা যেন তাঁহার বানানরূপ শত্রুদ্বয়োল্লাসজনিত সিংহনাদ বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হইল। হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাথা ও শরীর দুলিয়া উঠিল ; তিনি সোৎসাহে পড়িতে লাগিলেন,—'পরম প্রেম নেহি যাতি।'

সেই সময় অভাগা মেঘার সমুদয় মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছিল। পাঠক-মহারাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বিরক্ত হইয়া পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং মেঘাকে যে শীঘ্র উৎসন্ন যাইতে হইবে, দয়ার্দ্রচিত্তে তাহাই বুঝাইতে লাগিলেন। "ভকত" ফুলুরীওয়ালাও তাহাতে যোগদান করিল। তখন মেঘা ভয়বিহ্বলচিত্তে ব্রাহ্মণের পায়ে জড়াইয়া ধরিল। প্রসন্ন হইয়া শেষে পাঠক-মহারাজ মহাবীরের কৃপালাভের ব্যবস্থা করিলেন ; মেঘাকে ভোগাদির খরচ বাবদ ১৷৹ দিতে হইবে। মেঘা অগত্যা অবনতমস্তকে স্বীকৃত হইল। সেদিন আর পাঠ হইল না। পরে শুভদিনে, শুভক্ষণে, একদিন পাঠক মহারাজ মহাবীরের পূজা করিয়া ভোগ লাগাইলেন। প্রসাদে পুরী ও মালপুয়ার বাহুল্য ছিল। "জামাইবাবু" এবং আমিও প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু ১৷৹ খরচেও যে মেঘার প্রতি মহাবীর প্রসন্ন হইলেন না, তাহার আর্থিক কষ্ট ঘুচিল না, বরং তাহা অধিক-হইতে-অধিকতর হইতে লাগিল, তজ্জন্য মেঘাকে বহুদিন পরেও দুঃখ করিতে শুনিয়াছি।

একদিন কাকার বাসায় সাহিত্যিকদিগের সান্ধ্য-সম্মিলন হইয়াছিল। সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত, "বান্ধবে"র কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক সিংহ-ব্যাঘ্র সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছিলেন। যথাকালে সকলে খাইতে বসিলেন। তখন কালী-প্রসন্নবাবু "বঙ্গদর্শনে" পিতৃদেব লিখিত "বৈজিক-তত্ত্ব" সম্বন্ধে পিতার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রনাথবাবু তাহাতে যোগ দিলেন। শেষে

তিনি বরফ চাহিলেন। তখন কিন্তু বরফের ঠিক সময় নহে। সেটা ফাল্গুন মাস ছিল, বোধহয়। কাজেই বরফের যোগাড় ছিল না। যাহা হউক, বরফ তখনই আনান গেল, কিন্তু রাখাল ও আমি কাকা মহাশয়ের বিরক্তির কারণ হইলাম। কাকা বলিতেছেন,—'এখনকার ছেলেগুলা মানুষ নয়, রাখাল তো কেবল কথা শিখিয়াছে, আর যতীশ যেন এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে; কাজেই উহাদের এসব দেখিবার আবশ্যক হয় না।' বলা বাহুল্য যে রাখাল ও আমি উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলাম; গতিক দেখিয়া নীরবে আমি সরিয়া পড়িলাম। রাখাল কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি সব পেট ভরিয়া শুনিল। খাওয়া-দাওয়া চুকিলে সে গজেন্দ্রগমনে আমার কাছে আসিয়া Hamlet-এর Soliloquy আওড়াইতে আরম্ভ করিল। শুনিয়াই আমি বুঝিলাম, সে একটা কি মতলব আঁটিয়াছে। আমি হাসিয়া বলিলাম, 'খবরদার।' সে কৃত্রিম ক্রোধ দেখাইয়া বলিল, 'রেখে দাও তোমার খবরদার, রাখাল বাঁড়ুয্যেকে বাগান সহজ কথা নহে—Old man কি দেখেন না আমি কি করি।'

'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়।' যেমন রাখালচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্ণ করিবার উপায় উপস্থিত; পাঠক-মহারাজ সহসা আমাদের নিকট সশরীরে আবির্ভূত হইলেন। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, 'কিয়া খবর মহারাজ!'

পাঠক। এহি বাবু, বাড়িকা খবর বহুৎ রোজসে নেহি মিলি।

রাখাল। মিলা নাই কেন?

পাঠক। আরে কিয়া জানে বাবু, চিট্‌ঠি লিখ্‌তা তো, লেকেন জবাব নেহি মিল্‌তা।

রাখাল। তা, তার কর না কেন?

পাঠক। আরে বাবু, গরীব আদ্‌মী—পয়সা কাঁহা মিলি?

রাখাল। তা বাড়ির কি খবরের জন্য এত ব্যস্ত?

পাঠক। হামারা মুলুকমে বহুৎ রোজসে পানি নেহি ভ্যায়া; গঁহু ভুট্টা সব্ একদম জল, গেয়া, খানা বেগর সব্ আদ্‌মী মরতা।

রাখাল। উপায়?

পাঠক। ওহি এক হ্যায়—কি হামারা চাচেরা ভাইকা ঘর্‌মে গঁহু বহুৎ মৌজুদ্ হ্যায়। ও আগ্‌র হামারা বালবালচ্ছাকো খেলায় তো সব জিয়েগা নেহি তো—বলিতে বলিতে পাঠক-মহারাজের চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

রাখাল। তা খিলাবে বৈ কি। তবে ভাবনা নেই।

পাঠক। এহি লিয়ে তো হম্ উন্‌কো দোঠো খং ভেজা, মগর জবাব নেহি মিলা; কেয়া জানে, ভাইয়া কাঁহা রোজগার খাতির চলা গিয়া হোগা।

এই সময় রাখাল ভায়া যেন একটু চিন্তিত হইল। একটু পরেই তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি বুঝিলাম, একটা বেশ কিছু মতলব তাহার মাথায় আসিয়াছে। তখন রাখাল বলিল, 'তা, ওসব খবর জানা তো কোনো শক্ত কথাই নয়। ও তো তুমি কর্তাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পার।'

পাঠক। কেয়সে বাবুসাহেব? কর্তাবাবুকা হামারা ঘরকা বাত্ কেয়সে মালুম হোয়েগা?

রাখাল হাসিয়া উত্তর করিল, 'আরে মহারাজ, তুমি কেবল পূজা-পাঠ কর, এ সহজ কথাটা আর বোঝ না? কর্তাবাবুর কাছে কত বড় বড় খবরের কাগজ আসে, দেখেছ তো?'

পাঠক। হাঁ, হাঁ, আতা তো, হাম তো ও সব কর্তাবাবুকা টেবিল পর রাখ্‌তা হ্যায়।

রাখাল। তাতে দুনিয়ার সব খবর লেখা থাকে জান না?

পাঠক। তব্ কিয়া হামারা ঘরকা খবর ভি উসসে লিখা রহ্‌তা?

রাখাল। নয় তো কি? তোমার বাড়ি কি দুনিয়া ছাড়া?

পাঠক একটু ভাবিল—কথা তো ঠিক বটে, তাহার বাড়ি তো দুনিয়া-ছাড়া নহে। সে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ বাবু, হামারা ঘরকা খবর কোন্ কাগজ্‌মে মিখ্ সক্‌তা বোলিয়ে, হাম ও কাগজ আপকা পাস পহিলেই লে আওয়েগা।

রাখাল। না মহারাজ, তা করো না। তা হলে কর্তাবাবু গোসা হবেন।

পাঠক। তব্ কর্তাবাবুকো পড়া হো যানেসে আপ্‌না পাস হাম ও কাগজ লে আওয়েঙ্গে?

রাখাল। না, তাও না। কোন্, কাগজে কবে তোমার দেশের বাড়ির কথা লেখা থাকে, তার ঠিকানা নেই; দশখানা পড়তে পড়তে একখানায় হয় তো পাওয়া যেতে পারে। আর, যে সব কাগজ রোজ পড়ে, সেই জানে, কোথায় কোন্ দেশের খবর থাকে; সে যেমন দরকার হলে বের করতে পারে, অন্যে তেমন পারে না।

পাঠক। আরে জামাইবাবু! তব হামারা কিয়া উপায় হোয়েগা?

রাখাল। উপায় তো বললুম। কর্তাবাবুকে জিজ্ঞেস করো। তিনি যখন

সকালে চা খেয়ে খবরের কাগজ পড়বেন, তখন জিজ্ঞাসা করো। আর দেখ, জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোসা হবেন, তোমাকে ধমক দেবেন, বকবেন। কারণ, তাঁকে অনেক খুঁজে দেখে বলতে হবে; তা তুমি ভয় পেও না, আর কিছুতেই ছেড় না। নেহাৎ তখন না বলেন, অন্য দিন এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিও। সেদিন না বলেন, আর-একদিন ধরে পড়ো।

পাঠক। বহুৎ আচ্ছা, বাবু।

রাখাল। আর দেখ আমি যে একথা বলেছি, তা কর্তাবাবুকে কিছুতেই বলো না। তোমার চাকরি টুটবে। বুঝলে তো?

পাঠক। আরে বা জামাইবাবু। হাম, কিয়া বোকা হ্যায়?

তখন আমি হাসিতে হাসিতে রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম, 'পাঠক, তুমি কর্তাবাবুর কাছে যেও না। খবরের কাগজে তোমার বাড়ির কোনো কথা লেখে না। মিথ্যা কথা।'

কিন্তু পাঠককে সে কথা বুঝানো আমার সাধ্য কি! "জামাইবাবুর" উপর তাহার অটল বিশ্বাস ছিল। আর "জামাইবাবু"কে সে তাহার বিশেষ হিতাকাঙ্খী বলিয়া জানিত। তদ্ভিন্ন "জামাইবাবু" মধ্যে মধ্যে মহাবীরের পূজা বলিয়া টাকাটা সিকিটাও দিতেন।

তখন রাখাল বলিল, 'যতীশের ও কথা শুনো না, আর কেহ তোমাকে কিছু বলিলেও শুনো না। এ কথা কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেও এসো না, এসো যদি, ভাল হবে না।' রাখালের উদ্দেশ্য, সে কোনো রকমে ধরা না পড়ে। তখন পাঠক-মহারাজ চলিয়া গেলে আমি রাখালকে বলিলাম, 'রসো, আমি তোমার নষ্টামি ভাঙ্গছি। আমি এখনই এ কথা বলে দিব।'

তখন রাখাল আমাকে অনুনয় করিয়া একটা বড় কঠিন দিব্য দিল। শেষে বলিল 'ভাই, দুনিয়াটা আনন্দের জায়গা, যতদিন পার আনন্দ কর। এমন একটা মজায় কি ব্যাঘাত দিতে আছে?'

আমি কাজেই চুপ করিলাম। একটু মজা দেখিবার যে নিতান্ত ইচ্ছা ছিল না, এমন কথাও বলিতে পারি না।

পরদিন সকালে কর্তামহাশয় চা খাইয়া বৈঠকখানায় খবরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় দীনভাবে পাঠক-মহারাজ তথায় দর্শন দিলেন। কাকা খবরের কাগজ হইতে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন। পাঠক তখন নমস্কার করিলেন। কাকা প্রতি-নমস্কার করিয়া কথঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিয়া।'।

পাঠকের সেই শেখান কথা। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেশে দুর্ভিক্ষ, বাড়ির কোনো সংবাদ চিঠি লিখিলেও তিনি পান না। তা কাগজে তাঁহার বাড়ির কথা কি লেখে, তাহাই তাঁহার জিজ্ঞাসা।

বৌবাজার দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেনের বলাইচাঁদ দত্ত তখন সেখানে বসিয়া একখানা কি কাগজ পড়িতেছিলেন। তিনি আমার বাপ-খুড়ার বন্ধু ছিলেন। তিনি তো শুনিয়াই একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া অস্থির। কিন্তু কাকা মহাশয়? তাঁহার গম্ভীর মুখ সঙ্গে সঙ্গে আরও গম্ভীর-ভাব ধারণ করিল। তিনি চীৎকার করিয়া হাতের কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পাঠক-মহারাজ তো একেবারে দৌড়।

যদি অপর কেহ হইত, তাহা হইলে বুঝিত যে, ইহার ভিতর একটা-কিছু রহস্য আছে, নহিলে এমনটা হয় না। কিন্তু কাকা অসঙ্গত কিছু, এমন কি. এরূপ একটা জীবন্ত আহাম্মুকীও, দেখিলে, কখনো কখনো রাগিয়া উঠিতেন। তখন তাঁহার সে কথা ভাবিবারও অবসর থাকিত না।

যাহা হউক, সেদিন তো গেল। তাহার পরদিন কাকা আফিস হইতে আসিয়াছেন। গাড়ি তখনো গেটে দাঁড়াইয়া আছে। পাঠক যুক্তকরে আবার উপস্থিত, আবার তেমনই চীৎকার, পাঠকের পলায়ন।

শেষে আর একদিন, রাত্রিতে সকলে চলিয়া যাইলে, পাঠক বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত। কিন্তু কাকা সেদিন বিনা বাক্যব্যয়ে বিরক্তি সহকারে তখনই উপরে উঠিয়া গেলেন।

ভাগ্যবলে তৎপরদিন পাঠকের দেশ হইতে চিঠি আসিল—তার খবর ভাল। পাঠকের মুখে আর হাসি ধরে না। রাখাল ভায়া বলিল, 'দেখিলে কেমন? ছেলেদের যেমন জুজুর ভয় দেখায়, তেমনি জুজুর ভয়—না। শুধু ভয় কেন, আস্ত জুজুই—দেখাইয়াছি। এখন বৈঠকখানা হইতে পলাইতে হয়। রাখাল বাঁড়ুর্য্যের উপর বুঝিয়া-সুজিয়া মন্তব্য পাস না করিলেই জুজু আসে।'

ইহার পর পাঠক আর আমাদের বাড়িতে ছিলেন না।

কাকা মহাশয়ের নভেলে হুঁসো পশ্চিমাদের যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পাঠক এবং তাঁহার কদরের অপর দুই-একজনই তাহার উদ্দীপক।

বঙ্কিমবাবু

ললিতচন্দ্র মিত্র

আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি—বঙ্কিমবাবু। পরমারাধ্যা জননী দেবীর মুখে শুনি বঙ্কিমবাবু, অগ্রজদিগের মুখে শুনি বঙ্কিমবাবু। তাই এই প্রবন্ধের নামকরণ করিলাম—বঙ্কিমবাবু। তাঁহার সম্বন্ধে আমার যেটুকু স্মৃতি, তাহাই জ্ঞাপন করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তবে এ স্মৃতি আমার পিতৃদেব দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতির সহিত কতক জড়িত।

সম্প্রতি একদিন আমার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, বঙ্কিমবাবুর রং কি কাল ছিল?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কাল বলিতেছেন কেন?' তিনি বলিলেন, 'আমি তাঁহার দাড়ি-গোঁফ কামান, চোগাচাপকান আবৃত চেহারা দেখিয়াছিলাম, তাঁহার রং কালই বোধ হইয়াছিল।' এরূপ ধারণা হয় তো আরও অনেকের থাকিতে পারে, সেই জন্য প্রথমেই তাঁহার বর্ণের কথা বলিব। তাঁহার গুরুর ভাষায় বলা যাইতে পারে, তাঁহার রং "কষিত কাঞ্চনে"র ন্যায় ছিল। বিয়াল্লিশ বৎসরের অধিক হইবে, একদিন বঙ্কিমবাবু আমার পিতৃদেবের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। দুই জনে দুইটি তাকিয়া ঠেসান দিয়া অর্ধ-শায়িত ছিলেন। বঙ্কিমবাবুর গায়ে একটি পাতলা দুগ্ধফেননিভ লংক্লথের কোট ছিল। তাহা ভেদ করিয়া তাঁহার রং ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাঁহার নিজের উপমা ব্যবহার করিলে বলা যাইতে পারে যে, ঘষা কাঁচের ভিতর দিয়া আলো যেমন অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়, তেমনিই তাঁহার রংও সেই কোটের আবরণে অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। গোঁফ ও কেশ ঘন ও মিসমিসে কাল। তাঁহার এই সময়ের ফটো আমাদের আছে। বঙ্কিমবাবুর প্রণীত "দীনবন্ধু-জীবনী"র শেষ সংস্করণে ঐ ছবির হাফটোন প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। "মানসী"তে বোধহয় এই ছবি প্রথম প্রকাশিত হয়।

পাঠ্যাবস্থায় যখন বঙ্কিমবাবু ও আমার পিতৃদেব ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহাদের পত্রে আলাপ হয়। পরে তাঁহাদের যেরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহা বঙ্গীয় পাঠকগণের অবিদিত নহে। বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি, যখন তাঁহারা কেবল দুইজনে বসিয়া থাকিতেন, তখন অনেক সময় নীরবে কাটিয়া

যাইত। দুই জনে দুইটি গুড়গুড়ি লইয়া ধূমপান করিতেন, এবং পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এইরূপ ভাবে বহুক্ষণও কাটিয়া যাইত। শুনিয়াছি কারলাইল ও এমারসন উভয়ের যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, দুইজনে দুইটি চুরুটের ধূম বাহির করিয়া নীরবে বসিয়াছিলেন। বোধহয়, তাঁহাদের আত্মার আত্মায় কথা হইতেছিল, বাহ্যেন্দ্রিয়ে তাহা প্রকাশ পায় নাই। বঙ্গসাহিত্যের এই দুই মনীষী বন্ধুরও সেইরূপ নীরব কথোপকথন হইত। আমার পিতৃদেবের" মৃত্যুর পরও বঙ্কিমবাবু এই নীরবতাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ বিচলিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু স্থির ছিলেন। "বঙ্গদর্শনে" তাঁহার কোনো উল্লেখ নাই। অনেকেই অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি "বঙ্গদর্শনে"র "বিদায়-গ্রহণে" এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন—

'আর একজন আমার সহায় ছিলেন—সাহিত্যে আমার সহায়, সংসারে আমার সুখ দুঃখের ভাগী—তাঁহার নাম উল্লেখ করিব মনে করিয়াও উল্লেখ করিতে পারিতেছি না। এই "বঙ্গদর্শনের" বয়ঃক্রম অধিক হইতে না-হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল। কিন্তু এই "বঙ্গদর্শনে" আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই , কেন, তাহা কেহ বুঝে না। আমার যে দুঃখ, কে তাহার ভাগী হইবে। কাহার কাছে দীনবন্ধুর জন্য কাঁদিলে প্রাণ জুড়াইবে। অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক। আমার কাছে প্রাণতুল্য বন্ধু— আমার সঙ্গে সে শোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনো কিছু বলি নাই, এখনো কিছু বলিলাম না' এরূপ অতলস্পর্শী সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত কি আর আছে।

তাঁহার আর-একজন প্রাণতুল্য বন্ধু ছিলেন। ইনি "পণ্ডিতাগ্রণ্য কাব্যামোদী" জগদীশনাথ রায়। বঙ্কিমবাবু উভয়কে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। একদিন তাঁহার কলিকাতার বৈঠকখানায় তাঁহার পিতৃদেব ও তাঁহার নিজের তৈলচিত্র দেখাইয়া কহিলেন, 'ঘরে স্থান নাই। নহিলে কয় ভায়ের, দীনবন্ধু ও জগদীশের ছবি রাখিতাম।' অনেকেই হয় তো জানেন না যে, এই জগদীশবাবুই "বিষবৃক্ষের" "হরদের ঘোষালে" কল্পিত হইয়াছেন। নগেন্দ্র ও হরদেব ঘোষালের ন্যায় বঙ্কিমবাবু ও জগদীশবাবুর চিঠিপত্র চলিত। একথা জগদীশবাবুর পুত্র ভক্তিভাজন বাবু খগেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট শুনিয়াছি।

অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, বন্ধুত্ব বন্ধুর মৃত্যুর সহিত ফুরাইয়া যায়। আমার পিতৃদেবের অনেক বন্ধু ছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেরই বন্ধুত্ব ক্ষণস্থায়ী

হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর বন্ধুত্ব সে জাতীয় ছিল না। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর তিনি আমাদিগকে ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় দেখিয়াছিলেন। সততই আমাদের সংবাদ লইতেন। আবশ্যক হইলে সৎপরামর্শ দান করিতেন। তাঁহার দ্বারা যে উপকার সাধন হইতে পারে, তাহা করিতে কখনই বিরত হয়েন নাই। তিনিই পিতৃদেবের রচনাগুলি একত্র করিয়া গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশ করিতে বলেন এবং নিজে পিতৃদেবের একটি ক্ষুদ্র জীবনীও লিখিয়া দেন। ইহা পিতৃদেবের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট ছিল। তিনি ইহাকে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিবার অনুমতি দেন, এবং এই জীবনী সে অবধি আমাদের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। ইহার উপস্বত্বও আমরা ভোগ করিতেছি। মৃত বন্ধুর পুত্রগণের প্রতি এই স্নেহের চিহ্ন অতীব বিরল। তাঁহার ঋণ পরিশোধনীয় নহে। কেহ কেহ বলেন, অনেক স্থলে ঋণ স্বীকার করা ঋণ-পরিশোধের কতকটা উপায়। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা সর্বসাধারণের নিকট এই ঋন স্বীকার করিতেছি। পিতৃদেবের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইবার সময়ে তিনি আমাদিগকে একখানি ইংরাজি পত্র পাঠান। তাহার আরম্ভে লিখিয়া ছিলেন—'I owe it to the memory of your father that I should give a critical estimate of his writings,' এবং বিজ্ঞাপনে এ কথা প্রচার করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। "দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব" শীর্ষক সমালোচনার পূর্বাভাস এই পত্রে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিয়াছেন, 'কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠক-মণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতি-ঋণের যতটুকু পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল। তাই, এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।'

"বঙ্গদর্শনে-"র "বিদায়-গ্রহণ"-প্রবন্ধ-পাঠে মনে হয়, তিনি আমার পিতৃদেবের মৃত্যুজনিত শোক নীরবে বহন করিয়াছিলেন। কাহারও নিকট যে কাঁদিয়াছিলেন, তাহা শুনি নাই। শোক তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইতেছিল। কিন্তু যেদিন আমাদের বাটীতে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহার ক্ষত, হৃদয়ের শোকরাশি সেতুবন্ধনে জলসংঘাতের ন্যায় উছলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া, আমাদের বালিকা সহোদরাকে ক্রোড়ে করিয়া শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। সে ঘটনা প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে

হইয়াছিল, এখনো আমার হৃদয়ে কল্যকার ঘটনার ন্যায় জাগিয়া আছে। সে দৃশ্য জীবনে কখনো ভুলিব না।

তাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুত্বের চিহ্ন সাহিত্যেও পাওয়া যায়। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে "নবীন তপস্বিনী" নাটক উৎসর্গ করেন। বঙ্কিমবাবুও তাঁহাকে "মৃণালিনী" উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব যে বন্ধুর জীবনের সহিত শেষ হয় নাই, তাহা দেখাইবার জন্য "আনন্দমঠের" অভিনব উৎসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"স্বর্গে মর্ত্তে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত এই গ্রন্থের এইরূপ উৎসর্গ হইল।" ইংলণ্ডেব রাজ-কবি টেনিসন তাঁহার বন্ধু হ্যালামকে ভুলিতে পারেন নাই। কাব্যে ইহার অমর নিদর্শন আছে। যদি বীজের সহিত বৃক্ষের তুলনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, "আনন্দমঠের" উৎসর্গ বাংলা সাহিত্যের In Memoriam। শ্রদ্ধাস্পদ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ বৎসর বিচ্ছেদেব পর আবার সেই দুই বন্ধু পুনরায় মিলিত হইয়াছেন। সে মিলন অনন্ত কালের জন্য, তাহাতে বিচ্ছেদ নাই। মৃত বন্ধুকে উদ্দেশ কবিয়া তিনি যে আপনাকে "ত্বদধীনজীবিতং" বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই সত্য। বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণবাবু একদিন আমাকে বলিলেন, 'তোমার বাবার মৃত্যুর পর বঙ্কিমবাবুর জীবনের পূর্বকার অবস্থা আর দেখি নাই। যেন তাঁর জীবনের গতির পরিবর্তন হইয়াছিল।

এবার বর্ধমানে সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে মহারাজ বাহাদুরের প্রণীত "চন্দ্রজিৎ" নামক নাটকের অভিনয় দর্শনকালে একটি কথা বড় মনে লাগিয়াছিল। রাজা চন্দ্রজিৎ বলিতেছেন—'রাজর্ষির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে সব মনে রাখা। স্মৃতির প্রত্যেকটিই সজাগ রাখিলে স্মৃতি-বিলোপণের উপায় সুসাধ্য, নচেৎ কর্মক্ষয়কালীন কোন-না-কোন লুপ্ত স্মৃতি সজাগ হইয়া বিঘ্ন ঘটাইতে পারে।' বঙ্কিমবাবু সাহিত্য জগতের রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহারও ঐরূপ স্মৃতিশক্তি ছিল। আমার পরলোকগত বন্ধু শরৎকুমার লাহিড়ী বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচায়ক একটি গল্প করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি—

একবার বঙ্কিমবাবু "সারল্যের পুত্তলিকা, পর হিতে রত, সকলে বিদিত" রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। শরৎবাবু তখন তরুণ যুবক। বয়সের চাপল্য-নিবন্ধন তিনি বঙ্কিমবাবুর নিকট

অগ্রসর হইয়া তাঁহার একখানি ফটো চাহেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বলেন যে, এক্ষণে তাঁহার আর ফটো নাই, যদি ভবিষ্যতে কখনো আবার ফটো তোলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একখানি দিবেন। ইহার বহু বৎসর পরে যখন কলিকাতায় অবস্থানকালে পুনরায় ফটো তোলেন, সেই সময়ে তাঁহার কর্মচারী উমাচরণকে বলেন যে, 'রামতনুবাবুর পুত্র শরৎকে একবার আসিতে বলিও।' শরৎবাবু তাহার পিতৃসুলভ সরলতার সহিত স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার পুস্তকের দোকান তখন বেশ চলিতেছে। তিনি S. K. Lahiri নামেই অভিহিত। তিনি ভাবিলেন; তাঁহাকে প্রকাশক করিবার জন্যই বুঝি বঙ্কিমবাবু ডাকিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমবাবুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পরিচয় দিলেন যে, তিনি এস. কে. লাহিড়ী। বঙ্কিম-বাবু শুনিয়া তাঁহাকে কোন উত্তর না দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'উমাচরণ, উমাচরন, তুমি কাকে ডাকিয়াছ ? আমি যে রামতনুবাবুর ছেলে শরৎকে ডাকিতে বলিয়াছিলাম।' শরৎবাবু অভিপ্রায় বুঝিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, 'আমিই শরৎ।' তখন তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কৃষ্ণনগরে যখন তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম, আমার কাছে ফটো চাহিয়াছিলে, মনে পড়ে।' শরৎবাবুর সে কথা আদৌ স্মরণ ছিল না, বঙ্কিমবাবু বলিবার-পর তঁহার মনে পড়িল। বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, 'আমি আবার ফটো তুলিয়েছি, প্রথম উপহার তোমার জন্য রাখিয়াছি।' বঙ্কিমবাবু যে এই সামান্য কথাও বিস্মৃত হন নাই, তাহা দেখিয়া শরৎবাবু চমৎকৃত হইলেন। এইরূপ সামান্য কথা স্মরণ রাখিবার ক্ষমতার পরিচয় আমিও একবার পাইয়াছিলাম। University Instiute-এ বেদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিবার বন্দোবস্ত হয়। বঙ্কিমবাবুর প্রথম বক্তৃতা আমি শুনিতে গিয়াছিলাম। বহুজনতার জন্য কিছুই শুনিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া দুঃখিত-অন্তকরণে চলিয়া আসিলাম। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বক্তৃতাটি ছাপা হইবে কি না, তিনি বলিলেন, University Magazine-এ ছাপা হইবে। পরে অন্য কথা হইয়াছিল। বক্তৃতাটি পড়িবার জন্য আমার অব্যক্ত আগ্রহ তিনি বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর আমার তৃতীয় অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে যান। আসিবার সময় বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বলিলেন, 'এই Magazineটি তুমি ললিতকে দিও। তাহার আমার বক্তৃতাটি পড়িবার ইচ্ছা আছে।' আমি কাগজ পাইয়া আশ্চার্যান্বিত হইলাম। তিনি যে আমার আগ্রহটি মনে রাখিয়াছেন, তাহাতে

কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আপ্লুত হইল। যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, পড়িয়াছিলাম। বড়ই দুঃখের বিষয়, অচিরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। সে বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইল না, বঙ্গদেশের কেন, সমগ্র শিক্ষিত জগতের দুর্ভাগ্য যে ঐ বক্তৃতা সম্পূর্ণ না করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। Vedic Literature সম্বন্ধে ইহা যে এক অমূল্য পদার্থ হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইবার তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ক্রমোন্নতির অবতারণা করিয়া উপসংহার করিব।

সাহিত্য-জীবনের শৈশবকালে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের "সাহিত্য-পাঠশালায়" অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহার দুইজন সতীর্থ ছিলেন। দ্বারিকানাথ অধিকারী ও দীনবন্ধু মিত্র। গুপ্ত-কবি ইঁহাদের তিনজনকে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং সর্বতোভাবে উৎসাহ দিতেন। একবার ইঁহাদের তিনজনকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। ইঁহাদের কখনো কখনো কবিতায় কলহ হইত। সেসব কবিতা "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ" নামে অবহিত হইয়াছিল। প্রভাকর-পাঠে জানা যায় তদানীন্তন লোকে ইঁহাদের দ্বারা অদূরভ বিষ্যতে সাহিত্যে যুগান্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল। সে আশাও পূর্ণ হইয়াছিল। তবে বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বারিকানাথ অধিকারী "নীল দর্পণ" "দুর্গেশ-নন্দিনী"-র ন্যায় কোনো পুস্তক রচনা করিবার পূর্বেই অকালে করাল কবলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার প্রতিভা মুকুলেই শুকাইয়া গেল। অপর দুইজন সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ অবলম্বন করিয়া নূতন যুগের সৃষ্টি করিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের আর-একজন সহযোগী ছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কাব্যে, নাট্যে ও উপন্যাসে তাঁহারা এক সময়েই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিন পুণ্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় একত্র যুক্ত হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্র পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গমকে সাহিত্যের প্রয়াগতীর্থ বলা যাইতে পারে। যদি বিদেশী উপমা অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে, বঙ্গ-সাহিত্যের এই দিব্য যুগকে Literary Triumvrate বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মধুসূদন দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র Literary Triumvirs বা সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ ছিলেন। এই ভাব অবলম্বনে মৎ-কর্তৃক-রচিত একটি সনেটের শেষ ছয় চরণ উদ্‌ধৃত করিলাম—

মহাকবি মাইকেল পুরুষ বিরাট,
হাস্যসিন্ধু দীনবন্ধু দীনের তারণ,
বঙ্কিম মাধুর্যমণি কোরক সম্রাট.

একাধারে রাজ্যদণ্ড করিল ধারণ,
ধন্য মাতা বঙ্গভাষা বড় ভাগ্য জোর,
সাহিত্যিক ত্রয়াধিপ সিংহাসনে তোর।

বঙ্গ সাহিত্যের, বঙ্গদেশের, বঙ্গসমাজের, চির আক্ষেপের বিষয় এই যে এই ত্রয়াধিপের দুইজন—মধুসূদন ও দীনবন্ধু ১২৮০ সালে, চারিমাস ব্যবধানে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহাদের পরলোক-গমনের পর "কোরক সম্রাট" বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র সম্রাট হইলেন। সম্রাটের কার্য—পালন ও শাসন করা। বঙ্কিমচন্দ্র এ দুই কার্যই সম্যকভাবে সম্পন্ন করিয়া করিয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বীয় কল্পনাপ্রসূত রচনায় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন, তেমনই অপর দিকে সমালোচনার তীব্র কষাঘাতে সাহিত্যে জঞ্জালের প্রবেশ রুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বিশ বৎসর যাবৎ সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের এই পালন ও শাসন-কার্যের জন্য তাঁহাকে সাহিত্যের সব্যসাচী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ভাব অবলম্বনে মৎ-কর্তৃক-রচিত আর-একটি সনেটের শেষ-ছয় চরণ উদ্‌ধৃত করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

এক হস্তে দিব্য তান বীণার ঝঙ্কার
অন্য হস্তে শক্তিশেল কঠোর-সন্ধান,
দিগন্তব্যাপিনী করি প্রতিভা অপার,
আপনার সিংহাসন করিবে মহান,
সাহিত্যের রাজসূয় তব অধিষ্ঠান,
জীবনের মহাব্রত পূর্ণ সমাধান।

'বন্দেমাতরম্'

ললিতচন্দ্র মিত্র

'বন্দেমাতরম্' রচিত হইবার পরে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বর্গীয় যদুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত করিয়া প্রথম গাইয়াছিলেন। সেই দিন বিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" পত্রের কার্যাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কার্যানুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে "বঙ্গদর্শনে"র পৃষ্ঠা সত্বর পূরিত হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 'গান যাহাই হউক, বন্দেমাতরম্ দ্বারা "বঙ্গদর্শনে"র পেট ভরিবে না। আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন।' তদুত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র কহিয়াছিলেন, 'এ গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না; যদি পঁচিশ বৎসর জীবিত থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে।' মহাঋষির এই ভবিষ্যদ্বাণী যে আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আজ সোনার বাঙ্গালার কানন-প্রান্তর "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের কণ্ঠেই "বন্দেমাতরম" নিনাদিত, বন্দেমাতরম্ রবে প্রবাহিনীকূল কল্লোলিত ও গিরিমালা মুখরিত। স্বয়ং শব্দগুণময় অন্তরীক্ষ আজ বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে বিকম্পিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি পূর্বেই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূজনীয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। গত ১৫ই আষাঢ় যে দিন রথোৎসব উপলক্ষে কলিকাতার "বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায়" বঙ্কিমতীর্থে গমন করেন, সেইদিন সৌভাগ্যক্রমে পণ্ডিত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার নিজের মুখ হইতে এই ঘটনাটি শুনিবারও সুযোগ হইয়াছিল।

অনেকের বিশ্বাস স্বদেশ-প্রতিমার স্তব শুনিবার জন্য "আনন্দমঠে" বন্দে-মাতরম্ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, "আনন্দমঠের" কল্পনার পূর্বে বন্দেমাতরম্ মন্ত্র উদ্দীপিত হইয়াছিল। স্থিরভাবে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, "আনন্দমঠে" বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের কবিত্বময়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপন্যাস-ভাবে দেখিলে আনন্দমঠ উদ্দেশ্য-মূলক বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে কাব্যাংশে

নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। তাঁহাব মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে আমি একদিন তাঁহায় শ্রীচরণ দর্শন করিতে যাই। কৌতুহল পরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তাঁহার কোন্ উপন্যাস সর্বোৎকৃষ্ট। তিনি বলিয়াছিলেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ এবং নূতন সংস্করণ রাজসিংহ।' আনন্দমঠের উল্লেখ না শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। প্রথমাবধি আমি আনন্দমঠের পক্ষপাতী। হয়তো আনন্দমঠের উৎসর্গের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের "ক্ষণভিন্ন-সৌহৃদ" আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব দীনবন্ধু মিত্রের স্মৃতি জড়িত থাকা—পক্ষপাতের অন্যতম কারণ। আমি তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলাম যে, 'as a patriotic work আনন্দমঠ অতুলনীয়।' তিনি বলিলেন, 'ও sense-এ খুব ভাল বটে। কিন্তু উহাতে art কম।' আনন্দমঠ উদ্দেশ্যমূলক হইলেও আমরা বলিতে পারি যে, বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ইহাকে মাধুর্যময় ও পবিত্রতাপূর্ণ করিয়াছে।

আর একটি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার আদেশ ছিল যেন তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার জীবনী অপ্রকাশিত থাকে। আজ দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্বে তিনি সাহিত্য জগতের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া সম্মানিত ও আদৃত হইতেন, কিন্তু আজ তিনি বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বলিয়া সর্বত্র পুজিত। কে বলিতে পারে, তাঁহার আদেশবাণী বর্তমান যুগ বিপ্লবের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে?

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃকাহিনী

ললিতচন্দ্র মিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে একটি বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার প্রায় সকল পুস্তকেই সাধু সন্ন্যাসী মহাপুরুষের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী"তে অভিরামস্বামী, "মৃণালিনীতে" মাধবাচার্য, "কপালকুণ্ডলা"য় কাপালিক, "বিষবৃক্ষে" ব্রহ্মচারী, "চন্দ্রশেখরে' রমানন্দস্বামী, "আনন্দমঠে" চিকিৎসক, "দেবীচৌধুরাণী"তে ভবানীপাঠক, "সীতারামে" গঙ্গাধর স্বামী প্রভৃতির ক্ষমতার নিদর্শন আমরা দেখিয়াছি। "রজনী"তে অন্ধ রজনীব সাধু কর্তৃক অন্ধত্বমোচন হইয়াছিল, এবং "আনন্দমঠ" সর্পদংশনে মৃত বলিয়া স্বিবীকৃত কল্যাণীর শিশু-সন্তানের পুনর্জীবন লাভ হইয়াছিল। মনঃক্ষেত্রেও ইহার সুফল দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপুরুষের চিকিৎসায় শৈবলিনীর চিত্তে চিত্তপ্রবাহিত নদী উজান-বাহিনী হইয়াছিল।

এক ব্যক্তির বচনায় মহাপুরুষগণেব মহাত্ম্যের বিবিধ বর্ণনা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়, এবং স্বতঃই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয়—বঙ্কিমচন্দ্র কেন এইরূপ করিয়াছিলেন? তাঁহার স্বীয় পরিবার মধ্যে সাধুপুরুষের যে অলৌকিক নিদর্শন ছিল, তাহাই ইহার কারণ বলিয়া অনুভূত হয়। সেই অলৌকিক ঘটনা কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহার বিবৃত্ত করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

নৈহাটী অঞ্চলে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ ধর্মপ্রবণতা ও শিষ্টাচারের জন্য বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। একদা তাঁহার পিতা কোন শুচিতা-বিবর্জিত আচরণের জন্য স্বীয় পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েন। অভিমানে ও ক্ষোভে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাজপুরে স্বীয় অগ্রজের নিকট গমন করেন। তাঁহার অগ্রজ তথায় নিমকী-সংক্রান্ত-কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দূর প্রবাসে ভ্রাতাকে পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন এবং দুই সহোদরে সন্তোষের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। কিছুদিন অতিবাহিত হইল, তারপর কনিষ্ঠ সহোদর যাদবচন্দ্র বিষম জ্বরে আক্রান্ত হইলেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার কর্ণমূল স্ফীত হইল। ব্যাধি ক্রমেই ভীষণতর হইতে লাগিল, এবং সেই রোগেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তৎকালে নৈহাটী অঞ্চলের প্রথিতনামা চিকিৎসক বৈদ্যনাথ কবিরাজ মহাশয় যাজপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং তিনিই যাদবচন্দ্রের চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠের মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বড়ই কাতর হইলেন, কিন্তু শোকশেল বক্ষে বহন করিয়াও কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন না। যথাসময়ে যাদবচন্দ্রের শবদেহ বৈতরণীর কূলে আনীত হইল। শবের সৎকারের জন্য চিতা সজ্জিত হইতে লাগিল। যে সকল বন্ধু শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বিষণ্ণবদনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধূলালুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। শবদেহ শুভ্র চাদরে আবৃত ছিল। এমন সময় সেই শ্মশানক্ষেত্রে একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। মহাপুরুষ শবের নিকট গমন করিয়া শব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যাদবচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল। কষিত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার কান্তি ছিল। সে অবস্থাতেও তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য বস্ত্র ভেদ করিয়া বিকশিত হইতেছিল। অগ্রজ মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া সকল বিষয় তাঁহার গোচর কবিলেন। মহাপুরুষ যুবকের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শবদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, যুবক জীবিত আছে, এবং তাহার দেহের উপর কর সঞ্চালন করিয়া তাহাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সকলের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়া সেই ধরাশায়িত দেহ পুনর্জীবিত হইল।

পুনর্জীবিত হইয়া যাদবচন্দ্র দুই হস্তে মহাপুরুষের পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ভিক্ষা করিলেন। মহাপুরুষ তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার গুরু হইতে স্বীকৃত হইলেন। শ্মশানক্ষেত্র দীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হইল। দীক্ষান্তে যাদবচন্দ্র মহাপুরুষের অনুগমন করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইলেন। কিন্তু মহাপুরুষ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার সন্ন্যাস-গ্রহণের অধিকার হয় নাই; তোমার সংসারে অনেক কাজ আছে। তুমি গৃহে প্রতিগমন কর।' যাদবচন্দ্র অগত্যা গৃহে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু গুরুদেবের নিদর্শন রাখিবার ইচ্ছা তদীয় চরণে নিবেদন করিলেন। গুরু যাদবচন্দ্রকে স্বীয় খড়ম ও পৈতা প্রদান করিলেন। ভক্ত শিষ্য ইহাতে ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি গুরুদেবের পুনর্দর্শনের বাসনা ব্যক্ত করিলেন, মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, 'ভবিষ্যতে তিনবার আমার দর্শন পাইবে।' কোথায়, কিংবা কবে তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই, তবে বলিয়াছিলেন, 'শেষ দর্শন তোমার মৃত্যুর সময় হইবে।' মহাপুরুষ যাদবচন্দ্রকে আরও কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন, তাহা এক্ষণে উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে

সম্মানসূচক কার্য করিতে হইবে। তাঁহার চারিটি পুত্রসন্তান হইবে। সকলেই তাঁহার ন্যায় সম্মানসূচক রাজকার্যে নিযুক্ত হইবেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে এক-জন কর্তৃক তাঁহার বংশ চিরকালের নিমিত্ত গৌরবান্বিত হইবে। পরিশেষে তিনি প্রপৌত্রের মুখাবলোকন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এই বলিয়া মহাপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। যাদবচন্দ্র বৈতরণীর উপকূল ত্যাগ করিয়া জাহ্নবীর উপকূলে আগমন করিলেন।

যথাকালে যাদবচন্দ্রের বিবাহ সম্পন্ন হইল, এবং তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ডেপুটি কালেক্টার-এর পদে নিযুক্ত। সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব তাঁহাদের দুইবার দর্শন দেন। প্রথম, মেদিনীপুরে; এবং দ্বিতীয় বার বর্ধমানে। দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের পর যাদবচন্দ্র কার্য হইতে অবসর লইয়া পেনসন ভোগ করেন। কালে তঁহার চারিটি পুত্রসন্তান হয়—প্রথম, শ্যামাচরণ, দ্বিতীয়, সঞ্জীবচন্দ্র, তৃতীয়, বঙ্কিমচন্দ্র; এবং কনিষ্ঠ, পূর্ণচন্দ্র; ইঁহারা সকলেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুত্রগণের কর্ম সম্বন্ধে মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইল। এক্ষণে তাঁহার বংশ গৌরবের কথা উল্লেখ করিব। মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার একজন পুত্র কর্তৃক তাঁহার বংশ চিরস্মরণীয় হইবে। আজ "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে মুখরিত ভারত ভূমিতে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা প্রমাণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। সকলেই স্বীকার করিবেন, সাহিত্য সম্রাট ও "বন্দেমাতরম্" মহামন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বংশ যাদবচ্চন্দ্র দিবাকর আর্যাবর্তে স্মরণীয় থাকিবে।

যাদবচন্দ্র পেনসন গ্রহন করিয়া কাঁটালপাড়ার ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার সহধর্মিণী স্বর্গারোহণ করিলেন। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী ছিলেন এবং গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাকে পূজা করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পত্নীর পরলোকগমনের যাদবচন্দ্র একবার তীর্থ-পর্যটনে গমন করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের মন্দিরে রাধাবল্লভের মূর্তি বিরাজিত। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে রাধাবল্লভের রথোৎসব হইত, এবং সেই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের যে সকল বেশ প্রদর্শিত হইত, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। রাধাবল্লভের উপাসক যাদবচন্দ্রের জয়পুর ও বৃন্দাবন বড়ই আদরের তীর্থ হইয়াছিল, কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি গোবিন্দজীর মূর্তি দর্শনান্তে এক অভিনব দৃশ্য অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, যে, রাধাবল্লভ

তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, 'আমি কি এখানেই আছি?—সেখানে নাই?' এ ঘটনায় তিনি বড় বিচলিত হয়েন এবং তীর্থ দর্শনাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাগমন করিয়া রাধাবল্লভের প্রাঙ্গণে শিশুর ন্যায় গড়াগড়ি দিয়া রোদন করেন। অতঃপর তিনি আর কোনো তীর্থে গমন করেন নাই। এমন কি, পবিত্রসলিলা সুরধনী ভবনের উপকণ্ঠবাহিনী হইলেও, সেই পুণ্য প্রবাহেও কখনো অবগাহন করেন নাই।

পুত্র-পৌত্র বেষ্টিত হইয়া সুখে দিনপাত করিতে করিতে মৃত্যুর ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিল। তিনি জরাক্রান্ত হইলেন। পীড়া সাংঘাতিক বলিয়া সকলে অনুমান করিলেন, এবং অন্তিমকালে তাঁহাকে তীরস্থ করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির করা হইল, তখনো তাঁহার জ্ঞানলোক একেবারে অস্তমিত হয় নাই, তিনি পুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আমাকে গঙ্গাভিমুখে কেন লইয়া যাইতেছ? রাধাবল্লভের মন্দিরে লইয়া চল, এবং যতক্ষণ জীবিত থাকি, রাধাবল্লভের চরণতলে রাখিয়া দিও।' তাঁহার আদেশমতো কার্য করা হইলে, তিনি রাধাবল্লভের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া দরবিগলিতধারায় কাঁদিতে লাগিলেন। শিশু যেমন পিতার নিকট আবদার করে, সেইরূপ করিয়াছিলেন। অনেক কথা বলিয়াছিলেন, এবং আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে বঙ্কিমকে একটি পুত্রসন্তান দিলেন না। তিনি তীরস্থ হইতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু গ্রামস্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ জানাইলেন যে তীরস্থ হইতে অসম্মত হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার পুত্রগণকে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। তখন তিনি স্বীকৃত হইলেন। পীড়ার সময় প্রলাপে বলিয়াছিলেন, 'আমি এমনই পাষণ্ড যে আমার গুরুদেব আসিলেন আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না।' এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার গুরুদেব আসিয়াছিলেন কিনা জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইলেন, এবং অনুসন্ধানে জানা গেল, তাঁহার পীড়ার পূর্বে একজন সাধুবেশধারী সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময় আরও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পুত্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, এবং যাদবচন্দ্র প্রপৌত্র-মুখদর্শনে বঞ্চিত হয় নাই। যথাসময়ে তিনি পুত্র-পৌত্র ও আত্মীয়স্বজনে বেষ্টিত হইয়া জাহ্নবীর পুণ্য সৈকতে প্রাণ বিসর্জন করেন। তাঁহার পরলোকগমনে সকলেই দেখিলেন যে, তাঁহার গুরুদেব, বৈতরণী সৈকতে আবির্ভূত। সেই মহাপুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী ছত্রে ছত্রে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

অতঃপর খড়ম ও পৈতার কথা কিছু বলিব। যাদবচন্দ্র খড়ম ও পৈতা

অতিশয় যত্ন ও ভক্তির সহিত রক্ষা করিতেন। পুত্রগণের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি যেমন ভক্তির সহিত উহা রাখিয়াছেন, যদি তাঁহারা উহা সেইরূপে রাখিতে সাহস করেন, তাহা হইলে তাহা রাখিবেন, নচেৎ তাঁহার মৃত্যুর পর জিনিস দুটি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিবেন।। পিতার পরলোকগমনের পর দ্রব্য দুটি রাখিতে পুত্রগণের ভরসা না হওয়ায়, উহা গঙ্গার নির্মল নীরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যজ্ঞোপবীতের সূত্র নেপালের বৃক্ষবিশেষের আঁশে প্রস্তুত। ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে যাদবচন্দ্রের গুরু মহাপুরুষের আবাসক্ষেত্র নেপাল।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দিয়া বিদায় গ্রহণ করিব। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার পবিত্র ধর্মজীবনের প্রভাবে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্তী রচনা সকলে সেই ধর্মভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। দেবী চৌধুরাণী, উৎসর্গ-পত্রে সীতারাম, ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র,—সকলই ধর্মমূলক। দেবী চৌধুরাণীর বঙ্কিমচন্দ্র পিতার সেই ধর্মজীবনের আভাসে বলিয়াছিলেন—'তাঁহার কাছেই প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছি। তিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন।' ইহা স্বরূপ বর্ণনা, কণামাত্র রঞ্জিত নহে। আসুন আমরা সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে প্রণাম করি।

বঙ্কিম-স্মৃতি

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিনকার কথা বলিয়া মনে হইলেও দেখিতে দেখিতে চল্লিশ বৎসরের অধিক হইয়া গিয়াছে। যখন বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বপ্রথম দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তখন আমাব বয়স ষোল-সতের বৎসর হইবে। আমাদের গ্রামে ভট্টচার্য পল্লীর কালীনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহের মকর্দমা। ভিন্নজাতীয়া এক কন্যাব সঙ্গে ঐ ভট্টাচার্যবংশীয় কালীনাথেব বিবাহের ঘটক ও অভিভাবকের বিরুদ্ধে জাতি ও ধর্মনাশের মকর্দমা। ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাবাসতেব মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, সেই সময়ে উপযুক্ত ঘটনায় সংসৃষ্ট আসামীদের বিচার হয়। আমরা গ্রামের বহুসংখ্যক বালক সেদিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়াছিলাম।

বারাসতের আদালত-গৃহ উদ্যান-পরিবেষ্টিত এক সুবৃহৎ অট্টালিকা। ইহার অল্প দিন পূর্ব পর্যন্ত বারাসত জেলা ছিল, এবং মহকুমায় পরিণত হইবার সময়ে দেশ-বিশ্রুত স্যার আশ্‌লি ইডেন এখানকার প্রথম মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হন। বহু বহু প্রধান ব্যক্তির পদার্পণে সেকালে বারাসত পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। প্যারীচরণ সরকাব, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি এখানে জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। কালীকৃষ্ণ ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র সহোদরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি-সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সর্বদাই তাঁহাদের সঙ্গসুখ সম্ভোগের লোভে বারাসতে যাতায়াত করিতেন। সেকালে সমগ্র বঙ্গের মধ্যে বারাসত কলিকাতার নিকটে একটি প্রধান স্থান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ বহু বহু সাধুগণের পদরজস্পর্শে পূত তীর্থস্থানে বিচারাসনে যখন উপবিষ্ট, তখনই তাঁহার সেই সর্বজন-লোভনীয় সৌন্দর্যের-লীলা-বিলাস সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। একদা ঋষিরা রামরূপে মুগ্ধ হইয়া রামের পুরুষ-কান্তির প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমি সেদিন কালীনাথের বিবাহের বিচার দেখিতে গিয়া সেই যে বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিয়া-ছিলাম, সৌন্দর্যের তেমন বিজলী-লীলা আর কখনো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কলিকাতার সিংহ-সৌন্দর্য ও চুঁচুড়ার ভূদেব-রূপ দেখিয়াছি, তাহা মানবীয় সাধারণ সৌন্দর্য বলিয়াই মনে হয়। জনসমাজের নেতৃস্থানীয়

কেশবের সৌন্দর্য দেখিয়াছি, তাহা প্রতিভার পরাক্রমপুষ্ট, হৃদয়-মন-মাতানো সৌন্দর্য সন্দেহ নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে স্থির গম্ভীর সৌন্দর্য-রাশিও বিরল বটে। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র, রবীন্দ্রনাথও সুপুরুষ। কিন্তু যেন মনে হয়, মেয়েলী-ডং-এর রূপরাশি তাঁর চারিদিক আলো করে। কিন্তু বঙ্কিমের সে সিংহ-বিক্রম-বিমণ্ডিত পৌরষভাবময় সৌন্দর্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেরূপের দেমাক বড়ই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভয়ানক দেমাকে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাই, সে অহঙ্কারের কিয়দংশ বোধহয় তাঁহার পুরুষোচিত সর্বাঙ্গসুন্দর দেহের অহঙ্কার। "বোধহয়"—বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উত্তর-কালে তাঁহার নিকট 'অন্যদীয় সাহায্য ব্যতিরেকে, পরিচিত হইবার সময়ে বা তৎপরে কখনো তাঁহার অহঙ্কারের পরিচয় পাই নাই। তিনি সর্বদা সরল লোকের ন্যায় সহজ ব্যবহারই করিতেন। হইতে পাবে, হয় তো বা আমি তাঁহার অহঙ্কার-প্রদর্শনের যোগ্যপাত্র ছিলাম না।

দেখিতে গিয়াছিলাম বিবাহ-বিচার, কিন্তু সেসব ভুলিয়া দেখিয়াছিলাম—নয়ন ভরিয়া পরমানন্দে দেখিয়াছিলাম বঙ্কিমবাবুকে। আমাব দ্বিগুণ বয়সের বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র বিচারাসনে উপবিষ্ট। আর আমি তাঁহার অর্ধেক বয়সের বিদ্যালয়ের ছাত্র। পাঠক হয়তো বলিবেন, আমি রসজ্ঞ বালক ছিলাম। কিন্তু সে কথার উত্তর দিবার প্রয়োজন দেখি না, কারণ একবৎসর বয়স্ক বালকও ফুলের শোভায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। আমিও তেমনই বঙ্কিম-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। প্রকৃত কথা এই যে, সেদিন আদালতে বহু উকিল মোক্তার উপস্থিত ছিলেন, পক্ষাপক্ষ আমলা ও অসংখ্যক দর্শকে আদালতগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। সেই জনমণ্ডলীর মধ্যস্থলে রাজাসনে উপবিষ্ট রাজযোগ্য শোভা-শোভিত বঙ্কিমচন্দ্রকেই দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া একটি রূপবান পুরুষ, অথবা স্বর্গচ্যুত বিদ্যাধর বলিয়া মনে হইয়াছিল। সেদিনকার সে স্মৃতি আজিও নয়নে লাগিয়া আছে।

প্রথম পরিচয় দিনে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নবীন বয়সের সে লাবণ্য-লীলার উল্লেখ করিয়া যখন বলিলাম, 'আমার জন্মস্থল নলকুঁড়া গ্রামের কালীনাথ ভট্টাচার্যের বিবাহ-বিষয়ক-মকর্দমা উপলক্ষে বারাসতের আদালতগৃহে বিচারা-সনে উপবিষ্ট আপনাতে, আর এই প্রবীণ ও পরিণত বয়সের আপনাতে কত প্রভেদ। আপনার সেই বাবরী-কাটা রুক্ষ অথচ ঘনকৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি-পরিশোভিত মুখ যে দেখিয়াছে, সে আজ আপনাকে দেখিয়া সেই বঙ্কিমবাবু

বলিয়া কখনই চিনিতে পারিবে না।' বঙ্কিমচন্দ্র প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনি আমাকে বারাসতে দেখিয়াছিলেন? হ্যাঁ—হ্যাঁ, এক বামুনের ছেলের বিবাহ-বিভ্রাটের মামলা আমার স্মরণ হইতেছে। সেই-দিন দেখেছিলেন? সে আজ কতদিনের কথা। আর এ শরীরের উপর দিয়া কত শত প্রকারের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কত অত্যাচারও হইয়াছে, সে সকলের সংখ্যা হয় না।' বেঁচে আছি সময়ে সময়ে ইহাই আশ্চর্য বলিয়া মনেহয়।' আমি যেই বলিলাম, 'সুস্থ ও সবল দেহে দীর্ঘ-জীবন-যাপনের উপযোগী আয়োজনের তো অভাব ছিল না, তবে কেন এমন হইল?' উত্তরে বলিলেন, 'কতগুলি অত্যাচার শুনিবেন,? প্রথম চাক্‌রির চাপ, চাকরিতে মানুষ আধমরা হয়। তার উপর নিজের শখ—কিছু লেখা-পড়ার রোগ ছিল। বঙ্গদর্শনের জন্য কত রাত্রি যে জাগিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। ঘাড়ে ভূত চাপার মতো, আমার বিশ্রামসুখ-লালায়িত অবসন্ন শরীর-মনকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিবারাত্রি খাটাইয়াছে। ইহার উপর অন্য নানা প্রকারেও শরীরের উপব অত্যাচার হইয়াছে। এখন এ বয়সে আর সামলাইবার উপায় নাই।' বঙ্কিমবাবুর এই অকপটতা আমার হৃদয়ে সমগ্র শ্রদ্ধা ফুটাইয়া তুলিল। দেখিয়াছি অনেক লোক, অনেক বড়লোকও অনেক সময়ে আত্মগোপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হন। অমর-পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্রের অকপটতা আমার নিকট ঋষিজনোচিত বলিয়া মনে হইয়াছিল।

তাহার পর বলিলেন, 'দেখুন, আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে ও সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু কাজ করিতে বড সাধ, কিন্তু দেহের অবস্থা সম্যক উপযোগী বলিয়া বোধহয় না। মানসিক পরিশ্রমেই মানুষ অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। শরীর মন উভয়ের শ্রমেব সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে পারিলে হয় তো এখনও আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত, কিন্তু এ বয়সের উপযোগী শারীরিক শ্রমের ক্ষেত্র কোথায়?' শেষে গ্লাডস্টোন প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় দুই-চারি জন কর্মীর নাম বলিয়া বলিয়াছিলেন, 'এঁদের মতো স্যার রমেশচন্দ্র প্রভৃতি আমরা কতকগুলি লোক মিলিত হইয়া নানাবিধ শ্রমকর ক্রীডা-কৌতুকে অপরাহ্ণকাল গড়ের মাঠে কাটাইতে পারিলে বোধহয় শরীরে কিঞ্চিৎ শান্তি ও শক্তির সঞ্চার হইতে পারিত। কিন্তু এ বয়সে "সিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশার" মতো ব্যাপারে লিপ্ত হইতেও লজ্জাবোধ হয়। আর, শহরের লোক, বিশেষতঃ কলেজের ছেলেরা, বুড়োদের খেলা নিয়ে কত তামাশা করিবে, সেটা বড়ই মুশকিলের কথা।'

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার কত কথাই আজ স্মরণ হইতেছে। সেগুলি গুছাইয়া লিখিতে হইলে, নিজেকে লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহার কথা আলোচনা করিতে গেলে, অনেক কথার সৌন্দর্য নষ্ট হয়, অথচ তাঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল বলিয়া, নিজের কথাও প্রবন্ধের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে সম্মত নহি। তাই আজ অনেক কথা হাতে রাখিয়া কেবল মাত্র আর দুই-তিনটি বিষয়েব আলোচনা কবিব।

পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন উত্তব ও পূর্ববাংলা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বর্তমান হিন্দুসমাজেব অবসন্ন কলেবরে শক্তি সঞ্চারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সে সকলেব কয়েকটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আলবার্ট হলে আহূত সভা সকলেব কয়েকটিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমি উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। তৎপূর্বেই তাঁহাব সঙ্গে আমার পবিচয় হইয়াছিল। দুই-তিনটি বক্তৃতায় উপস্থিত হইবার পর, আব তাঁহাকে দেখা গেল না। তখন আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবাব কৌতূহল জন্মিল। আমি একদিন সুবিধামতো তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার কথা তুলিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কয় দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নাচিয়া "ধবাকে সবা জ্ঞান" করিতে পারে কিন্তু ওতে কোনো স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখার যে ধর্ম ট্যাঁকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তিনি এখনো বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজ-ধর্ম এখন সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুশী তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।'

এখানে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, স্বর্গীয় বিবেকানন্দও বঙ্কিমচন্দ্রের সুরে সুর বাঁধিয়া লোকের নাচুনির মাথায় মুগুর মারিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কিরূপ ধর্মের সমাদর হওয়া বাঞ্ছনীয় তাঁহার জীবনব্যাপী সাহিত্য-ভাণ্ডারেই তাহা পাওয়া যায়। অতি স্পষ্টভাবেই তিনি "প্রচারে" সে কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুণের আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে দুটিমাত্র ব্রাহ্মণ-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজিয়া

পাইয়াছিলেন। কুলসমর্যাদাসম্পন্ন উচ্চ-ব্রাহ্মণ কুল সম্ভূত বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বৈদ্যকুলোদ্ভব কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার সমাজ-ধর্মের আদর্শ কত উচ্চগ্রামে উঠিয়াছিল, অধুনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত "ধর্মতত্ত্বে" কেশবচন্দ্রের নামটি উঠাইয়া দিয়া তাঁহাব ভক্তেরা হৃদয়ে শান্তিলাভ করিয়াছেন। হায় রে দেশ!

মোগলকুল-তিলক আকবর শাহকে আমরা সম্রাট-শিরোমণি বলিয়া জানি। বাল্যকাল হইতে শিক্ষাসূত্রে আকবরের বিবিধ-গুণ-মণ্ডিত দিল্লীর মোগল-রাজদরবারকে সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে জেনারেল এসেম্বিলীর হলে রবীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধ-শ্রবণের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বঙ্কিমবাবু সবেমাত্র বাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সভা-সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় বেশী অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ সেকালের রবীন্দ্র-সম্মিলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠাগত-প্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রের প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির কার্যসম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধেব নাম স্মরণ নাই, তবে তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে মোগল-শাসনের উল্লেখ ছিল, এবং আকরের প্রসঙ্গও ছিল।

সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যে সেদিন একটা বৃহৎ মিথ্যা ধরা পড়িল, একটা দীর্ঘকালব্যাপী লুকাইত সত্যকথা প্রকাশ পাইল। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, 'আকবরের নামে দেশের লোক্ এত নাচে কেন? তাঁহার দ্বারা হিন্দু জাতির রক্ষা ও স্থিতি বিষয়ে ইষ্টাপেক্ষা অনিষ্ট অধিক হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার উচ্চ উদার রাজনীতি জ্ঞানের মূলে বিজাতীয় স্বার্থপরতা লুকাইত। তিনি সুবিধামতো বাছিয়া বাছিয়া রাজপুতানার ক্ষত্রিয় রাজকুমারীদিগকে আপন অন্তঃপুরে গ্রহণ করিয়াছেন, এতে স্বার্থপরতাই প্রকাশ পায়; উদারতার লেশমাত্র ইহাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত যে, আকবর মোগল রাজকুমারীদের সঙ্গে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজ-কুমারদের পরিণয়-ব্যবহার চেষ্টা কবিয়াছেন, তাহা হইলেও একদিন মনে করা যাইত যে তিনি সমদর্শী ছিলেন। সমাজ ও শাসন বিষয়ে আকবর স্বার্থপরতাপুষ্ট অসাধারণ শক্তিসামর্থ্যের পরিচালনায় কৃতকার্য হইয়াছিলেন মাত্র।'

উপরে কথিত সভার পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আপনি কাল আমায় খুব বাঁচাইয়াছেন। এত লোকের জনতা হবে জানলে কি আমি যেতুম? আমি মনে করেছিলুম, ডিবেটিং ক্লাবের মতো অল্প লোক হবে, সেখানে রবিবাবু প্রবন্ধ পড়িবেন। পরে আমি দু-দশ কথায় আমার মন্তব্য শেষ করিব। এ কি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার? আমাদের দেশে মিটিংগুলি কি ঐ রকমই হয়?' এই "ঐ রকম।" কথায় অর্থ এই যে, সেদিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে জেনারেল এসেম্বিলীর স্বল্পায়তনে হলে লোকে-লোকারণ্য হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সভায় বহুলোক অতিকষ্টে একপল দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াই কৃতার্থ। রবিবাবুর প্রবন্ধপাঠ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা জনৈক ভদ্রলোক কিছু বলিতে উঠিয়াছিলেন। প্রথমে শিষ্টভাবে শেষে রুক্ষভাবে পরে অভদ্রোচিত ইতর বচনবিন্যাসে নানা রসভঙ্গ করিয়া শ্রোতারা সভাগৃহকে কোলাহলপূর্ণ করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেরূপ দৃশ্য-দর্শন আর কখনো ঘটিয়াছিল কিনা জানি না। বঙ্কিমবাবুর তো নিশ্চয়ই ঘটে নাই। সেই গোলটা থামাইরার জন্য আমি সামান্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'আমি পশ্চাত্তের দ্বার দিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ছিলাম, ভাগ্যে আপনি সে বিরাট গোলটা থামাইতে পারিয়াছিলেন, তাই কাল মান বাঁচাইয়া বাড়ি আসিয়াছি।'

বঙ্কিমচন্দ্র

এক

তাহার পর পঁচিশ বৎসর কাটিয়াছে। কিন্তু সেদিনের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। দুঃখের দিনেও মনে পড়ে, সুখের দিনেও মনে পড়ে। কুচিন্তা যখন উভয়কেই গ্রাস করে, তখনো মনে পড়ে। দুর্বহ জীবনকে বহনীয় ও সহনীয় করে।

জীবনের স্মরণীয় দিনগুলির পর্যায়ে আনন্দময় পর্বাহের মতো আমার স্মৃতিপটে সে দিন উজ্জ্বল হইয়া আছে। সেই দিন প্রথম আমি নূতন বাঙ্গালার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখি, তাঁহার কথা শুনি, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হই। সেই দিন প্রথম আমার বঙ্কিম-ভক্তি চরিতার্থ হয়। সে দিনের কথা কি ভুলিবার?

আমি ও মুন্নী—তখনকার মুন্নী—এখনকার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আই. সি. এস. —রঙ্গপুরের ম্যাজিস্ট্রেট—বঙ্কিমবাবুর দরবারে আমাদের আবেদন পেশ করিবার সঙ্কল্প করি। মুন্নী তখন "সাহিত্যে" আমার সহায় ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমবাবুর কয়েকজন বন্ধুর সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছিল। অর্থাৎ, আমরা যাচিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম, এবং কাহারও স্নেহ, কাহারও সহানুভূতি, এবং কাহারও মৌখিক উপদেশ ও তদপেক্ষা সারগর্ভ প্রবন্ধও পাইয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু আমার আবদার কেহ গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহারা পরিচয়-পত্র দিলেন না। দুই-একজন বলিলেন, 'সে বড় কঠিন ঠাঁই। বঙ্কিম তোমাদিগকে আমল দিবেন না।' আর একজন বলিলেন, 'তোমরা নব্য ছোকরা, বঙ্কিমের ধমক খাইয়া কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে। অনর্থক এ হাঙ্গামার দরকার কি?' একজন বলিলেন, 'বঙ্কিম বড় অহঙ্কারী। আমার সাহস হয় না।' বুঝিলাম, সই-সুপারিশ পাইব না।

কিন্তু তখন আমাদের নিরাশ হইবার সময় নয়। "সাহিত্য" ভিন্ন অন্য চিন্তাও তখন ছিল না। আমি ও মুন্নী পরামর্শ করিলাম, যখন রাজেন্দ্র-সঙ্গমে 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে' না ঘটিল না, তখন একদিন "one fine morne" আমরা দুইজনে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব।

এখন এই "one fine morne-এর একটু ইতিহাস না বলিলে আপনারা

এই ইঁদুরের পরামর্শের মর্ম বুঝিতে পারিবেন না। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহিত তখন আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। পত্রযোগে তাঁহার সহিত পরিচয় এবং পত্রে ও কবিতায় সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায়—আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি তখনো লক্ষ্ণৌ শহরে থাকিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রত্যেক পত্রে কলিকাতায় আসিতে লিখিতাম। তিনি প্রায় প্রত্যেক পত্রেই লিখিতেন, one fine morne তিনি আমাদের আড্ডায় আসিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিবেন। বহুদিন হইতে আমরা সেই one fine morne-এর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু সেই one fine morne আর আসিল না। কোনও কাজ ঠেলিয়া রাখিবার দরকার হইলে, বা সময়ে কোনও কাজ করিতে না পারিলে, আমরা তাহা দেবেন দাদার one fine morne-এর পর্যায়ে ফেলিয়া দিতাম। বঙ্কিমবাবুর নিকট যাইবার ইচ্ছা যেমন প্রবল, তাড়া খাইবার আশঙ্কাও সেরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য উহাকেও আমরা সেই অনির্দিষ্ট one fine morne-এর তালিকা-ভুক্ত করিয়াছিলাম।

ইতিমধ্যে আর-একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। মুন্নী আমার কনিষ্ঠ যতীশের সহিত একযোগে কোনো নব-যশস্বিনী মহিলা-কবিকে কাদম্বরীর ভাষায় "সাহিত্য" লিখিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। মহিলা-কবি অপরিচিতের অদ্ভুত পত্র পাইয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া চিঠির কোণে লিখিয়া দিয়াছিলেন, 'দেখা হইবে না।' চিঠিখানি ফেরৎ আসিয়া লজ্জায় যতীশের দেরাজে লুকাইয়া ছিল। আমি সহসা একদিন তাহা আবিষ্কার করি। মুন্নী এখন ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু তখন কবি ছিলেন। সরল উদার ভাবুক কবি, সংসারের প্রহেলিকায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সাহিত্য-রসে ভোরপুর মুন্নীর ভাবোচ্ছ্বাস এবং যতীশের বাছা বাছা সংস্কৃত কাদম্বরী পড়িয়া আমার খুব আমোদ হইয়াছিল কিন্তু 'দেখা হইবে না'—তেমনই সাংঘাতিক মনে হইল। কেন না, ইহার পর আর তাঁহার রচনা পাইবার আশা করা যায় না।

মুন্নীকে বলিলাম, হাঁড়ী ভাঙ্গিয়াছে, এইবার হাটে পাঠাইব। মুন্নীর সেদিনকার "লাজনত আঁখি!" আমার এখনো মনে আছে—অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এ কাহিনী গুপ্ত থাকিবে। আজ এ কথা ছাপিয়া দিলাম। জগৎ শেঠ বলিয়াছিলেন।—

'প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা সার,
প্রতিহিংসা বিনা মম কিছু নাহি আর।'

ইহাও সেই প্রতিহিংসা। জীবনের প্রভাতে যাঁহাদের ভরসায় "সাহিত্যে" হাত দিয়াছিলাম, তাঁহারা এখন স্ব স্ব ক্ষেত্রে সাফল্য ভোগ করিতেছেন। সাহিত্যের ও "সাহিত্যের" নামগন্ধও তাঁহাদের মনে নাই। আমি "মড়া আগলাইয়া" বসিয়া আছি। মুন্নী "সাহিত্যে"র তদানীন্তন মুরুব্বীদের অন্যতম। প্রতিহিংসার সাধ হয় না? তাই সেই পৌরাণিকী বিড়ম্বনার কাহিনী ছাপিয়া শোধ লইলাম। আশা করি, Less majesty হইবে না।

তখন আর একজন "সাহিত্যের" উদ্যোগী, হিতৈষী, কর্মী ছিলেন। তিনিও বিলাতে যান। সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে "সাহিত্যে"র জন্য গদ্যগান রচিয়া এডেন হইতে, সুয়েজ হইতে, মার্সাই হইতে ডাকে গিয়াছিলেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া মালঞ্চে ফুলের চাষ করিয়াছিলেন; তারপর আইনের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেন। আমার শাপ ফলিয়াছে। তাঁহাকেও এতদিন পরে রোগে ধরিয়াছে। পরিণত বয়সে সাগর সঙ্গীত শুনিয়া শঙ্খের মতো সমুদ্রের আরাব ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, দেশে আনিয়াছিলেন। চব্বিশ-পঁচিশ বছর পরে তিনি "নারায়ণে"র চরণে সোনার তুলসী দিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহার সেবা সফল হউক। বন্ধুর অসুখ হইলে লোকে বলে, তুমি নীরোগ হও আমি বলি, তাঁহার এ রোগ যেন না সারে। এখন দেখুন,—কত ধানে কত চাল। এ নেশার কি মোহ।

আমি একদিন মুন্নীকে বলিলাম, 'চল বঙ্কিমবাবুর কাছে যাই।' সেই "দেখা হইবে না" মুন্নীর মনে বেশ দাগ কাটিয়া স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিল। মুন্নী বলিল, 'গলা ধাক্কা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'ষটকর্ণ হইলে মন্ত্রভেদ হয়। তোমার আমার ধরিয়া চারি কর্ণ, তাহাতে সে ভয় নাই। গলা-ধাক্কা দুজনে ভাগ করিয়া লইব। কেহ প্রকাশ করিব না চল।'

তৎক্ষণাৎ "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" ও "সাহিত্যে"র কয়েক সংখ্যা লইয়া আমরা শঙ্কিত-চিত্তে বঙ্কিম-দর্শনে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাঁহাতে তাঁহাকে "অধৃষ্য" বলিয়াই মনে হইয়াছিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা না বলিলে, যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা ফুটিবে না।—এইজন্য "বাজে কথা"র গৌরচন্দ্রিকার মতো এত "বাজেতম" কথা লিখিতে হইল। পরে যাহা লিখিব, তাহাও খুব কাজের কথা নয়। কিন্তু বাজে কথায় বড় বড় চরিত্রের অনেক বড় বড় তত্ত্ব জানা যায়। গভীর গবেষণা ও গম্ভীর বিচারণা তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য হইতে পারে, কিন্তু চরিত্রচিত্রের তাহাই একমাত্র উপাদান নয়।

এখন বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে যাত্রা করি।

তখন বঙ্কিমবাবু মেডিকেল কলেজের সম্মুখবর্তী প্রতাপ চাটুর্য্যের গলিতে বাস করিতেন। বাড়িখানি সাদাসিদে। প্রবেশদ্বারের সম্মুখে গলির উপর কাশ্মীরী বারান্দা ঝুঁকিয়া আছে। ইহা একটু নূতন। আমরা পূর্বাস্য হইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। আমাদের দক্ষিণে, দ্বারের পার্শ্বেই জলের কল। সেই কলে বঙ্কিমবাবুর খানসামা হুঁকা ফিরাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বঙ্কিমবাবু বাড়ি আছেন?' ভৃত্য উত্তরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনাদের কি দরকার?' আমি চটিয়া লাল। বলিলাম, 'বঙ্কিমবাবুর কাছে কি দরকার,—তা তোকে বলিব কি রে। তাহা হইলে তোর কাছে আসিলেই চলিত। —মর—, তুই খবর দে।'

মন্নী আমার জামা ধরিয়া টানিতেছিল, এবং মৃদুস্বরে বলিতেছিল, ইত্যাদি 'কর কি? তোমার সঙ্গে কোথাও আসিতে নাই। এসেই দাদা চুপ, চুপ।'

বঙ্কিমবাবুর খানসামা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে শুনিলাম, উপর হইতে কে বলিতেছেন,—'আপনারা উপরে আসুন।'

চাহিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের দক্ষিণে দ্বিতলের বাতায়নে এক "শালপ্রাংশু, মহাভুজ।', গৌরবর্ণ সুপুরুষ—তাঁহার ডান হাতে বাঁধা হুঁকা—তামাক খাইতেছিলেন,—প্রশান্ত মুখে স্নিগ্ধ স্মিতরেখা—উদার ললাটে—তখন কি দেখিয়াছিলাম, মনে নাই। কিন্তু এখন মনে হইতেছে, কীর্তিকুসুমের মালা নয়, মনীষার বেদী নয়, প্রতিভার কমলাসন নয়,—মার আশীর্বাদ।

খানসামা বলিল,—'বাবু'।

এই বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গদর্শনের বঙ্কিম, দুর্গেশনন্দিনীর বঙ্কিম, যাদুকর বঙ্কিম, দোর্দণ্ডপ্রতাপ বঙ্কিম। হেমচন্দ্রের বর্ণনা মনে পড়িল,—"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ"। উপর হইতে তাঁহার ভৃত্যের সহিত আমার অবিনয়—কলহ বঙ্কিমবাবু দেখিয়াছেন। কিন্তু তখন ভাবিবার সময় ছিল না।

খানসামা পথ দেখাইয়া দিল। বামে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। উপরে উঠিলাম। ঘরের মেঝেয় সুচিত্রিত কার্পেট পাতা। প্রাচীরে অয়েল পেন্টিং। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃ-দেবতা ও তাঁহার নিজের ছবি। কৌচ কেদারা প্রভৃতি সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। এক কোণে একটি টেবিল হারমোনিয়াম। বঙ্কিমবাবু গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর। গায়ে একটি হাতকাটা জামা। ধুতিখানি কোঁচানো। পায়ে চটি, পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন।

আমরা বাহিরে জুতা খুলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেইদিন প্রথম, ভক্তিভরে অবনত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্রের পদধূলি গ্রহণ করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'থাক থাক।'

ইহার উত্তরে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিতে পারিলাম না। ঠিক মনেও নাই। এখনকার কথা তখনকার সেই মুহূর্তের উপর আরোপ করিলে আসর জমিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোনো লাভ নাই। কেহ কেহ হামাগুড়ি দিবার সময় হঠাৎ নীল আকাশে চাহিয়া অন্তরের কি মহিমা অনুভব করিয়া তের বৎসর বয়সে "কাব্যি" লিখিবার" কি পণ করিয়াছিলেন, তাহায় পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস সতের দিন সাড়ে একুশ ঘণ্টা পরে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। তবে একটা কথা বলিলে ক্ষতি নাই, আমাদের কৈশোরে ভক্তি যেমন স্বাভাবিক ও সার্বভৌমিক ছিল, এখন বোধহয় আর তেমন নাই। এখন ভক্তি হয় তো আরো গাঢ়, আরো সংহত, এবং কতকটা উদ্দাম হইয়াছে। এখনকার ভক্তি গোঁড়ামীর গন্ধে ভরপুর—এ ভক্তি ভক্তকে উদার করিতে পারে না, —এক ভক্তি শত ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ভক্তকে সহস্রের প্রতি ভক্তিমান করে না, চিত্তকে স্নিগ্ধ করে না—সমাজকে শান্ত ও দান্ত করিতে পারে না। এখনকার ভক্তির ক্ষেত্রে ভক্তির পাত্র ও ভক্ত ভিন্ন আর কাহারো স্থান নাই,—যাহারা বা যাহা তাহার ক্ষুদ্র সীমার অন্তর্গত নয়, তাহা মহান হইতে পারে, স্বর্গীয় হইতে পারে; কিন্তু অন্ধ ভক্তির তালকাণা ভক্তের পক্ষে এ জগতে তাহার অস্তিত্বই নাই। ভক্তির ক্ষেত্রে যে দেশের সাহিত্য অঙ্কুরিত হইয়াছিল, সেই দেশের সংস্কারে সিন্ধবাদের স্কন্ধবিহারী বুড়োর মতো এই নাটুকে সাহিত্য-ভক্তি ভর করিয়াছে। ভক্তির এই কারাদণ্ড দেখিয়া আমরা তো সুখী হইতে পারি না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'বসুন'। আমরা দাঁড়াইয়া রহিলাম। বঙ্কিমবাবু না বসিলে আমরা বসিতে পারি না। অবস্থা ঠিক—"ন যযৌ ন তস্থৌ!", বঙ্কিমবাবু অঙ্গুলিনির্দেশে একখানি কৌচ দেখাইয়া দিলেন। আমি বলিতেছিলাম,—'আপনি দাঁড়াইয়া—'

কথা শেষ করিতে না দিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আমার বাড়ি,—আমি বেশ আছি, আপনারা বসুন।' আমি বলিলাম, 'আমাদের "আপনি"—বলিবেন না। আমাদের অপরাধ হয়।' বঙ্কিমবাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন 'আচ্ছা, বসো।'

আমরা সেই কৌচে বসিলাম। মনে একটু ভরসা হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বাঘ নন, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, হাসিয়া হাসিয়া কথা কন। গলাধাক্কার সম্ভাবনাও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।

আমাদিগকে নীরব দেখিয়া বঙ্কিমবাবু বলিলেন, তোমাদের দুজনকেই আমি জানি। তুমি তো বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র? তোমার নাম সুরেশ, নয়?'

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আমি বিস্মিত হইয়া বঙ্কিমবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমার আশ্চর্য মনে হইতেছে। সেইদিন দীনবন্ধুর পৌত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। দরজার কাছে তুমি, তোমার সঙ্গে বন্ধুদের মজলিস করিতেছিলে। আমাদের হেম করের ছেলে পণ্টুও তোমাদের সঙ্গে ছিল। তোমাদের আমোদ দেখে আমাদের ছেলেবেলা মনে পড়ে গেল। দেখ্‌লুম্ তুমি জমিয়ে রেখেছ। শরৎকে জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, তুমি বিদ্যাসাগরের নাতি, তোমার নাম সুরেশ। পরে বঙ্কিমকে বললুম, 'তোমাকে ডাকতে। বঙ্কিম যাচ্ছিলেন,—আমি আবার বললুম। ওরা আমোদ করছে করুক, ডোকো না, বুড়োর কাছে এসে কি হবে? এখানে থেকেই ওদের হাসি তামাশা দেখি।'

দীনবন্ধু সেই দীনের বন্ধু, নীলকরের যম বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর, শরৎ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। বঙ্কিম তাঁহার তৃতীয় পুত্র—এখন বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ, বর্তমানে সুকবি ও দার্শনিক, কলিকাতা ছোট আদালতের জজ। পণ্টু,—পি. সি. কর, ওরফে প্রমথচন্দ্র কর, কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি। অধুনা লোকান্তরিত হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের পুত্র। হেমবাবুও ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমবাবুর সহকর্মী।

তাহার পর মুন্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'তোমাদের আমি জানি। তোমার বাপ ঘনশ্যামের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তুমি যেবার বি.এ. দাও, সেবার আমিও ইউনিভারসিটি হলে গিয়াছিলাম। কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরীচুল এত অল্প বয়সে বি. এ. দিচ্ছ দেখে ত্রৈলোক্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ ছেলেটি কে হে? খুব অল্প বয়সে বি. এ. দিচ্ছে তো? চেনো' ত্রৈলোক্য বল্‌লে, 'ঘনশ্যামের ছেলে।' তোমার ডাকনাম মুন্নী? ভাল নাম কি?'

মুন্নী বলিল; 'জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তুমি কি কচ্ছ।'

মুন্নী বলিল, 'আমি এম. এ. দিয়াছি।'

আমি বলিলাম, 'ও আবার এম. এ. দেবে বলে পড়ছে। আমরা বলছি, তুমি বিলেতে যাও, সিভিলিয়ান হবার চেষ্টা কর।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'ওর বাবা কি বলেন?'

আমি বলিলাম, 'তাঁর অমত নাই'। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, তবে আবাব এম. এ. কেন?'

তারপর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তোমার হাতে কি?'

আমি অবসর পাইয়া কম্পিত হস্তে সেই "সাহিত্য কল্পদ্রুম', ও কল্পদ্রুম,-কাটা "সাহিত্য" বঙ্কিমবাবুর হাতে দিলাম। বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে গ্রহণ করিয়াই বলিলেন, 'আগেই বলে রাখি, তোমরা যদি আমাকে কালী-ঘাটে নিয়ে বলি দাও তাতে রাজি আছি। কিন্তু আমাকে তোমাদের কাগজে লিখতে বলো না।'

গলা-ধাক্কা বটে! কিন্তু কি সুন্দর কি মিষ্টি প্রত্যাখ্যান! যে আশায় গিয়াছিলাম, তাহাতে ছাই দিয়া সুবুদ্ধির মতো তখনই বলিলাম, 'যে আজ্ঞে।'

দুজনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। অসাধ্য সাধন করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার মনে হইল, ফাঁড়াটা অতি অল্পেই কাটিয়া গেল।

বঙ্কিমবাবু "সাহিত্য সম্বন্ধে দুই-চারিটি প্রশ্ন করিলেন। মুন্নী বলিল, 'সুরেশকে আমরা সম্পাদক করিয়াছি।'

বঙ্কিমবাবু আমাকে বলিলেন, 'তোমার দাদা-মশায় জানেন।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। দাদা-মশায় জানেন কিনা তাহা আমিও জানতাম না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন ভাবি জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। খুব সম্ভব, তিনি আমাকে এমন অনধিকার-চর্চা করিতে দিতেন না। বাড়িতেই আফিস ছিল। লুকাইবার জিনিস নয়, হয় তো শুনিয়া থাকিবেন. বারণ করেন নাই। মুন্নী বলিল, 'বোধহয়, তিনি জানেন।'

বঙ্কিমবাবু আমাকে বলিলেন, 'সে কি! দেশের লোক তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করে, আর তুমি তাঁকে না বলে কাগজ বার করে ফেল্লে? তিনি শুন্‌লে রাগ করবেন না?'

আমি বলিলাম, 'বোধহয় শুনেছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিনি!'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'দেখ লেখা-টেখা মন্দ নয়। কিন্তু তোমাদের এখন পড়বার সময়—এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। জীবিকার জন্যে তো কিছু করা চাই। এতে উপার্জনের আশা নাই। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসব কাজ করেছি।

এই চাকরি করতে করতে লেখার জন্য ছুটি নিয়ে এখন ভুগছি। এতদিন পেন্সন নেওয়া যেতো। আর ভাল লাগে না, শরীরও বয় না, কিন্তু সেই ছুটিগুলো এখন পুষিয়ে দিতে হচ্ছে।'

বঙ্কিমবাবু এখনও পেন্সন গ্রহণ করেন নাই। —আমি নিরুত্তর। মুন্নী আমাকে উদ্ধার করিল। সে বলিল, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় ওদের দু-ভাইকে স্কুলে দেননি। বাড়িতে পড়ান।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'কেন? তাঁর নিজের স্কুল কলেজ রয়েছে, নাতিদের স্কুলে পড়ান না।? এর মানে কি?'

মুন্নী বলিল, 'তিনি ওদের সংস্কৃত পড়িয়েছেন। তাঁর মত, আগে সংস্কৃত পড়ে, পরে ইংরেজি পড়লে শীঘ্র শেখা যায়। ওরা বাড়িতে পড়ে। তিনি বলেন ভাল করে পড়াশুনা করে ওরা বাঙ্গলা লিখবে। তিনি নিজে সময় পাননি, যা সাধ ছিল, লিখতে পারেননি। ওদের দিয়ে লেখাবেন।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তবে ভাল।'

আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আমি লিখিতে পারিব না। কিন্তু তোমাদের যখন যা জানবার দরকার হবে, জেনে যেও। আমি অনেক দিন "বঙ্গদর্শন" চালিয়েছি। সব জানি। ম্যানেজারি পর্যন্ত।'

আমরা উঠিলাম। আবার বঙ্কিমবাবুর পদধূলি লইয়া ধীরে ধীরে ফিরিলাম। "সাহিত্যে"র দুর্ভাগ্য ভাবিয়া নিরাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্কিম-বাবুর সদাশয়তায় মুগ্ধ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৃহে ফিরিলাম।

মুন্নী বলিল, 'একেবারে "যে আজ্ঞে' বলে ফেল্লে? ওদিকে মুখে খই ফোটে, একটা কথাও কইতে পারলে না?'

আমি বলিলাম, 'তুমিই কোন্ পারলে?'

সেই দিন হইতে দিনদিন তিনরাত্রি বঙ্কিমবাবুর warning-এর কথা ভাবিতে লাগিলাম। জীবিকা, দারিদ্র্য, বিফলতা,—না না শঙ্কায় মন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। আমি ঘড়ির পেণ্ডুলমের মতো দুদিকে দুলিতে লাগিলাম।

তৃতীয় রজনীর শেষ যামে স্থির করিলাম, 'যে কাজের সূত্রপাতেই বঙ্কিমবাবু আমার ভবিষ্যৎ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাহা ঘটে, ঘটুক, সে কাজ ছাড়িব না।'

বাগান হইতে বেল, জুঁই, চামেলী, গন্ধরাজ, বকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চন্দ্রকিরণে মৃদু-বিভাষিত উদ্যানের সৌম্য শ্যামশ্রী আমার স্বপ্নকে আরও সুন্দর করিতেছিল। কিশোর বয়সের কল্পনা আশার যবনিকায়

আমার অক্ষমতা, বিফলতা ঢাকিয়া রাখিয়া ছিল। জীবন বিফল হইয়াছে, সে আশাধূলায় লুটাইয়াছে-কিন্তু অতীতের স্মৃতি আছে। এখন আমার পক্ষে তাহাও সুন্দর। জানি, পাঠকের পক্ষে নয়। কিন্তু 'সই স্মৃতির চিত্রশালা হইতে ক্ষুদ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহ, তাহাব তুচ্ছ ঘটনা মনে কবিয়া বাখিবাব স্মৃতি আজ আহরণ করিয়া দিলাম। যদি পাঠকের মনের মতো ও সম্পাদকের অনুমত হয়, তবে আরও বলিব।

আমাদের যৌবনে পিতামহ ভীষ্মকে My dear friend বলিবার অধিকাব বাশ্রদ্ধাভাজনকে সাম্যের সমতলে টানিয়া আনিয়া সম কক্ষভাবে "ভিজিট" দিবাব বীতি ছিল না। এইজন্য একটা উপলক্ষ না জুটিলে বঙ্কিমবাবুর নিকট যাইতে পারিতাম না। প্রথম প্রথম মাসে একবার করিয়া সে সুযোগ ঘটিত। "সাহিত্য" বাহির হইলে বঙ্কিমবাবুব জন্য লইয়া যাইতাম। বঙ্কিমবাবু প্রথমেই লেখক ও লেখিকাদের নাম দেখিতেন। নূতন নাম দেখিলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন।

"সাহিত্যে" "বঙ্কিমচন্দ্র" শিবোনামে অনেকগুলি "সনেট" ছাপা হইয়াছিল। কবি বঙ্কিমবাবুব উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের প্রায় প্রত্যেকের উপর এক-একটি সনেট লিখিয়া ছিলেন। সনেটগুলির নীচে কাহারো স্বাক্ষর ছিল না। মলাটে নাম ছিল।

একদিন অপরাহ্নে বঙ্কিমবাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছি। তখন একটু প্রশ্রয় পাইয়াছি। সাহস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাই। বঙ্কিমবাবু সে দিন পূর্বকথিত বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, এসো ভাল তো?' আমি প্রণাম করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র বেশ ভাল লাগিয়াছে।'

কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি তো বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়েছি বলিলেও চলে। আমরা যাহা লিখিতাম, তাহাই সুন্দর কবিয়া লিখিবার চেষ্টা করিতাম। এখন লেখকেরা এ দিকে বড় উদাসীন। তোমাদের "সাহিত্যে"ও দেখি,—অনেক প্রবন্ধ দেখিয়া মনে হয়, একটু অদল-বদল করিলে, কাটিয়া-ছাঁটিয়া দিলে বেশ হয়। কেন কর না? লেখকেরা রাগ করেন কি?'

আমি বলিলাম, 'আমরা পারি না; জানি না। আপনা-আপনির লেখা দেখিয়াও দি। তাহার পরও ঐ রকম থাকিয়া যায়। সকলের লেখা কাটিতে সাহস হয় না।'

বঙ্কিমবাবু—'তাহা হইলে কেমন করিয়া কাজ চলিবে? এই জন্যই "বঙ্গদর্শনে"র আমোলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া "রিভাইস" না করিয়া কাহারো কপি প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছ তো; চন্দ্র একেবারে "বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরাজি লিখেছেন।— খুব খাটতে হয়েছিল। আমাদের সময়ে এজন্য কেউ তো রাগ করতেন না—তবু এখনো শকুন্তলায় ইংরেজি গন্ধ আছে।'

আমি বলিলাম, 'আপনাদের আলাদা কথা।'

বঙ্কিমবাবু—'ও কাজের কথা নয়। পরিশ্রমকে ভয় করিও না। তুমি তো বেশ কবিতা লিখিতে পার। এ কথা তো আগে আমায় বল নাই? আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে। আমি লিখি নাই।'

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'উহাতে নাম নাই দেখিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, সম্পাদকের লেখা; না, তুমি লজ্জা করিতেছ?'

আমি সেই কবিতাগুলির লেখক হইলে বঙ্কিমবাবুর প্রশংসাটুকু আত্মসাৎ করিতে পারিতাম। সে সৌভাগ্য না হউক, আমি সনেটগুলি বঙ্কিমবাবুর ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া একটু গর্বের, একটু গৌরবের সুখ ভোগ করিতেছিলাম। কারণ, যাঁহার লেখা তাঁহার গৌরবে আমারো আনন্দিত হইবার কথা ছিল। প্রথম জীবনে পরিবারের বাহিরে আমরা যে বৃহত্তর পরিবারের রচনা করি, লেখিকা সেই পরিবারের একজন ছিলেন, আমাকে দাদা বলিতেন।

বঙ্কিমবাবু আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে লিখিয়াছেন?'

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, 'পঁুটির লেখা।'

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'পঁুটি? পঁুটি কে?'

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, 'সরোজকুমারী দেবীর লেখা, বাড়িতে পঁুটি বলিয়া ডাকে,—মুন্নীর বোন।'

বঙ্কিমবাবু।— 'ঘনশ্যামের মেয়ে।'

আমি।—'না মথুরবাবুর মেয়ে।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'মথুরবাবুর মেয়ে? তুমি পুঁটি বলে ডাকো, তা হলে তোমাদের চেয়ে ছোট?'

আমি।—'আজ্ঞে হ্যাঁ—চৌদ্দ-পনের বছরের বেশি বয়স নয়।'

বঙ্কিমবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন, বলিলেন, 'বেশ ক্ষমতা আছে, রীতিমতো চর্চা রাখলে—ভবিষ্যতে ভাল হবে' তুমি তাকে বলো, আমার খুব ভাল লেগেছে।'

আমি আবার একটি "আজ্ঞে" বাহির করিলাম। বঙ্কিমবাবু আবার বলিলেন, 'আমার বইগুলি এত ভাল করে পড়েছে; আমার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের নিয়ে এতগুলি কবিতা লিখেছে। এতে আমায় আনন্দ হবে, এ কিছু বেশী কথা নয়; আমার নিজের কথা এমন করে কেউ লিখলে, খারাপ হলেও হয়তো ভাল লাগতো, কি বল? সে জন্য তো আমার আহ্লাদ হবেই, আর তা বলতেই বা দোষ কি? কিন্তু আমি সে কথা বলছি না, সত্যই এর কবিতা লেখবার ক্ষমতা আছে, কবিতাগুলি বেশ হয়েছে তুমি তোমাদের পুঁটিকে বলো আমার খুব ভাল লেগেছে। আমার আশীর্বাদ জানিও।'

আমি বলিলাম, 'বলিব। পুঁটি শুনলে খুব খুশী হবে' সেদিন বিহারী-বাবুও কবিতাগুলির প্রশংসা কচ্ছিলেন।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, —'কোন্ বিহারীবাবু?'

আমি বলিলাম, সারদা-মঙ্গলের বিহারীলাল চক্রবর্তী।'

বঙ্কিমবাবু। তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে? তিনি কি করেন?

আমি যাহা জানিতাম, বলিলাম। বিহারীবাবু পৌরোহিত্য করিতেন, এ প্রশ্নের উত্তরে উহাই বলিতে হয়, তাই বলিয়াছিলাম। কিন্তু "সারদা-মঙ্গলে"র কবি, আমার মনেহয়, সংসারের কিছুই করিতেন না। তিনি করিতেন, সাহিত্যের পৌরোহিত্য। গুরুদেব হইবার রীতিমতো বন্দোবস্ত ও সরঞ্জাম ছিল না; ধনী ছিলেন না, —অভ্যাস ছিল না; সৌভাগ্যক্রমে স্বল্পে সন্তুষ্ট ও তাঁহার গুরু বিদ্যাসাগরের মতো 'স্বাতন্ত্র্যে' শেঁকুল কাঁটা ছিলেন। যজমান প্রতিপালন করিয়া মঠ গড়িয়া ভক্তি শ্রদ্ধার "ব্যাপারে"র জন্য আড়তও করেন নাই। তাঁহার নিমতলায় বাড়ির নীচের ভাড়াঘরে দুই-চারি-জন যজমানের সমাগম হইত। তিনি সাহিত্যে মসগুল হইয়া থাকিতেন। তাঁহার কাব্যরসের যজমানের মধ্যে সে সময় প্রধান ছিলেন, সাহিত্য-রসিক প্রিয়নাথ সেন ও কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল। চক্রবর্তী মহাশয় তক্তপোশ বাজাইতেন। সে তক্তপোশে একখানা মাদুরও ছিল না। আর নিজের কথাবার্তায়, আচারে, ব্যবহারে, মন্তব্যে "হোকগে সে এ বসুমতী যারা সুখী তার।" এ উক্তি যথার্থ প্রতিপন্ন করিতেন। বেহারীবাবু বঙ্কিমবাবুর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আমি মনে করিয়াছিলাম, বেহারীবাবুর কাছে যেমন বঙ্কিমবাবুর কথা শুনি, বঙ্কিমবাবুর মুখেও হয়ত তত উচ্চগ্রামে না হউক—কিছু শুনিব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বেহারীবাবুর দুই-একটি গল্প শুনিয়া

বলিলেন, 'জীবনেও Poet। ইহাকেই বলে কবি। খুব সদানন্দ লোক তো।'

আর একদিন সকালে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলাম, সে দিন বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে উত্তরদিকে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুই-তিনখানি চেয়ার, পশ্চিমে দুইটি আলমারি। উত্তর ও দক্ষিণের জানলা উন্মুক্ত। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। একটি ছোট গড়গড়া, তাহাতে দীর্ঘ কাঠের নল। দেখিলাম, সচরাচর লোকে নলের যে দিকটা গুড়গুড়িতে লাগায়, বঙ্কিমবাবু সেই দিকটাই তামাক খাইতেছেন। অপর দিকটা গড়গড়ার বদ্ধ-মুখে সন্নিবিষ্ট। আমি মনে করিলাম, বুঝি ভুলিয়া উল্টাদিকটা মুখে দিয়েছেন। কিন্তু পরে দেখিলাম, তাহা নয়, নলটা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। আবার মুখে দিবার সময় দেখিয়া উল্টাদিকটাই মুখে দিলেন।

বঙ্কিমবাবুর টেবিলে চায়ের পেয়ালা ছিল। বঙ্কিমবাবু পেয়ালাটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চা খাবে?'

আমি বলিলাম, 'থাক,—আপনার চা তো হইয়া গিয়াছে।—'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'খাও তো? মুরলী।'

মুরলীধর হাজির হইল। বঙ্কিমবাবু আমার জন্য চা আনিতে বলিলেন।

মুরলী, বঙ্কিমবাবুর সেই খানসামা। —প্রথম দর্শনেই যাহার সহিত আমার দ্বন্দ্ব বাধিয়াছিল। পরে তাহার সহিত আমার আপোষ হইয়া গিয়াছিল? মুরলীর সঙ্গে আমার একটু "প্রেম"ও হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর মৃত্যুর পর সে ভবানীপুরের উকিল হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে ছিল। মুরলী আর ইহলোকে নাই,—বোধহয় আবার বঙ্কিমবাবুর তামাক সাজিতেছে। যদি নরক হইতে স্বর্গ পর্যন্ত ট্রাম হইয়া থাকে, এবং যমদূতকে সাধিয়া ছুটি পাই, তাহা হইলে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার ইচ্ছা আছে। তখন মুরলী দ্বার ছাড়িয়া দিবে, হাসিমুখে "আসুন" বলিবে, এবং লুকাইয়া তামাক সাজিয়া দিবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমবাবু। এক খুব লিখিতে লিখিতে লেখা যায়। আর এক পরের লেখা কাটিয়াও নিজের লেখা থাকে তা জান!'

আমি। 'আমরা পারিব কেন?'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমরাও কর। আমি এক রাজকৃষ্ণ ছাড়া কারো লেখা ভাল করে না দেখে প্রেসে দিইনি। রাজকৃষ্ণ বড় সুন্দর বাঙ্গলা

লিখিতেন। দিব্যি ঝকঝকে বাঙ্গলা।—জানতুম তাঁর লেখা প্রুফে একটু কেটে-কুটে দিলেই যথেষ্ট হবে।'

"শকুন্তলা"—বঙ্গবিশ্রুত সমালোচক ও মনীষী শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসুর 'শকুন্তলা-তত্ত্ব'। বোধহয় না বলিলেও চলিত। কিন্তু এখনকার লেখকেরা ও পাঠক-পাঠিকারা প্রাচীন গ্রন্থকারের কোনো গ্রন্থই তো আর পড়েন না। এই জন্য এখনকার সাহিত্যের সঙ্গে তখনকার—বিশ-পঁচিশ বৎসরের সাহিত্যেরও যেন কোনো প্রাণের যোগ নাই। গত পুরুষের স্থপতিরা যে বনিয়াদ করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আছে; তাহার উপর শৈবাল ও আগাছা জন্মিয়াছে। এখন যাঁহারা গড়িতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই বালির উপর খেলাঘরের পত্তন করিতেছেন।

বঙ্কিমবাবুর রাজকৃষ্ণ স্বনামধন্য, বাঙ্গালার প্রথম ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। রাজকৃষ্ণ-বাবুর ধীশক্তির, গবেষণার, রচনার, মধুর চরিত্রের প্রশংসা তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি, দুই-একবার সেই প্রতিভা-দীপ্ত উজ্জ্বল নয়নের কোণে দুই-এক বিন্দু অশ্রুর উদ্গমও দেখিয়াছি। রাজকৃষ্ণবাবুর ক্ষুদ্র "বাঙ্গালার ইতিহাস" বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব। তাহাই আমাদের ইতিহাসের ভাণ্ডারে প্রথম "বিধি দত্ত-ধন"। তাঁহার "নানা প্রবন্ধ" বাঙ্গালী এখন পড়েন কিনা জানি না। কিন্তু আমরা এখনো পড়ি। রাজকৃষ্ণবাবুই প্রথমে বিদ্যাপতিকে সাহস করিয়া "বাঙালী" বলিয়াছেন। বিদ্যাপতি তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। রাজকৃষ্ণবাবু বিদ্যাপতির মিথিলাকে তখনকার বাঙলার সামিল করিয়া মৈথিল কবিকে বাঙালী বলিতেন। বঙ্কিমের পতাকামূলে স্বদেশের রত্নোদ্ধারের জন্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন রাজকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। আমরা যেন এই সকল পুণ্যশ্লোককে কখনো না ভুলি। বর্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম সন্দেহ নাই কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র; বর্তমান অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিতেছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্বগামীদের যত্ন-সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

এই দিন বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণের লিঙ্গ দেন? আপনার লেখায় কোথাও কোথাও এই রকম দেখিতে পাই; সর্বত্র নয়।' বঙ্কিমবাবু আপনার দক্ষিণ কর্ণে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী স্থাপন করিয়া বলিলেন,—'কান আমার প্রমাণ—কান। যা কানে ভাল লাগে, তাই লিখি; অত নিয়ম মানিতে গেলে চলে না।' আমরা আজ-

কাল এই এই নিয়মেই চলিতেছি। সর্বত্র কানই আমাদের প্রমাণ বটে। কবিতায় তো কথাই নাই, তবে সঙ্গত হওয়া চাই। যাহা কানের জন্য রচা হয়, কান পর্যন্তই তাহার গতি, কানেই তাহার স্থিতি, এবং কানেই যাহার চরম পরিণতি বা জীবন্মুক্তি, তাহা প্রমাণের জন্য কান ভিন্ন প্রাণের অপেক্ষা করিবে না। তবে একটা কথা মনে রাখিলে মন্দ হয় না,—আমরা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কান লইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, আমাদের কান সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কানের অপেক্ষা একটু "দীর্ঘ"। তবে হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞানও অবশ্য বিধাতা নিজের ওজনে দুনিয়ার দান করিয়া থাকেন। তাহা না হইলে, এই কয়টা কথা বলিবার জন্য এতটা স্থান নষ্ট করিতাম না।

দুই

১২৯৮ সালের কথা বলিতেছি। মুন্নী আমাকে অক্সফোর্ড হইতে লিখিলেন আমরা বঙ্কিমবাবুর বহিগুলির ইংরাজি অনুবাদ করিয়া ছাপিতে চাই। তুমি অনুমতি লইবার চেষ্টা কর।

তখন অক্সফোর্ডে একটি সাহিত্য-সভা ছিল। মুন্নী প্রভৃতি সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্ররা তাহাদের দেশের ও ইউরোপের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদের রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। বাঙালী ছাত্ররা তাঁহাদের কবি ও ঔপন্যাসিকদের রচনা অনুবাদ করিয়া বিদেশী সভ্যদিগকে তৃপ্ত করিতেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাসের অনুবাদ শুনিয়া বিদেশী ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙালী সতীর্থদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের দেশের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের রচনা ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাও না কেন? আমাদের ভাষায় সকল দেশের বড় বড় কবি ও লেখকদের রচনার অনুবাদ হয়। কিন্তু তোমাদের দেশের সাহিত্যের পরিচয় নাই। এই সভা হইতে, অন্ততঃ সভ্যদের ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু ছাপাইবার ব্যবস্থা কর।

তাই মুন্নী আমাকে বঙ্কিমবাবুর অনুমতি লাভের চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া, পরদিন প্রভাতে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের ঘরে বসিয়াছিলেন। এই ঘরটিই তাঁহার study ছিল। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। সে দিন

তাঁহাকে বেশ প্রসন্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে মুন্নীর চিঠির কথা বলিলাম।

অক্সফোর্ডের—মোক্ষমূলরের উক্ততোরণের মনীষী ও সাহিত্য রসিক ছাত্র সম্প্রদায় অনুবাদে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের আস্বাদ পাইয়া ছাপাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা একটু গর্ব অনুভব করিয়াছিলাম। জাতির গৌরব মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, শুনিয়া বঙ্কিমবাবুও আনন্দিত হইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনো ভাবান্তর দেখিলাম না। তিনি আনন্দ প্রকাশ বলিলেন না। আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া বলিলাম, 'কেন?'

বঙ্কিমবাবু গড়িয়ার কাঠের নলটি মুখ হইতে নামাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন 'না।'

আমি বলিলাম, 'মুন্নীরা আশা করিয়া লিখিয়াছে। তাহারা দুঃখিত হইবে, —হয় তো বিদেশী সহপাঠীদিগের কাছে অপ্রস্তুত হইবে। ইহাতে আপনার ক্ষতি কি?'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। একবার মনে করিয়াছিলাম, আমার বহিগুলির ইংরাজি করিয়া ছাপাইব। পরে স্থির করিয়াছি, না ছাপাই ভাল।'

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'কেন?'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'রমেশ তখন বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাতের Publishers-দের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লিখিয়াছিলাম। উত্তরে রমেশ লিখিলেন, Publisher-রা নিজের খরচে বাঙলা উপন্যাসের অনুবাদ ছাপিতে চায় না। বিলাতে এখন problem লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে। এ সময়ে উপন্যাস ছাপিয়ে লাভ হইবে না, রমেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার চিঠি-পত্র চলিয়াছিল।'

রমেশ—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্টতা ছিল। রমেশবাবুকে অনেকবার বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে দেখিয়াছি। উভয়ে মসগুল হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

আমি বলিলাম,—'মুন্নীরা নিজের খরচে ছাপিবে। আপনি সে রকম বন্দোবস্ত করিতে বলিবেন, আমি সেই রকম করিতে লিখিব।'

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, 'তোমার যে বড় আগ্রহ। তুমিও দুঃখিত হইতেছ। কিন্তু আগে সব শোন, শুধু লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিজেই ছাপিব। তোমাকে বলি—আমার

দুই-একখানা উপন্যাসেব ইংবেজি অনুবাদ হইয়াছে। তাহা আমাব পছন্দ হয় নাই। আমি নিজে অনুবাদ করিব ঠিক করিয়াছিলাম। আমার শেষের উপন্যাস কয়খানা যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলাম। এই দেখ—'

বঙ্কিমবাবু চেয়াব হইতে উঠিলেন, ঘবেব পশ্চিমদিকে একটি আলমাবির দিকে অগ্রসর হইলেন। আলমারি খুলিয়া সকলকার উপবের তাক হইতে এ কখানি বড খাতা বাহিব কবিয়া আমাকে দিলেন।

আমি দেখিলাম, "দেবীচৌধুবাণী"ব অনুবাদ।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'দেখ কত খাটিযাছি। অনুবাদ কবিয়াছি। কাটিয়া কুটিয়া আবাব "ফেয়াব" কবিয়াছি। তাহার পব বাঁধাইয়া তুলিয়া বাখিযাছি।'

আমি আগ্রহে বলিলাম, 'তবে ঐ খানিই দিন।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'না। আমি বিলাতি Publishers-দেব কাছ থেকে estimate পর্যন্ত আনাইযাছিলাম। শেষে ভাবিয়া দেখিলাম ছাপাইয়া কোনো লাভ নাই। ইংবেজবা আমাব উপন্যাস বুঝিতে পাবিবে না।'

আমি বলিলাম, 'সে কি? অক্সফোর্ডেব শিক্ষিত ছাত্রদেব ভাল লাগিল, ইংবেজ পাঠকের ভাল লাগিবে না।'

বঙ্কিমবাবু মৃদু হাসিতে হাসিতে মাথা নাডিতে লাগিলেন, আমাব হাত হইতে "দেবীচৌধুবাণীব' পাণ্ডুলিপিব খাতাখানি লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবু একবাব খাতা হইতে মুখ তুলিয়া আমাব দিকে চাহিলেন। আমি অমনই সুযোগ পাইয়া, মিনতি করিয়া, আবদাব করিয়া বলিলাম, 'একবার পবখ করিয়া দেখিলে হয় না—ভালো লাগে কি না?—তাহারা কি বলে?'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'শুধু তাহাদের ভাল লাগিবে না—নয। তাহারা গালাগালি দিবে।' আমি বলিলাম, 'গালাগালি দিবে।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। এই দেবীর কথাই ধর। আমি খুব ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিয়াছি। এই ব্রজেশ্বরের বিয়ের কথা কি উহারা বুঝিতে পারিবে? Poligamy বলিয়া চীৎকার করিবে। আমি কেন ব্রজেশ্বরের তিনটি বিবাহ দিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা বিলাতের লোক বুঝিবে না। তোমাদের দেশেও তো "বহুবিবাহ" দেখিয়াই কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছে।'

আমি শুধু নিরস্ত হইলাম না। সাহস করিয়া বলিলাম,' 'তাহা তো পুস্তকের ভূমিকায় বুঝাইয়া দিলে হয়।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমাদের আবদার রাখিতে পারিলে আমি খুশি

হইতাম। কিন্তু আমি এখন ইংরাজিতে আমার বই বাহির করিব না। তোমাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না—কিছু মনে করিও না।'

আমি নিরাশ হইয়া ফিরিলাম, এবং মুন্সীকে বঙ্কিমবাবুর প্রত্যাখ্যানের কথা লিখিয়া দিলাম। Private circulation-এর জন্য ছাপিবারও বঙ্কিম-বাবু অনুমতি দিলেন না।

দুঃখেব বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর-কৃত "দেবী চৌধুরাণী"ব অনুবাদ হারাইয়া গিয়াছে। আমি বঙ্কিমবাবুব দ্বিতীয় দৌহিত্র, স্নেহভাজন শ্রীমান পূর্ণেন্দুসুন্দবকে দেবীব অনুবাদ ছাপিতে বলি। তিনি পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পান নাই।

গ্রন্থকারের নিজেব অনুবাদটি নষ্ট না হইলে, তাহা ভবিষ্যৎ অনুবাদক-দিগকে পথনির্দেশ করিতে পারিত।

সাহিত্যের প্রাণ স্বদেশী। তাহাতে সার্বভৌমিক ভাবও থাকে। তবু এক দেশেব সাহিত্য অন্য দেশের আদর্শ হইতে পাবে না। বঙ্কিমবাবু আমার মতো নাবালকেব নিকট তাঁহাব আপত্তির সমস্ত কারণ নির্দেশ করেন নাই। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে নিবস্ত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর কাহারও সহিত তাঁহার কথা হইয়াছিল কিনা, বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, 'এখন ইংরেজিতে আমার বই বাহির করিব না।' তিনি কি অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন? তাঁহার সমস্ত উপন্যাস তো উদ্দেশ্যমূলক নয়। সেগুলির অনুবাদ করিবার অনুমতি দিলেন না কেন?

এখন একটা কথা মনে হইতেছে। বঙ্কিমবাবু খাঁটী "স্বদেশী" ছিলেন তিনিই প্রথম বাঙালীকে "স্বদেশ" দেখাইয়া ও চিনাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশের জন্যই লিখিতেন। শেষ জীবনে নিষ্কাম ধর্মের ও নিষ্কাম কর্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্য সেবাও নিষ্কাম ও উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাহা দেশের বস্তু, দেশে সার্থক হইবার হয়—হউক, ইহাই হয় তো তাঁহার কামনা ছিল।

* * *

ইহার অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি আর উপন্যাস লিখিবেন না? আমরা কি পড়িব?'

বঙ্কিমবাবু যেন আমাদের পড়িবার জন্যই উপন্যাস লিখিতেন? বঙ্কিম-বাবু এ ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তা ঠিক বলিতে পারি না। তবে অনেক দিন থেকে একটা জিনিস লিখিবার ইচ্ছা আছে,—হইয়া

উঠিতেছে না। বৈদিক যুগের ছবি দিয়া একখানা উপন্যাস লিখিব। তবে—হইয়া উঠিবে কিনা, বলিতে পারি না।'

বঙ্কিমবাবু অনেক দিন বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। বেদের দেবতা, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। সেই সময়েই "বোধ-হয় এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদেব দুর্ভাগ্য ক্রমে "তাহা হইয়া উঠিবাব" পূর্বেই বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কি আরম্ভ করিয়াছেন?'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'না, আরম্ভ কবিলে শেষ হইয়া যায়। —যদি লিখিয়া উঠিতে পারি, এবং তোমাদের ভাল লাগে, তাহলে, ইংরেজি করে ছাপান যাবে। কি বল?'

আমাব সেই আগ্রহের কথা তখনও বঙ্কিমবাবুব মনে ছিল। আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

* * *

১২৯৯ সালে বাঙলা দেশে সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলন আরম্ভ হইল। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই আন্দোলনেব নেতা ছিলেন। উভয় পক্ষেব আগ্রহ ক্রমে বিরোধেব সন্নিহিত হইল। বিচার ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হইল। বিতর্ক ক্রমে চবমে উঠিল। সংবাদপত্রে বাঁদরামি দেখা দিল।

স্বর্গীয় শ্যামলাল মিত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী, সমুদ্র যাত্রার সমর্থন করিতেন। সেই সময়ে "জন্মভূমি"তে সমুদ্র যাত্রার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্যামলালবাবু সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর, "সাহিত্যে"র একজন পৃষ্ঠপোষক, আমার অগ্রজতুল্য, প্রতিষ্ঠা-শালী সুলেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবং "সাহিত্যে" ছাপাইবার পাঠাইয়া দেন।

প্রবন্ধটি পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িয়া গোলে পডিলাম। আমাদের "সাহিত্য" তখন প্রায় গণতন্ত্র ছিল। এখন গণও নাই, তন্ত্রও নাই। জনও তো খুঁজিয়া পাই না। —যাক, এখন গণের কথাই বলি। এই রচনার লেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে "বানর" বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, 'প্রবন্ধটি ছাপিয়া কাজ নাই।'

গণের কেহ কেহ আমার সমর্থন করিলেন, কিন্তু অনেকেই ছাপিতে বলিলেন। যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহাব লেখাই তখন "সাহিত্যে'র প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁহার লেখা না ছাপা সুবুদ্ধির কাজ নয়, তাহাও শুনিলাম। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিলেন, প্রবন্ধটির শ্লেষ-বিদ্রূপ খুব smart হয় নাই। কিন্তু একজন—হায়। তিনি আর ইহলোকে নাই—স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বলিলেন, 'রচনা বেশ হইয়াছে। তুমি appreciate করিতে পারিতেছ না।' নলিনীর মতে আমার শ্রদ্ধা ছিল। অমন স্নেহময় প্রেমময় বন্ধু আর পাইব না। অমন সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। সাহিত্যেই তাহার জীবনের সম্বল ছিল। কাব্য ও কবিতা ও কলা-সৌন্দর্যে নলিনী মগ্ন হইয়া থাকিত। সংসারের দারিদ্র্য, দুঃখ, আবিলতা, কঠোরতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। নলিনীকে আমরা "কবি" বলিয়া উপহাস করিতাম। নলিনী টুর্গেনেভ, টলস্টয়, হায়েন প্রভৃতির নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল। চৈতন্য লাইব্রেরিতে সে যখন এই সকল গ্রন্থকারের কেতাবের আমদানি করে, তখন অনেকের পক্ষে তাহা প্রহেলিকা ছিল। শান্ত, নম্র, ধীর, সারস্বত, সংসারের কুটিলচক্রে অনভিজ্ঞ নলিনী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কৈশোরের সরলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

"দারিদ্র্যের মৃদুগর্বে চরিত্র সুন্দর" নলিনীর পক্ষে অন্বর্থ বলিয়া মনে হইত। নলিনীর জীবন বলিত—

'যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়
এস না এ-যোগি-জন তপোবন-স্থলে ?'

দরিদ্র নলিনীও সারদাকে বলিতে পারিতেন,—বোধহয় মনে মনে বলিতেন

'তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী, যার খুশি তার।'

নলিনী "সাহিত্যে" অনেকগুলি সুন্দর গল্প লিখিয়াছিলেন। আজ-কাল মোপাঁসা ভাজা, মোপাঁসা চচ্চড়ি, মোপাঁসা ছেঁচকি, মোপাঁসার ছ্যাঁচড়ার ছড়াছড়ি হইয়াছে। কিন্তু নলিনীই প্রথমে বাঙালীকে 'মোপাঁসার গল্পে'র আস্বাদ দিয়াছিলেন।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে যাত্রা

করিলাম। ইহার পূর্বে দুই-চারিবার বঙ্কিমবাবুর পরামর্শ পাইয়া উপকৃত ও চরিতার্থ হইয়াছিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—'আজ রাখিয়া যাও। কাল কি পরশু আসিও।'

দুই দিন পরে অপরাহ্ণে বঙ্কিমবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। দক্ষিণের বৈঠকখানার জানলায় দাঁড়াইয়া বঙ্কিমবাবু কাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম। বঙ্কিমবাবু ফিরিয়া দেখিলেন, বলিলেন, 'বসো' তাহার পর আবার দক্ষিণমুখো হইয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে লাগিলেন। দেখিলাম, পার্শ্ববর্তী বাড়ির ঢাকা বারান্দায় একটি নয়-দশ বৎসরের মেয়ে—যেন শিশিরস্নাত ক্ষুদ্র যুঁই। মেয়েটি হাসিতেছে, বঙ্কিমবাবু হাসিতেছেন। ব্রহ্ম শিশুর সহিত শিশু হইয়া বঙ্কিমবাবু খেলা করিতেছেন। মেয়েটি যাইবার সময় বলিল, 'সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।' বঙ্কিমবাবু প্রফুল্লচিত্তে স্মিত বিকশিতমুখে একখানি সোফায় বসিলেন, আমাকে বলিলেন, 'মেয়েটি আমার সই।'

পাশের ঘরে হারমোনিয়ম বাজিতেছিল। আমি অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতে-ছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কথা শুনিয়া তটস্থ হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলাম, বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আমার বড় নাতি হারমোনিয়ম বাজাইতেছে। আমি নাতিদের সঙ্গে খেলাধুলা করি। হারমোনিয়ম কিনিয়া দিয়াছি। বাড়িতেই বাজায়, গায়, আনন্দ করে। আমি উহাদের বাহিরে যাইতে দিই নাই। তুমি বাজাইতে পার?'

আমি বলিলাম, 'না।'

'গান বাজনা তোমার ভাল লাগে না।

'আমি খুব ভালবাসি।

'তবে শেখ না কেন?

অনেক জিনিস ভালবাসিতাম, কিছুই তো শিখিতে পারি নাই। কি উত্তর দিব।

দাদামহাশয়েরা অনেক চেষ্টা করেন, হারমোনিয়মও কিনিয়া দেন। পণ্ডিত-মাস্টার-উপদেশ—চেষ্টা-যত্ন কিছুরই ত্রুটী হয় না। কিন্তু তাঁহারা বিধিলিপি মুছিয়া দিতে পারেন না। কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া দেন, কিন্তু প্রাক্তন বর্তমানও গড়ে, ভবিষ্যৎও গড়ে। আজ দিব্যেন্দুর 'দাদা' আর আমার 'দাদামহাশয়ে'র কথা একসঙ্গে মনে হইতেছে। তাঁহাদের কত যত্ন, কত চেষ্টা ভস্মে ঘৃতাহুতি হইয়াছে। তাঁহাদের কত আশা বিফল করিয়াছি। কিন্তু বিনিময়ে কি পাইয়াছি?

সে সম্ভাবনা কি আর ফিরিবে? তাহার বিনিময়ে যে আজ সর্বস্ব—জীবন দিতে পারি।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমার সেই প্রবন্ধ পড়িয়াছি।'

'আপনার কি মত?'

'তুমি সম্পাদক—তোমার মত কি আগে জানি?'

'আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব। আমার মতের মূল্য কি? আপনার মত কি বলুন?'

বঙ্কিমবাবু আমার দিকে একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—'আগে তোমার মত কি বল?'

আমি বলিলাম 'আমার ছাপিবার ইচ্ছা নাই।'

'কেন? তুমি কি সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ? আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" তো "সমুদ্র-যাত্রার" পোষক প্রবন্ধ ছাপিয়াছ।'

'প্রবন্ধ সুলিখিত ও যুক্তিযুক্ত কিনা, আমরা তাহাই দেখি। আমাদের মতের বিরুদ্ধে হইলেও আমরা ছাপি।'

'তবে এটা ছাপিবে না কেন?'

'যাহারা সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষ, তাহারা সমুদ্র-যাত্রার পক্ষদিগকে গালি দিতেছে এ পক্ষ হইতে সমুদ্র-যাত্রার বিপক্ষদিগকে গালি দিয়া সেই দলে ঢুকিয়া কোন লাভ নাই।'

'গালি-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কি সব সময়ে মন্দ,—অনেক সময়ে বিদ্রূপে অনেক কাজ হয়; জান?'

আমি বলিলাম, 'এ লেখাটি কি আপনার ভাল লাগিয়াছে?—ইহার ব্যঙ্গ—'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

আমি বলিলাম' 'আমার খুব smart মনে হয় নাই।'

'সবই কি খুব smart হয়?'

আমি বলিলাম, 'প্রতিপক্ষকে বাঁদর বলিলে কি রসিকতা হয়?' পুরানো কাসুন্দী ঘাঁটিয়া লাভ কি?'

'পুরোনো কাসুন্দী?'

'আপনার সেই ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুলের চর্বিতচর্বণ। ইহাতে মৌলিকতা নাই। সাহিত্যের হিসাবে রচনাটি আমার এমন সার্থক মনে হয় নাই—যে জন্য গোঁড়াদের যে ব্যবহারের নিন্দা করি' সেই কুকার্য নিজেরা করিতে পারি। তবে আপনি যদি ভাল মনে করেন—'

'না' আমি তোহার সব কথা না শুনিয়া কিছু বলিব না। —বাবু যদি চটেন? তোমার কাগজে তিনি খুব লেখেন, এবং বেশ লেখেন।'

'আমি বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া চিঠি লিখিব।—তাহাতেও যদি চটেন, আমি কি করিব?'

আমি বুঝিলাম, বঙ্কিমবাবু আমার কথা শুনিয়া খুশী হইলেন। পকেট হইতে সেই রস-রচনাটি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'আমি সম্পাদক হইলে, ইহা ছাপিতাম না। আর রঙ্গে,—বিদ্রূপ—এসব রচনা খুব original smart, — to the point না হইলে effective হয় না। এটা শুধু গালাগালিই বটে।

আমি বাড়িতে আসিয়া প্রবন্ধটি ফেরৎ দিলাম। মহিলা-সম্পাদিত এক-খানি প্রসিদ্ধ মাসিকে পরে তাহা ছাপা হইয়াছিল।

১২৯৯ সালে আমার বিচারশক্তি বঙ্কিমবাবুর মতো ছিল। এবং আমি খুব বাহাদুর ছিলাম, আশাকরি, আমার গুণগ্রাহী জনার্দনদিগকে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি, এবং তাঁহাদিগকে নাক তুলিয়া আমার শ্রাদ্ধ করিবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছি। আমি কিন্তু কলমটি রাখিবার সময় সেই স্নেহময় মনীষীকে স্মরণ করিয়া ভাবিতেছি,—তাঁহার এত অনুগ্রহ ছিল, এমন আদর্শ মিলিয়াছিল, বিধাতা সব বিফল করিলেন কেন? অথবা "প্রভবতি শুচি বিম্বোদগ্রাহে মনি ন মৃদাং চয়:',—ভবভূতির এই বাণী বিফল হইবার নহে।

তিন

বঙ্কিমবাবু 'শৌখীন" ছিলেন। তাঁহার আশে পাশে সবই বেশ পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন সাজানো দেখিতাম। অগোছালো, বিশৃঙ্খল কিছু চোখে পড়িত না। বঙ্কিমবাবুর পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না। কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়িতেও বঙ্কিমবাবুর পিরাণের বুকের বোতামের দু-একটা খোলা দেখি নাই। শেষ বয়সে বঙ্কিমবাবু দাড়ি-গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন। প্রত্যহ কামাইতেন। পরামানিকের অনুপস্থিতির পরিচয় বঙ্কিমবাবুর মুখে কখনও দেখিয়াছি, এমন তো মনে হয় না। সোনার চশমা-খানি ঝক-ঝক চক-চক করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব সুবিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, কেতাব প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত, কোথাও একবিন্দু ধূলি নাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়া কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটা মাজা, নলটি ধোয়া- মোছা;

মুরলী বড় কলিকায় "তাওয়া" দিয়া উৎকৃষ্ট সুরভি মিঠে তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ থিতাইয়া জিয়াইয়া, ধীরে ধীরে, তামাক টানিবার আয়েস ভোগ করিতেন। বাড়িতে ঢুকিলে, ঘরের চারিদিকে চাহিলে মনে হইত, কোনও বিশৃঙ্খলা নাই।

সাহিত্যেও বঙ্কিমবাবুর "শৌখিনতা"র পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যের কবি ছিলেন। তাঁহার কল্পনার সৌন্দর্য, রচনার সৌন্দর্য, কাব্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য, শব্দ চয়নে সৌন্দর্য। তাঁহার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীও শৌখীন, সৌন্দর্য প্রিয়। তাঁহার আদর্শও সৌন্দর্য। তাঁহার অনেক ক্ষুদ্র সৃষ্টির "রচনা—রীতি" খুব শৌখীন।

সেকালে "সাহিত্যের"র একটা জাঁকালো সংস্করণ বাহির হইত। খুব পুরু মসৃণ কাগজে উৎকৃষ্ট কালিতে ছাপা, বহুমূল্য গোলাপী মলাটের কাগজে মোড়া। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ টাকা। ইহা "রাজ সংস্করণ"। রাজ সংস্করণ রাজাদের পাতে দিবার যোগ্য সংস্করণ, অথবা সংস্করণের রাজা, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা মনে আছে, কোনও রাজা ইহার গ্রাহক হন নাই। কোনো প্রজাও হন নাই। ইহা একশত ছাপা হইত। একজন "গ্রাহক" হইয়াছিলেন, তিনি রাজা ও প্রজার মধ্যবর্তী,— টাঙ্গাইলের জমিদার কবি শ্রীযুক্ত প্রথমনাথ রায়চৌধুরী। পুরাতন হিসাবে ভূস্বামী রাজা। তিনি এখন রাজার ভাই দাদা বটে।

যাক! অবশিষ্ট নিরানব্বইখানি আমরা বাছিয়া বিলি করিতাম। একদিন সেই "রাজসংস্করণের সাহিত্য" লইয়া বঙ্কিমবাবুকে দিতে যাই। বঙ্কিমবাবু ভাল ছাপা পছন্দ করিতেন। "সাহিত্য" খানি হাতে করিয়া লইলেন, বলিলেন, 'বাঃ, চমৎকার!' উলটাইয়া পালটাইয়া, দেখিলেন, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'এত খরচ করিয়া সামলাইতে পারিবে কি?'

আমি বলিলাম, 'একশত এই রকম ছাপা হয়, সব নয়।'

'তাতেও তো অনেক খরচ পড়িবে। কে লইবে?'

'কেহ নয়। আমরা শখ করিয়া ছাপি। একজন গ্রাহক হইয়াছেন।" প্রমথবাবুর নাম বলিলাম।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছাপা ভালবাসি। আমার বইগুলি এখন ভাল করিয়া ছাপাইতেছি। বাঁধাইয়া দিতেছি। কাজেই দামও বাড়াইতে হইয়াছে।'

আমি বলিলাম, 'আমাদের দেশের লোক বেশি দাম দিয়া কিনিতে

পারিবে কি? বোধ হয়, বিক্রি কমিয়া যাইবে?'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তা হতে পারে। কিন্তু আমার সমস্ত বই ঐ রকম করিয়া ছাপিব।'

আমি বলিলাম, 'দাম সস্তা হইলে সকলে পড়িতে পারিত। বড় বড় ইংরেজ লেখকদের বই কত সস্তায় পাওয়া যায়।'

'তা বটে। আমি তাও ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মনে হয়, এ দেশে এখনও cheap literature এর সময় হয় নাই। আমার মনেহয়, উপন্যাসের মূল্য অধিক হইলে ক্ষতি নাই।'

আমি প্রকারান্তরে প্রতিবাদ করিবার জন্য বলিলাম, 'সকলের সুবিধার জন্য আমরা "সাহিত্যে"র বার্ষিক মূল্য দুই টাকাই রাখিয়াছি।

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আর একদিন বলিয়াছিলাম—' সাহিত্যে'র দাম তিন টাকা করিয়া দাও। যাহারা দুই টাকা দিতে পারে, তাহারা তিন টাকাও দিতে পারে। যাহারা তিন টাকা দুই টাকা, কিছুই দিতে পারে না, তাহারা কিছুই কেনে না। "বঙ্গদর্শনে"র সময়েও দেখেছি, "প্রচারে"ও দেখেছি। যে শ্রেণীর লোক গ্রাহক হয়, দুই-এক টাকায় তাহাদের আসে যায় না।'

'যাহারা খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, তাহারা কি পড়িতে পাইবে না। পড়িতে চায় এমন লোকের সংখ্যা এখনও এ দেশে অত্যন্ত কম। আমাদের খুব গরীব, অথচ পড়িতে জানে, দেশে সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাই শিক্ষিতের সংখ্যা বড় অল্প। cheap literature-এর এখনও সময় হয় নাই। ইহার অন্য কারণও আছে। সকল জিনিস সকলের হাতে দেওয়া উচিত নয়। সকল বই সাধারণে না পড়িলেও কোনো ক্ষতি নাই। কতকটা পড়া থাকিলে যে সব জিনিস পড়াশুনা চলে, খুব অল্প শিক্ষিতের পক্ষে সে সব বই পড়িলে হিতে বিপরীত হইতে পারে। দেশের অবস্থার সঙ্গে cheap literature এর সম্বন্ধ আছে।'

তার পর সাহিত্যখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'দিব্যি "get up" হইয়াছে।'

আমি বলিলাম, 'আপনি যদি "বঙ্গদর্শন" ঘুড়ির কাগজে বটতলার ছাপাখানাতে ছাপিয়া দিতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। অমন কাগজ আর হইবে না। আমরা অমন লেখা কোথায় পাইব।'

মনে করিয়াছিলাম, বঙ্কিমবাবু ইহাতে সায় দিবেন, বলিলেন, 'তা বটে।' কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমরা না পারিবে কেন? এখন যে সব কাগজ

বাহির হইতেছে, "বঙ্গদর্শনে"র যে সুবিধা ছিল, তাহাদের সে সুবিধা নাই। তখন বাঙলায় অনেক জিনিস লেখা হয় নাই। প্রবন্ধ লেখা সহজ ছিল। যে বিষয়ে লোকে কিছু জানে না, সে বিষয়ে যৎসামান্য লিখিলেও চলিত, লোকে তাহাই পড়িত সেইটুকুই শিখিত। এখন আর তাহা চলে না। এই তোমার "সাহিত্যে"র কথাই ধর। উমেশ বটব্যালের মতো Original research করিয়া "বঙ্গদর্শনে" কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই। বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধগুলি, নগেন গুপ্তর "মৃত্যুর পরে"—উঁচু দরের লেখা। "বঙ্গদর্শনে" এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই। তোমরা পারিবে না কেন? "বঙ্গদর্শনে"র কাজ "বঙ্গদর্শন" করিয়াছে। তোমাদের কাজ তোমরা কর।'

বঙ্কিমবাবু শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "মৃত্যুর পরে" বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিন-চারিবার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর Style এর তিনি প্রশংসা করিতেন।' "মৃত্যুর পরে" গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে। পূজ্যপাদ বটব্যাল মহাশয়ের "বৈদিক প্রবন্ধাবলী"ও "বেদ প্রবেশিকা" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। বোধহয় দুই-ই ইঁদুরে কাটিতেছে।

আমি বলিলাম, 'আপনার লেখা? আপনার প্রবন্ধ, সমালোচনা, উপন্যাস, — সে রকম আর কে লিখিবে? সে গৌরবও আর কোনো মাসিক-ভাগ্যে ঘটিবে না। আপনি তো আর কোনো কাগজে লিখিবেন না।

'আর লিখিয়া উঠিতে পারি না। তোমাদের কাগজখানির সুন্দর ছাপা, দেখিয়া লোভ হয়। লিখিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু'—

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'আমি আমার কাগজের কথা বলি নাই; আমার সেই প্রথম দিনের হুকুম মনে আছে।'

বঙ্কিমবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তুমি না বল,—আমি তোমার কথা ভাবি। তুমি ছেলেমানুষ এত টাকা খরচ করিতেছ, "বন্ধ করিয়া দাও" বলিতে ইচ্ছা হয় না। অথচ তোমার লোকসান দেখিলেও কষ্ট হয়। অন্ততঃ খরচ পত্রটা চলিয়া যায় এমন কিছু করা যায় না?'

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'যায়! সে উপায় আপনার কাছে। আমার বলিবার উপায় নাই।'

বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার লেখা? আমি লিখিলেই কি কাগজ চলিবে?—তা চলুক না চলুক, আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।'

আমি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলাম, 'একটাই দিন না।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'শুধু তোমাকে একটা দিলে তো চলিবে না।। স্বর্ণকুমারী আসেন, আমার নাতিদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি তো সব বুঝি। তাঁহার ভারতী" আছে। রবি আসেন। জান তো, "প্রচারে"র সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার "সাধনা" আছে, তুমি আছ, তোমার "সাহিত্য" আছে। তার পর আর এক আছেন,—আমার বেহাই দামোদর বাবু।'

আমি বলিলাম, 'তাঁহার "প্রবাহ" তো নাই। তিনি কি আবার— ।'

'না, তিনি "নব্য ভারতে'র জন্য ধরিয়াছেন। সেদিন তাঁহাকে বলিয়াছি—আমা দ্বারা হইয়া উঠিবে না—এখন, তিনটা লিখিতে পারিলেও হয়। তা সে কবে পারিয়া উঠিব, তা তো বলিতে পারি না।'

এমন সময়ে মুরলী আসিয়া খবর দিল, হারাণবাবু আসিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'হারাণচন্দ্র কেন আসিয়াছেন জান?—"বঙ্গবাসী"র যোগেনবাবু হারাণবাবুকে আর এক দিন পাঠাইয়াছিলেন। "জন্মভূমি"র জন্য আমার উপন্যাস চান। পাঁচশত টাকা দিতে চাহিয়াছেন।'

এমন সময়ে হারাণবাবুর প্রবেশ। হারাণবাবু স্বনামধন্য, এখন রায় সাহেব হইয়াছেন। কোনো চন্দ্রকেই প্রদীপ জ্বালিয়া দেখাইতে হয় না। হারাণচন্দ্রের জন্য মশাল জ্বালিলে অভিমানী রায় সাহেব আমাকে ক্ষমা করিবেন না।

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'বসুন হারাণবাবু।—আমি পারিয়া উঠিব না।'

হারাণবাবু একটু জিদ করিতে লাগিলেন, টাকার পরিমাণ বাড়িতে পারে, তাহারও আভাস দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু বলিলেন, না। 'তার পর হারাণবাবুকে বলিলেন, 'সাহিত্যের getup দেখুন।'

হারাণবাবু বলিলেন, 'কখানিই বা ছাপা হয়? "জন্মভূমি' অনেক ছাপিতে হয়, "জন্মভূমি"র ছাপাও মন্দ না।'

'আমি সে কথা' বলিতেছি না।''

হাসিতে হাসিতে হারাণবাবু বলিলেন, 'যোগেনবাবুকে কি বলিবেন!'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'বলিলেন—আমি পারিব না।' তারপর গড়গড়ায় নলটি লাগাইয়া দুই-একটান তামাক টানিয়া বলিলেন, 'ভক্তিপ্রীতির জন্য যাহা করিতে পারিতেছি না, টাকার জন্য তাহা পরিয়া উঠিব কি?'

হারাণবাবু বলিলেন, 'আমি আর এক দিন আসিব।'

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'কিন্তু আমা-দ্বারা হইয়া উঠিবে না'।

আমি বঙ্কিমবাবুর সম্মুখে বসিয়া যে নূতন বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিলাম তাঁহাকে তো আগে দেখি নাই, চিনিতে পারি নাই। আমার মানসপটে তাঁহার অন্য মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কল্পনা-নয়নে সেই বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দেখিয়া মনে হইল,—

"পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"

—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—

"দ্বিতীয় সংস্করণ সমাপ্ত"